ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ
আল-গাযালি (র)-এর অমর রচনা

ইহ্‌য়াউ উলূমিদ্দীন

১৭

আল্লাহর মহব্বত ও চিন্তা-ফিকির

ভাষান্তর

মুফতি নূরে আলম

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

আল্লাহর মহব্বত ও চিন্তা-ফিকির

ইহ্য়াউ উলূমিদ্দীন সিরিজ : ১৭

ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ
ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালি (র)
(১০৫৮ - ১১১১ খ্রি.)

নিরীক্ষণ ও সম্পাদনা
মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ
লেখক ও সম্পাদক, দারুত তাকবীর

ভাষান্তর
মুফতি নূরে আলম
সাবেক মুহাদ্দিস, জামিয়া আরাবিয়া আশরাফিয়া,
ত-ব্লক, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬

দারুত তাকবীর

আল্লাহর মহব্বত ও চিন্তা ফিকির

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন সিরিজ : ১৭

ISBN No : 978-984-558-056-4

প্রকাশক
প্রকৌ. মেহেদী হাসান
দারুত তাকবীর
৩০/এ, সাত্তারা সেন্টার (১৪ তলা)
ভি আই পি রোড, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
ডক্টর এম. শরীফ উল আলম

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
জিলহজ ১৪৪১ হিজরি
শ্রাবণ ১৪২৭ বাংলা

প্রচ্ছদ ডিজাইন
দারুত তাকবীর ডিজাইন সেকশন

রচনা
ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালি র.
(১০৫৮-১১১১ খ্রি.)

ভাষান্তর
মুফতি নূরে আলম
সাবেক মুহাদ্দিস, জামেয়া আরাবিয়া আশরাফিয়া, ত-ব্লক, মিরপুর-১২ ঢাকা-১২১৬।

ভাষাসম্পাদনা
দারুত তাকবীর অনুবাদ, সংকলন ও গবেষণা বিভাগ

স্বত্ব : সংরক্ষিত

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ২৭৬.০০ (দুইশত ষাট টাকা মাত্র)

সতর্কীকরণ

প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত এ বইয়ের যেকোনো অংশ
পরিবর্তন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো সম্পূর্ণ বেআইনি

ALLAHOR MOHOBBOT O CHINTA-FIKIR (Ihyau Ulumiddeen Series-17), Written by Emam Gazali (R), Translated by Mufti Abu Naeim Md. Sajid, Published by Eng. Mehedi Hasan. Darut Takbeer, Corporate Office : 30/A Sattara center (14th Floor), V.I.P Road, Naya Paltan, Dhaka-1000, Phone : +8809610666006, 01938-855992,01938-855979, 01991-181204, E-mail : info@daruttakbeer.com, Website : www.daruttakbeer.com, Publishing Date : August 2020, **Price : 260.00** Taka Only

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি মানুষকে সর্বোত্তমরূপে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। দরূদ ও সালাম সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। মানবজাতির মাঝে যিনি আগমন করেছিলেন চিরমুক্তি ও সফলতার বার্তা নিয়ে, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর তাঁর আনীত সুমহান দীনকে সমুন্নত রাখতে প্রতি হিজরি শতকেই আল্লাহ তাআলা কিছু ক্ষণজন্মা মনীষী ও সংস্কারককে প্রেরণ করেন।

পঞ্চমশতকে আবির্ভূত এমনই একজন যুগশ্রেষ্ঠ ও ক্ষণজন্মা মনীষী হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাযালি (র)। ৪৫০ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দার্শনিক হিসেবে তিনি শুধু যুগশ্রেষ্ঠ নয়; বরং জগৎশ্রেষ্ঠ। মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাঁর অবদান অসামান্য। তাঁর কলমের ছোঁয়ায় মুহাম্মদি দীন ও শরিয়ত শুধু নবজীবনই লাভ করেনি, পৃথিবীর তাবৎ মনীষী, জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণকে এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে বাধ্য করেছে। অজস্র মানুষকে বিশ্বাসের আলোয় আলোকিত করেছে। আর বিশ্বাসীদের মাঝে আস্থার দ্যুতি ছড়িয়েছে।

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' নামে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তাঁর একটি অমর কীর্তি। বহু শতাব্দী ধরে এটি মুসলিম উম্মাহর মাঝে প্রাণস্পন্দন এবং প্রেরণার স্ফুরণ ঘটিয়ে আসছে।

মূল আরবি গ্রন্থটি চার খণ্ডে রচিত। কিন্তু পাঠকের ক্রয়ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয় অংশটি সংগ্রহ ও বহনের সুবিধার্থে আমরা বইটি সিরিজ আকারে প্রকাশ করছি।

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন সিরিজের সতেরোমত খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন তরুণ আলেম মুফতি নূরে আলম। এ পর্যায়ে সিরিজের সতেরোমত গ্রন্থটি বাংলা ভাষাভাষীদের হাতে তুলে দিতে পেরে দারুত তাকবীর আনন্দিত ও গর্বিত। যদিও বাজারে এর অনেকগুলো অনুবাদ রয়েছে। নতুন করে আমরা আবার কেন অনুবাদ করলাম, তা মনোযোগী পাঠক পড়েই বুঝবেন।

এর যা কিছু ভালো তার সবই মহান আল্লাহর। আর যা কিছু ভুল তা আমাদের অক্ষমতা। আমরা আমাদের ভুলগুলো উত্তরোত্তর সংশোধন ও পরিমার্জনে বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে সুহৃদ পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের দুআ-পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা কাম্য।

গ্রন্থটি পড়ে কোনো পাঠক যদি নিজের প্রয়োজনীয় আত্মসংশোধনে ব্রতী হয় এবং দ্বিধাহীনচিত্তে মহান আল্লাহর ইবাদত ও সাধনায় আত্মমগ্ন হয়, তাহলেই আমরা আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের এই শ্রমটুকু কবুল করে নিন এবং গ্রন্থটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

প্রকাশক

১০.০৮.২০২০

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

অনুবাদকের কথা

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' রচিত হয় হিজরি পঞ্চম শতাব্দিতে। এই অমর গ্রন্থটি রচনা করেন জগৎশ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল গাযালি (র)। তারপর থেকেই এটি সকল শ্রেণির মুসলমানদের নিকট বরিত হয়ে আসছে নিরঙ্কুশভাবে।

এ গ্রন্থ রচনা করার মূল উদ্দেশ্য হলো, ইসলামি আদর্শ ও ভাবধারায় মুসলমানদের উজ্জীবিত করা। এর স্বরূপ-প্রকৃতি ও মর্ম তাদের সামনে তুলে ধরা। একজন মুসলিমের অন্তর্জগৎকে মুহাম্মদি শরিয়তের আলোয় আলোকিত করতে, সর্বোপরি আত্মার যাবতীয় ব্যাধি থেকে মুক্ত করে তাতে প্রভুপ্রেমের আগুন জ্বালাতে গ্রন্থটি বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক ও দক্ষ চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করে।

রচনার সূচনাকাল থেকেই অজস্র মানুষ এর জ্ঞান সুধা পান করে পুনর্জীবন লাভ করেছে এবং এর ছত্রে ছত্রে ছড়ানো প্রজ্ঞার মণিমুক্তা কুড়িয়ে মানুষ জ্ঞানপ্রাচুর্য লাভ করেছে।

কয়েক শতাব্দী পেরিয়েও সেই রত্ন ভাণ্ডারে এতটুকু টান পড়েনি। উত্তরোত্তর তা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। রত্ন তো নয় যেন রত্নের খনি! বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, কালোত্তীর্ণ এই গ্রন্থটি বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি, ইসলামি স্কলার এবং ওলামায়ে কেরাম গ্রন্থটি নিয়ে বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন। প্রতিটি কথার শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা যাচাই করেছেন। তারপর তাদের সেই গবেষণার ফসল পাঠকদের হাতে তুলে ধরেছেন।

বাংলাভাষাতেও গ্রন্থটি অনুবাদ করার প্রয়াস পেয়েছেন এ মাটির আলো-বাতাসে বেড়ে উঠা প্রখর মেধা ও ক্ষুরধার লেখনীর অধিকারী অনেক বিদগ্ধ আলেম-মনীষা। কেউ এক খণ্ডে। কেউ বা বহু খণ্ডে। তাদের

সেসব মহৎ প্রচেষ্টার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে আমরা বইটির আধুনিক সংস্করণের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ তুলে দেওয়ার প্রয়াস চালিয়েছি। অনুবাদে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ রাখা হয়েছে।

- প্রামাণ্য ও বিখ্যাত গ্রন্থাদি থেকে এর প্রতিটি কথার উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে।
- উদ্ধৃত গ্রন্থের শুধু নামই নয়; খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বরসহ উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে।
- হাদিসের ক্ষেত্রে হাদিস গ্রন্থের নাম এবং হাদিস নং উল্লেখ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
- পাঠককে দ্বিধান্বিত করে তুলতে পারে এমন বক্তব্যগুলোর (পাদটীকায়) সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে ।
- উর্দু থেকে অনুবাদ না করে সরাসরি আরবি মূল গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

বইটি সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও নির্ভুল করতে দারুত তাকবীর সম্পাদনা পরিষদ নিরলস পরিশ্রম করেছে। একইসঙ্গে কম্পিউটার বিভাগে কর্মরত সহকর্মীবৃন্দ অশেষ শ্রম ব্যয় করেছে। তাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাআলা তাদের কাজের সর্বোত্তম জাযা দান করুন।

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। সবার আন্তরিক প্রচেষ্টার পরও অনেক জায়গায় অপূর্ণতা থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই কোথাও কোনো ভুল বা অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে আমরা সেগুলো শোধরানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ!

আল্লাহ আমাদের সবাইকে জগৎশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমাম গাযালি (র)-এর অমর রচনা 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' থেকে যথাযথ উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মুফতি নূরে আলম

১০.০৮.২০২০

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতি একমাত্র আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদের ঈমানের মতো মহান দৌলত দান করেছেন এবং সত্য সহজ সুন্দর দীনের অনুসারী করেছেন। দরূদ ও সালাম তাঁর প্রিয় রাসূল এবং রাসূলের পরিবারবর্গ ও তাঁর অনুসারীদের উপর।

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' শীর্ষক গ্রন্থটি কুরআন সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী মহান ব্যক্তিদের বক্তব্যের আলোকে দীন ইসলামের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে লেখা। চার খণ্ডে রচিত মূল গ্রন্থে শুধু ইবাদত, মুআমালাত, আখলাক, আদব বিষয়ক আলোচনাই স্থান পায়নি। আধ্যাত্মিক এবং আত্মিক বিষয়াদিও আলোচিত হয়েছে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলো বিশ্লেষণের পাশাপাশি তাদের কল্যাণ ও মুক্তির বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও হৃদয়গ্রাহী করে।

এতে শরিয়তের মৌলিক ইবাদতগুলোর সারনির্যাস যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি মনোজগতের বিভিন্ন অবস্থার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যাও প্রবল প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। তাই গ্রন্থটি রচনার পর থেকে বিগত নয়শ বছর যাবৎ বিশ্বের বিভিন্ন শ্রেণির মুসলিমদের নিকট ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আল্লাহর পবিত্র কালাম ও রাসূলের পবিত্র হাদিসের পর আর কোনো গ্রন্থ সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের নিকট ইমাম গাযালি (র)-এর এই গ্রন্থটির মতো সমাদৃত হয়নি। এ গ্রন্থের বিস্ময়কর গ্রহণযোগ্যতাই এর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে।

দারুত তাকবীর কর্তৃপক্ষ এ মূল্যবান গ্রন্থটি সিরিজ আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সিরিজের সতেরোতম খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন মুফতী নূরে আলম।

আলহামদুলিল্লাহ! গ্রন্থটি আমাদের আগাগোড়া সম্পাদনা এবং নিরীক্ষণ করার সুযোগ হয়েছে। এতে 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ চলে এসেছে। সেই সাথে প্রতিটি কথার উদ্ধৃতিও তুলে ধরা হয়েছে। এদিক থেকে বইটি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হয়েছে। তবে মানবসুলভ ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সে ক্ষেত্রে আমরা পাঠক সাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

সৃজনশীল ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশন 'দারুত তাকবীরকে স্বাগত জানাই প্রকাশনা জগতে যাত্রার সূচনাতে এমন বৃহৎ একটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ এবং উম্মতের সামনে বিশুদ্ধ ও নান্দনিকরূপে গ্রন্থটি পেশ করার জন্য।

আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটি থেকে আমাদের সকলকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং এর উসিলায় দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াব করুন। আমিন।

সম্পাদনা পরিষদ
১০.০৮.২০২০

সম্পাদনা পরিষদ

- **মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ**
  শিক্ষাসচিব, মারকাযুল কুরআন বাংলাদেশ, ঢাকা

- **মাওলানা শফীকুল ইসলাম**
  শিক্ষাসচিব, কদম রসূলপুর মাহমুদুল উলূম মাদরাসা, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ
  সাবেক সহসম্পাদক, মাসিক মদীনা ও সাপ্তাহিক মুসলিমজাহান

- **মুফতি মাহদী হাসান**
  উস্তায, মাদরাসা কাসেমিয়া, জামতলা, ময়মনসিংহ

- **মুফতি নূরে আলম**
  মুহাদ্দিস, জামেয়া আরাবিয়া আশরাফিয়া, মিরপুর-১২, ঢাকা

- **মাওলানা ইয়াসিন বিন ইউসুফ**
  উস্তায, মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম, শ্যামলী, ঢাকা

- **মুফতি কাজী মঈনুল হক**
  উস্তায, মাদরাসাতুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, নবীনবাগ, খিলগাঁও, ঢাকা

ফেদায়ে মিল্লাত হযরত আসআদ মাদানী (র)-এর খলিফা মালিবাগ জামিয়ার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল আসআদ ও মাদানী কমপ্লেক্স-এর মহাপরিচালক, **মুফতি হাফীজুদ্দীন দা.বা.-এর**

দুআ ও বাণী

সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি পরম দয়ালু ও চির দয়াময়। দরূদ ও সালাম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যিনি মানবতার মুক্তির দিশারি ও চিরশান্তির অগ্রদূত।

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থটি আকাশসম গুণের অধিকারী, জগদ্‌বিখ্যাত দার্শনিক ও যুগশ্রেষ্ঠ সংস্কারক ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ গাযালি (র) বিরচিত। তিনি ইসলামি ইতিহাসের একজন মহান জ্ঞানতাপস ব্যক্তিত্ব। মুসলিম উম্মাহর গর্ব ও শ্রদ্ধার পাত্র। উম্মতে মুহাম্মদির যে সকল মহামনীষীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর অগণিত বান্দাকে সরল, সঠিক ও সত্য পথের দিশা দিয়েছেন এবং ঈমান ও বিশ্বাসের আলোয় আলোকিত করেছেন ইমাম গাযালি (র) তাঁদের অন্যতম। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো শুধু গ্রন্থ নয়, যেন এমন আবে হায়াত—যা পান করে মানুষ নবজীবন লাভ করে। সকল শ্রেণির মুসলিম পাঠকের কাছে তাঁর গ্রন্থগুলো বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে।

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' তাঁর একটি বিখ্যাত ও অমর গ্রন্থ। এতে মানবজীবনের যাবতীয় দিক আলোচিত হয়েছে প্রাজ্ঞোচিতভাবে। সেই সাথে দীনের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস এবং ইবাদতের বিষয়গুলোর সারবত্তা তুলে ধরা হয়েছে নিগূঢ় তত্ত্ব, যুক্তি ও দর্শনের আলোকে। বাজারে এর একাধিক অনুবাদ পাওয়া যায়। তবে সময়ের প্রেক্ষিতে গ্রন্থটি নিয়ে আরও বিপুল কাজ হওয়া প্রয়োজন।

এ শূন্যতা পূরণে অভিজাত পুস্তক প্রকাশন দারুত তাকবীরের ভূমিকা খুবই প্রশংসনীয়। তারা বইটির আধুনিক সংস্করণ প্রকাশে এগিয়ে এসেছে। এ গ্রন্থে প্রতিটি হাদিস ও আছারের তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এ সিরিজের সতেরোমত বইটি অনুবাদ করেছেন তরুণ আলেম স্নেহভাজন মুফতি নূরে আলম। বইটি আমার এক নযর পড়ার সুযোগ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! অনুবাদ ঝরঝরে ও সাবলীল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা দারুত তাকবীরের এই খেদমতটুকু কবুল করুন এবং সকলশ্রেণির মানুষকে এর থেকে কাঙ্ক্ষিত জীবনের আলো গ্রহণ আলোকিত জীবন গড়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

(মুফতি হাফীজুদ্দীন)

সূচিপত্র

বিষয়.....পৃষ্ঠা

আল্লাহর মহব্বত, অনুরাগ নৈকট্য ও সন্তুষ্টি

আল্লাহর প্রতি বান্দার মহব্বত; শরিয়তের দলিল-প্রমাণ..... ১৭
মুহাব্বতের প্রকৃতি ও আসবাব..... ২৩
আল্লাহ তাআলাই একমাত্র মুহাব্বতের হকদার..... ৩৩
আল্লাহর মারেফাত ও দীদার সবচেয়ে বড় আনন্দ..... ৪৮
দুনিয়াতে মারেফাত বেশি হলে আখেরাতে আল্লাহর
দীদারের আনন্দ বেশি হবে..... ৫৮
আল্লাহর মহব্বত মজবুত হওয়ার পদ্ধতি..... ৬৭
মহব্বতের ক্ষেত্রে মানুষের স্তর ভেদের কারণ..... ৭৭
আল্লাহর মারেফাত সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির-অক্ষমতা..... ৭৯
আল্লাহর প্রতি অনুরাগের স্বরূপ..... ৮৪
বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা..... ৯৬
আল্লাহর প্রতি বান্দার মুহাব্বতের আলামত..... ১০৩
আল্লাহর প্রতি নৈকট্যের স্বরূপ..... ১৩৩
নৈকট্যের প্রাবল্যের..... ১৩৬
রিযার স্বরূপ..... ১৪৫
রিযার ফযিলত..... ১৪৬
রিয়া সম্পর্কে হাদিসের হাণী..... ১৪৮
রিয়া সম্পর্কে মনীষীদের বাণী..... ১৫২
রিযার হাকীকত..... ১৫৫
দুআ রিযার পরিপন্থি নয়..... ১৬৮

গুনাহের কেন্দ্র থেকে পলায়ন ১৭৬
মুহিব্বীনের কাহিনি ১৮০
মহব্বত সম্পর্কিত কিছু কথা ১৯১

চিন্তা-ফিকির

চিন্তা-ফিকিরের ফযিলত ১৯৮
চিন্তাভাবনার স্বরূপ ও ফলাফল ২০৪
চিন্তা-ফিকিরের উপকারিতা ২০৫
ফিকিরের রাস্তাসমূহ ২০৮
সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা ফিকির করার নিয়ম-পদ্ধতি ২২৩

◖] সপ্তদশ খণ্ড সমাপ্ত [◗

আল্লাহর মহব্বত ও চিন্তা-ফিকির

আল্লাহর মহব্বত, অনুরাগ, নৈকট্য ও সন্তুষ্টি

আল্লাহ তাআলার মহব্বত হচ্ছে সকল মকামের চূড়ান্ত সীমা এবং সর্বোচ্চ মর্তবা। কারণ, মহব্বতের পর 'শওক' (আগ্রহ), 'উন্‌স' (অনুরাগ), 'রিযা' (সম্মতি) ইত্যাদি যত মকামই আসুক, সবই মহব্বতের অনুগামী ও ফল। মহব্বতের পূর্বে তাওবা, সবর, যুহদ ও অন্যান্য যত মকাম রয়েছে, সবই মহব্বতের ভূমিকা। অন্যান্য মকামের অস্তিত্ব বিরল হলেও সব অন্তরে সেগুলোর সম্ভাবনা থাকে এবং সেগুলোর সম্ভাব্যতার বিশ্বাস থেকে কোনো অন্তর শূন্য নয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার মহব্বতে বিশ্বাস স্থাপন করাই কঠিন। এমনকি, কোনো কোনো আলেম এর সম্ভাবনা অস্বীকার করে বলেছেন– অব্যাহতভাবে তাঁর আনুগত্য করে যাওয়াই খোদায়ী মহব্বত। তাঁর প্রতি সত্যিকার মহব্বত অসম্ভব। কেননা, মহব্বত সমজাতি ও সমশ্রেণির প্রতি হয়ে থাকে। তাঁরা মহব্বত অস্বীকারের পর মহব্বতের অপরিহার্য বিষয়াবলি যেমন উন্‌স, শওক, রিযা ইত্যাদিও অস্বীকার করে বসেছেন। তাই আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি।

এপর্বে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করব :

- মহব্বত বিষয়ে শরয়ি দলিল-প্রমাণ-সাক্ষ্য
- মহব্বতের হাকিকত ও আসবাব বা কার্যকারণ
- মহান আল্লাহই একমাত্র ভালোবাসার যোগ্য
- মহান আল্লাহর দর্শনই সবচেয়ে বড় এবং সর্বোৎকৃষ্ট স্বাদের বিষয়
- দুনিয়াতে মারেফাত অর্জন যার যত বেশি হবে, আখেরাতে মহান আল্লাহর দর্শনের স্বাদও ততবেশি হবে
- মহান আল্লাহর ভালোবাসা বৃদ্ধি ও শক্তিশালি করার উপকরণসমূহ
- ভালোবাসায় মানুষের স্তর ভিন্নতার কারণ
- আল্লাহর মারেফাত সম্পর্কে জ্ঞান বুদ্ধির অক্ষমতা
- আল্লাহর প্রতি অনুরাগের স্বরূপ
- বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার বিবরণ
- আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসার নিদর্শন
- আল্লাহর নৈকট্যের স্বরূপ
- রিযা ও রিযার ফজিলত এবং রিযার হাকিকত
- দুআ এবং গুনাহ অপছন্দ করা রিযার পরিপন্থি নয়, এমনিভাবে গুনাহ থেকে পলায়ন
- মুহিব্বীন সম্পর্কে কিছু কথা ও ঘটনা

আল্লাহর প্রতি বান্দার মহব্বত;
শরিয়তের দলিল-প্রমাণ-সাক্ষ্য

উম্মাতে মুসলিমার সকলে এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি বান্দার মহব্বত থাকা ফরয। সুতরাং, যদি মহব্বতের অস্তিত্বই না থাকে, তাহলে তা ফরয হবে কীভাবে? এছাড়া যারা আনুগত্যের দ্বারা মহব্বতের ব্যাখ্যা করেন, তাও তারা কীভাবে করেন? কারণ, আনুগত্য তো মহব্বতের অনুগামী ও ফল। প্রথমে মহব্বত অস্তিত্ব লাভ করবে, এরপর মহব্বতকারী ভালোবাসবে।

মহব্বত প্রমাণিত হয় মহান আল্লাহর এ বাণী থেকে,

يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ.

যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালোবাসবে। (সূরা মায়েদা : ৫৪)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ.

যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় তারা সুদৃঢ়। (সূরা বাকারা : ১৬৫)

এ আয়াতদ্বয় থেকে মহান আল্লাহর প্রতি মহব্বত এবং তাঁর প্রতি মহব্বতের ক্ষেত্রে মানুষের স্তর ভিন্নতা প্রতীয়মান হয়। রাসূলুল্লাহ (স) অসংখ্য হাদিসে আল্লাহর প্রতি মহব্বতকে ঈমানের শর্ত বলেছেন। ঈমান কী, আবু রাযীন ওকায়লীর এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন– তোমার কাছে দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা আল্লাহ ও রাসূল অধিকতর প্রিয় হওয়া। (মুসনাদে আহমদ : ৪ : ১১)

এক হাদিসে আছে–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا.

তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তার কাছে আল্লাহ ও রাসূল দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হবেন। (মুসনাদে আহমদ : ১৩১৫১)

অন্য একটি হাদিসে আছে–

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ اَهْلِهٖ وَمَالِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

অর্থাৎ, বান্দা ঈমানদার হবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার পরিবার, ধনসম্পদ ও সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিকতর প্রিয় হব। এক রেওয়ায়াতে وَمِنْ نَّفْسِهٖ অর্থাৎ, "তার নিজের চেয়েও অধিক" বলা হয়েছে। (সহিহ মুসলিম : ৪৪)

অবশ্যই এমন হতে হবে এবং তা-ই হওয়া প্রয়োজন। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللهُ بِاَمْرِهٖ.

আপনি বলুন; তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের সন্তানাদি, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের আত্মীয়স্বজন, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা করো এবং তোমাদের পছন্দনীয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। (সূরা তাওবা : ২৪)

নিশ্চিত জেনে রাখুন, শাসনের সুরেই কুরআনে একথা বলা হয়েছে। নবী কারিম (স)-ও এ মহব্বতের আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

أَحِبُّوا اللهَ لِمَا يَغْذُوْكُمْ مِنْ نِعَمِهٖ وَأَحِبُّونِيْ بِحُبِّ اللهِ.

অর্থাৎ, আল্লাহকে মহব্বত করো। কেননা, তিনি প্রতিদিন সকাল বেলা তোমাদের নিজের নিয়ামতে ভূষিত করেন, আর আমাকে মহব্বত করো এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে মহব্বত করেন। (জামে তিরমিযি : ৩৭৮৯)

এক বর্ণনায় আছে– এক লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এসে নিবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে মহব্বত করি। তিনি বললেন, তাহলে দরিদ্রতার জন্য প্রস্তুত থাকো। লোকটি পুনরায় বলল, আমি আল্লাহকে মহব্বত করি। তিনি বললেন, তাহলে বিপদাপদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

ওমর (রা) রেওয়ায়াত করেন, রাসূলে আকরাম (স) মুসআব ইবনে ওমাইরকে কোমরে একটি ভেড়ার চামড়া পেঁচিয়ে আসতে দেখে উপস্থিত জনতাকে বললেন, এ লোকটিকে দেখো, আল্লাহ তাআলা তার অন্তর উজ্জ্বল করে দিয়েছেন। আমি তাকে দেখেছিলাম তাঁর পিতা-মাতার নিকট। তারা তাকে উৎকৃষ্ট খাবার ও সুপেয় পানি দিত। এখন আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত তাকে এই স্তরে পৌঁছে দিয়েছে, যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ। (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৫৭৭৯)

মশহুর হাদিসে বর্ণিত আছে, মৃত্যুর ফেরেশতা ইবরাহীম (আ)-এর রূহ কবয করতে এলে তিনি বললেন, আপনি কি এমন কোনো বন্ধুকে দেখেছেন, যে তার বন্ধুর প্রাণ কেড়ে নেয়? জবাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে ওহি পাঠালেন– তুমি কি এমন কোনো মহব্বতকারীকে দেখেছ, যে তার হাবীবের সাথে সাক্ষাতকে খারাপ জ্ঞান করে? এরপর ইবরাহীম (আ) আজরাইল (আ)-কে বললেন, এখন রুহ কবয করুন। (আবুশ শায়খকৃত আল আযমত : ৪৪৮)

এ বিষয়টি সে বান্দার কাছেই প্রতিভাত হয়ে ওঠে, যে আল্লাহকে সর্বান্তকরণে মহব্বত করে। সে যখন বুঝে, মৃত্যু সাক্ষাতের ধাপ, তখন তার অন্তর মৃত্যুর জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। আল্লাহ ব্যতীত মনোযোগ দেওয়ার জন্য কোনো প্রেমাস্পদ তার থাকে না। রাসূলুল্লাহ (স) দুআ করতেন—

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالْعَمَلَ الَّذِيْ يُبَلِّغُنِيْ حُبَّكَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ وَأَهْلِيْ، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আপনার মহব্বত কামনা করি এবং সে লোকের মহব্বত, যে আপনাকে মহব্বত করে এবং এমন আমল প্রার্থনা করি, যা আমাকে আপনার ভালোবাসার নৈকট্য দান করবে। হে আল্লাহ! আপনার মহব্বতকে আমার নিকট আমার নিজের, পরিবারের এবং শীতল পানির চেয়েও অধিক প্রিয় করুন। (জামে তিরমিযি : ৩৪৯০)

এক গ্রাম্যলোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এসে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ? লোকটি বলল, আমি আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন,

اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ.

অর্থাৎ, তুমি যাকে মহব্বত করো, তার সঙ্গে থাকবে।

আনাস (রা) বলেন, এর পূর্বে মুসলমানদের আমি এত খুশি হতে দেখিনি, এ কথা শুনে তাঁরা যতটুকু খুশি হন। (সহিহ মুসলিম : ২৬৩৯)

আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, যে লোক আল্লাহ তাআলার খাঁটি মহব্বতের স্বাদ পায়, সে স্বাদ তাকে দুনিয়াদারি থেকে দূরে রাখে এবং সমস্ত মানুষ থেকেও। (তাহযীবুল আসরার : ৯৫)

হাসান (র) বলেন, যে ব্যক্তি তার রবকে চিনবে, সে তাঁকে ভালোবাসবে। আর যে দুনিয়া সম্পর্কে জানতে পারবে, সে তা থেকে বিরত থাকবে। মুমিন কখনো অনর্থক কাজে লিপ্ত হয় না। যখন সে চিন্তাভাবনা করে তখন বিষণ্ন হয়। (যুহদ, ইবনুল মুবারক : ২০৯)

আবু সোলায়মান দারানী (র) বলেন, আল্লাহর এমন কিছু বান্দা রয়েছেন, জান্নাত ও তার নেয়ামত তাদেরকে আল্লাহ হতে বিরত রাখতে পারে না। সুতরাং দুনিয়া কীভাবে তাদেরকে বিরত রাখবে? (হিলইয়াতুল আউলিয়া : ১০ : ১৮)

বর্ণিত আছে, ঈসা (আ) তিনজন লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের শরীর ছিল ক্ষীণ এবং রং বিবর্ণ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এ অবস্থা কেন? তারা বললো, জাহান্নামের আগুনের ভয়ে। তিনি বললেন, যারা ভয় রাখে, আল্লাহ তাদের অবশ্যই নিরাপদে রাখবেন। এরপর তিনি

সামনে এগিয়ে গিয়ে আরও তিন লোকের সাক্ষাৎ পেলেন, যাদের শরীর আরও শীর্ণ ও রং আরও বিবর্ণ ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এই দুরবস্থা কেন? তারা বলল, জান্নাতের আশায় আমাদের এ অবস্থা হয়েছে। তিনি বললেন, তোমরা যে জান্নাত কামনা করো, আল্লাহ অবশ্যই তা দান করবেন। এরপর তিনি আরও এগিয়ে তিন লোকের দেখা পেলেন। তাদের অবস্থা পূর্বোক্ত দুদলের চেয়ে আরও করুণ ছিল। কিন্তু তাদের চেহারায় যেন বেহেশতী নূরের আভা ঝলমল করছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী কারণে তোমরা এমন হয়েছ? তারা বলল, আমরা আল্লাহ তাআলাকে মহব্বত করি। ঈসা (আ) ইরশাদ করলেন, তোমরাই নৈকট্যশীল। (হিলইয়াতুল আউলিয়া : ১০ : ৮)

আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যায়েদ (র) বলেন, আমি এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে বরফের ওপর শুয়ে ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি বরফের ঠান্ডা অনুভব করো না? সে বলল, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার মহব্বতে সারাক্ষণ গরম থাকে, সে ঠান্ডা অনুভব করে না।

সিররী সিকতী (র) বলেন, যাদের মাঝে আল্লাহ তাআলার মহব্বত প্রবল নয়, কিয়ামাতের দিন নবীদের নামে তাদের ডাকা হবে। যেমন বলা হবে– হে উম্মতে মূসা, হে উম্মতে ঈসা এবং হে উম্মতে মুহাম্মদ! কিন্তু মহব্বতকারীদের ডাকা হবে এভাবে– হে আল্লাহর অলী! আল্লাহর দিকে চলো। এতে তাদের মন আনন্দে বাগবাগ হয়ে যাবে। (তাহযীবুল আসরার : ৯৯)

হরম ইবনে হাইয়ান (র) বলেন, ঈমানদার লোক যখন তার পরম প্রভুকে চেনে, তাকে মহব্বত করে। যখন মহব্বত করে, তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করে। যখন সে এই মনোনিবেশের স্বাদ পায়, দুনিয়ার দিকে প্রবৃত্তির দৃষ্টিতে তাকায় না এবং পরকালের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে না। শারীরিকভাবে সে দুনিয়াতে থাকলেও তার আত্মা থাকে পরকালে। (তাহযীবুল আসরার : ১০২)

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায (র) বলেন, মহান আল্লাহর ক্ষমার বিশালতাই সব গুনাহ মুছে দেয়, তাহলে তাঁর সন্তুষ্টির বিশালতা কেমন? তাঁর সন্তুষ্টি সবরকম আশা-প্রত্যাশা পূরণ করে। তাহলে তাঁর ভালোবাসা কেমন? তাঁর মহব্বত মানুষের আকল-বুদ্ধি বিমূঢ় করে। তাহলে তাঁর নৈকট্য কেমন?

তাঁর নৈকট্য তাঁকে ছাড়া সব ভুলিয়ে দেয়। তাহলে তাঁর অনুগ্রহ কেমন? (তাহযীবুল আসরার : ১০২)

পূর্ববর্তী কোনো এক কিতাবে আছে, হে আমার বান্দা! আমি তোমার প্রতি মহব্বত রাখি। সুতরাং তোমার ওপর আমার হক হলো, তুমিও আমার প্রতি মহব্বত রাখো। (তাহযীবুল আসবার : ৯৯)

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায (র) বলেন, সরিষার দানা পরিমাণ আল্লাহর মহব্বত আমার চোখে মহব্বতবিহীন সত্তর বছর ইবাদতের চেয়ে উত্তম। (আররিসাতুল কুশায়রিয়্যা : ৫২৭)

তিনি আরও বলেন, প্রভু! আমি আপনার দরজায় দণ্ডায়মান, আপনার প্রশংসায় মগ্ন। আমার মতো নগণ্যকে আপনার দিকে টেনে নিয়েছেন। আপনার মারেফাত দিয়ে আমাকে আচ্ছাদিত করেছেন। আপনার অনুগ্রহের নিচে আমাকে স্থান দিয়েছেন। আমলের ক্ষেত্রে আমাকে পরিবর্তন করেছেন। আমার গুনাহ গোপন করেছেন, আমাকে তাওবার সুযোগ দিয়েছেন। আমাকে যুহদ, শাওক, রিযা ও মহব্বত দিয়েছেন। আপনার হাউয থেকে আমাকে পান করিয়েছেন।

আপনার আদেশ আঁকড়ে ধরার এবং আপনার বাণীতে ডুবে গিয়ে আমাকে আপনার বাগানে প্রবেশের সুযোগ দিয়েছেন। অতঃপর যখন আমার ঠোঁট ভিজে গেল, আমার মন আলোকিত হলো, এখন কীভাবে আমি আপনার এ মহান দানকে ছোটো বা সামান্য এবং নিজেকে বড় মনে করে আপনার দরবার থেকে ফিরে যাব?!

সুতরাং এখন আমার একটাই কাজ, যতদিন বেঁচে থাকি আপনার দরজায় গুণগুণ করব এবং গুণগুণ শব্দে ক্রন্দন করব। কারণ, আমি আপনাকে মহব্বত করি, আর প্রত্যেক প্রেমিকই প্রেমাস্পদের ভালোবাসায় নিমজ্জিত এবং অন্যদের থেকে বিমুখ থাকে।

মোটকথা, আল্লাহ তাআলার মহব্বত সম্পর্কে হাদিস ও মনীষীদের বাণী এত বেশি যে, সেগুলো গণনা করে শেষ করা যায় না। এটি একটি সুস্পষ্ট বিষয়। অস্পষ্টতা থাকলে তা রয়েছে মহব্বতের অর্থ ও স্বরূপ নিরূপণের ক্ষেত্রে। তাই আমরা সেদিকেই মনোযোগ দিচ্ছি।

মহব্বতের প্রকৃতি ও আসবাব

এখানে আলোচনার উদ্দেশ্য বোঝার জন্য প্রথমে মূল মহব্বতের প্রকৃতি, আসবাব ও শর্ত বিষয়ে ভালোভাবে জানতে হবে। অতঃপর আল্লাহর প্রতি মহব্বতের অর্থ ও তার বিশ্লেষণের দিকে নজর দিতে হবে।

প্রথমেই জানা উচিত, চেনাজানা ব্যতীত মহব্বত সৃষ্টি হতে পারে না। মানুষ তাকেই মহব্বত করে, যাকে সে চেনে। জড়-পদার্থ মহব্বত করতে পারে না। কারণ, তার মধ্যে চেনার বা জানার ক্ষমতা নেই। তাই মহব্বত শুধু জীবন্ত প্রাণীর বৈশিষ্ট্য। মানুষ যেসব বস্তু সম্বন্ধে জানে সেগুলো তিন ভাগে বিভক্ত। ১. মানুষের স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও আনন্দদায়ক। ২. মানব-স্বভাবের বিপরীত ও কষ্টদায়ক, ৩. আনন্দ ও কষ্ট কোনো কিছুই দেয় না। এ তিন প্রকার বস্তুর মধ্যে যে জিনিস চিনলে ও জানলে মানুষ সুখ পায়, সে জিনিসই মানুষের প্রিয়তর হয়ে থাকে। আর যে জিনিস চিনলে ও জানলে কষ্ট হয়, সে জিনিস অপ্রিয় হয়ে থাকে। যে জিনিস চেনাজানার পর কষ্টও হয় না, সুখও হয় না, সেটাকে প্রিয়-অপ্রিয় কোনো কিছুই বলা যায় না।

প্রথম মূলনীতি : কোনো জিনিস প্রিয় হওয়ার অর্থ, মানব-স্বভাবে তার প্রতি আকর্ষণ থাকা। আর অপ্রিয় হওয়ার অর্থ, আকর্ষণের পরিবর্তে অবজ্ঞা থাকা। সুতরাং যে জিনিস থেকে সুখ পাওয়া যায়, সে জিনিসের প্রতি স্বভাবের আকর্ষণ থাকার নাম মহব্বত। এই আকর্ষণ যদি শক্তিশালী হয়ে যায়, তবে তাকে বলা হয় ইশক। এ হচ্ছে মহব্বতের স্বরূপ, যা জানা খুবই জরুরি।

দ্বিতীয় মূলনীতি : মহব্বত চেনা ও জানার সাথে সম্পৃক্ত। চেনা ও জানার উপকরণ হচ্ছে ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত বিধায় মহব্বতও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হবে। কারণ, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দিয়ে একটি বিশেষ জিনিসকে চেনা যায় এবং বিশেষ জিনিস থেকেই আনন্দ পাওয়া যায়। যেমন, চোখের আনন্দ দেখার জিনিসের ওপর, কানের আনন্দ মনভোলানো সংগীত ও মন্ত্রমুগ্ধ কণ্ঠস্বরে। নাকের আনন্দ উন্নতমানের সুগন্ধিতে। আস্বাদন শক্তির আনন্দ সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণে। স্পর্শশক্তির আনন্দ কোমলতা স্পর্শে। এসব জিনিস ইন্দ্রিয়কে আনন্দ দেয় বিধায় এগুলো প্রিয়।

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন,

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا : النِّسَاءُ، وَالطِّيْبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ.

দুনিয়ার (তিনটি বস্তু) আমার নিকট প্রিয় করা হয়েছে— সুগন্ধি ও নারী এবং আমার নয়ন শীতল করা হয়েছে নামাযে। (মুসনাদে আমহদ : ১২২৯৪)

এখানে নবীজী (স) সুগন্ধিকে প্রিয় বলেছেন। বলাবাহুল্য, এতে চোখ ও কানের কোনো অংশ নেই; বরং এতে শুধু ঘ্রাণশক্তির অংশ রয়েছে। নারীকে প্রিয় বলা হয়েছে। এতে ঘ্রাণশক্তির অংশ নেই; বরং দৃষ্টিশক্তি ও স্পর্শশক্তির অংশ রয়েছে। তিনি নামাযকে চক্ষু শীতলকারী বলেছেন এবং এই তিন বস্তুর মধ্যে নামাযকে সর্বাধিক প্রিয় বলেছেন। আর একথা জানা যে, পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে নামাযের স্বাদ গ্রহণ করা যায় না; বরং ষষ্ঠ একটি ইন্দ্রিয় আছে, যার স্থান হলো অন্তর, তা দিয়েই কেবল নামাযের স্বাদ উপলব্ধি করা যায়।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের আনন্দে মানুষের সঙ্গে চতুষ্পদ প্রাণীও অন্তর্ভুক্ত। কাজেই, মহব্বতকে শুধু পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে সীমিত রাখলে আল্লাহ তাআলার মহব্বত সৃষ্টি হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ তাআলাকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে চেনা ও জানা যায় না। এ ক্ষেত্রে মানুষের বৈশিষ্ট্য যে মহব্বত, তা অনর্থক সাব্যস্ত হবে এবং ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়— যা দ্বারা মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা এবং যাকে বুদ্ধি, আলো, অন্তর ইত্যাদি বলা যায়, তা মিথ্যা হয়ে যাবে। এটা অবান্তর। কেননা, চর্মচক্ষুর তুলনায় অন্তর্দৃষ্টি অনেক বেশি ক্ষমতাবান। চোখের তুলনায় অন্তর বেশি চেনে ও জানে। অর্থসম্ভার- যা বুদ্ধি দিয়ে জানা যায়, তার সৌন্দর্য চোখে দেখা আকৃতিসমূহের তুলনায় অনেক বেশি। সুতরাং, অন্তর যে সব ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয় অনুভব করে এবং সুখ পায়, সে আনন্দও অধিক পূর্ণাঙ্গ হবে। কারণ, সুস্থ স্বভাবের ঝোঁক সেদিকে অধিক জোরদার হবে। এই ঝোঁকের নামই মহব্বত। এমতাবস্থায় যে আল্লাহর মহব্বতকে অস্বীকার করবে, সে চতুষ্পদ প্রাণীর স্তরে নেমে যাবে অথবা পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে অতিক্রম করতে অক্ষম বলে প্রমাণিত হবে।

তৃতীয় মূলনীতি : এটি স্পষ্ট কথা যে, মানুষ নিজেকে ভালোবাসে এবং একথাও স্পষ্ট যে, মানুষ অন্যকেও নিজের জন্য ভালোবাসে। একি ভাবা

যেতে পারে যে, মানুষ কাউকে নিজের জন্য ভালো না বেসে ওই সত্তার কারণেই তাকে ভালোবাসবে? দুর্বলদের জন্য বিষয়টি বোঝা কঠিন। তারা মনে করে, প্রত্যেক জীবিত মানুষের প্রথম প্রিয় জিনিস হচ্ছে নিজের সত্তা। নিজেকে ভালোবাসার উদ্দেশ্য হলো, তার স্বভাবের মধ্যে নিজ অস্তিত্ব ও তার স্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষা এবং ধ্বংসের প্রতি অনীহা। কেননা, মাহবুব স্বভাবত হাবীবের পছন্দের বস্তু হয়। আর মানুষের জন্য নিজের সত্তা ও অস্তিত্বের স্থায়িত্বের চেয়ে বড় পছন্দের বিষয় আর কী হতে পারে? অপরদিকে নিজের অস্তিত্ব ও ধ্বংসের চেয়ে অপছন্দনীয় বিষয় আর কী হতে পারে? এজন্য মানুষ চিরস্থায়িত্বকে ভালোবাসে এবং মৃত্যু ও হত্যাকে অপছন্দ করে। কেবল মৃত্যুপরবর্তী বিষয়াদি কিংবা মৃত্যুযন্ত্রণার ভয়ে মৃত্যুকে অপছন্দ করে এমন নয়; বরং যদি তাকে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, কোনো প্রকার ব্যাথা ছাড়া তাকে উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং মৃত্যুর পর তাকে কোনো সওয়াব বা শাস্তি দেওয়া হবে না, তবুও সে এ প্রস্তাবে সম্মত হবে না। মানুষ জীবনের প্রতি নিরাশ হলে তবেই মৃত্যু বা অস্তিত্বহীনতাকে পছন্দ করে। যখন মানুষ কোনো বিপদে আক্রান্ত থাকে তখন তার পছন্দের বস্তু হয় বিপদ দূর হাওয়া। বিপদাবস্থায় যদি সে অনস্তিত্বকে ভালোবাসে তবে অনস্তিত্ব হওয়ার কারণে তাকে ভালোবাসছে এমন নয়; বরং এজন্য ভালোবাসে যে, এ অনস্তিত্বের মাঝে তার বিপদমুক্তি নিহিত।

মোটকথা, এজন্যই ধ্বংস ও অনস্তিত্ব মানুষের অপছন্দ আর চিরস্থায়িত্ব পছন্দনীয়। এমনিভাবে চিরস্থায়িত্ব যেমন প্রিয় তেমনি অস্তিত্বের পূর্ণতাও মানুষের প্রিয়।

কেননা, ত্রুটিতে পূর্ণতা পাওয়া যায় না। আর ত্রুটি পূর্ণতার দিক থেকে অনস্তিত্বের মতো। আর তা মূল বস্তুর অস্তিত্বে হোক বা গুণের ক্ষেত্রে হোক অপছন্দের বিষয়। যেমনিভাবে মূল বস্তুর স্থায়িত্ব প্রিয় তেমনি পূর্ণ গুণাবলি থাকাও পছন্দনীয়।

এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের স্বভাব অন্তর্গত। সত্তার মহব্বতের কারণেই মানুষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিরাপত্তা, ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবকে ভালোবাসে। এগুলোর প্রতি মহব্বতের কারণ স্বয়ং এগুলো নয়; বরং এগুলোর দ্বারা নিজের অস্তিত্বের স্থায়িত্ব ও পূর্ণতা নিশ্চিত হয়। এজন্যই মানুষ তার ছেলেকে ভালোবাসে,

যদিও ছেলের দ্বারা তার কোনো উপকার হয় না এবং বিভিন্ন ধরনের কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করতে হয়। কারণ, তার মৃত্যুর পর ছেলেই হবে তার স্থলাভিষিক্ত। সে যেন বংশের স্থায়িত্বের মধ্যেও নিজের এক প্রকার স্থায়িত্ব খুঁজে পায়। কোনো ব্যক্তিকে যদি নিজের মৃত্যু ও পুত্রের মৃত্যুর মাঝে ইচ্ছাধিকার দেওয়া হয় এবং সে সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হয় তাহলে সে সন্তানের বেঁচে থাকার ওপর নিজের বেঁচে থাকাকে অগ্রাধিকার দেবে। কারণ, সন্তানের বেঁচে থাকার কারণে একদিক থেকে তার অস্তিত্ব থাকলেও তা পূর্ণরূপে তার নিজের অস্তিত্ব নয়।

এমনিভাবে আত্মীয়স্বজনের মহব্বত নিজ সত্তার মহব্বতের পূর্ণতার জন্যই হয়ে থাকে। কেননা, আত্মীয়স্বজনের জন্য সে নিজেকে ক্ষমতাবান মনে করে এবং তাদের কৃতিত্বকে নিজের অহংকার মনে করে। এই বক্তব্য থেকে জানা গেল, প্রত্যেক মানুষের নিকট তার সত্তা, সত্তার পূর্ণতা ও তার স্থায়িত্ব মহব্বতের বিষয়। এ হচ্ছে মহব্বতের প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ : মহব্বতের দ্বিতীয় কারণ হলো অনুগ্রহ। কথায় বলে, মানুষ অনুগ্রহের দাস। অনুগ্রহকারীকে মহব্বত করা এবং কষ্ট প্রদানকারীকে ঘৃণা করা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। হাদিসে বর্ণিত আছে,

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عِنْدِىْ يَدًا فَيُحِبُّهُ قَلْبِىْ.

অর্থাৎ, ইলাহী! কোনো পাপাচারীর অনুগ্রহ আমার ওপর রাখবেন না। এতে আমার অন্তর তাকে ভালোবাসবে। (মুসনাদুল ফিরদাউস : ২০১১)

এতে বুঝা যায়, অনুগ্রহকারীকে আন্তরিকভাবে মহব্বত করার বিষয়টি বাধ্যতামূলক। এটি বাদ দেওয়া অসম্ভব। এ জন্যই মানুষ কখনো এমন লোককে মহব্বত করে, যার সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই– নিছক অপরিচিত।

ইহসানও প্রথম কারণের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। কারণ, মুহসিন ওই ব্যক্তি, যে অর্থসম্পদ বা অন্য যে-কোনোভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, যে সহযোগিতা তার স্থায়িত্ব ও পূর্ণ অস্তিত্বের কার্যকারণ। তবে মহব্বতের উক্ত দুই কারণের মধ্যে পার্থক্য হলো, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানুষের প্রিয় হওয়ার কারণ, এটি তার সত্তার সম্পূর্ণ হওয়ার অংশ। পক্ষান্তরে অনুগ্রহকারী প্রিয় হলেও সে উদ্দিষ্ট পূর্ণতার মৌলিক অংশ নয়; বরং ওই পূর্ণতার একটি কারণ মাত্র।

যেমন, একজন চিকিৎসক শরীর-সুস্থতার কারণ। এখানে সুস্থতা উদ্দিষ্ট প্রিয়বস্তু। চিকিৎসক মূল উদ্দিষ্ট নয়। তাকে ভালোবাসা হচ্ছে একারণে যে, সে সুস্থতার একটি কারণ। এমনিভাবে ইলম ও উস্তায দুটিই প্রিয়। পার্থক্য হলো, ইলম সত্তাগত প্রিয় আর উস্তায ইলমের মাধ্যম হওয়ার কারণে প্রিয়। খাবার ও পানীয় প্রিয়। টাকাপয়সাও প্রিয়। কিন্তু খাবার সত্তাগত প্রিয়। আর টাকাপয়সা এজন্য প্রিয় যে, তা দিয়ে খাবার কেনা যায়।

সুতরাং যে অনুগ্রহকারীকে ভালোবাসে, সে মূলত তাকে নয়; বরং তার অনুগ্রহকে ভালোবাসে। এটি তার সত্তা নয়; বরং তার একটি কাজ। যদি এটি শেষ হয়ে যায়, তার প্রতি ভালোবাসাও শেষ হয়ে যাবে। অথচ তখনও তার সত্তার অস্তিত্ব বাকি থাকে। অনুগ্রহ বেড়ে গেলে ভালোবাসাও বেড়ে যাবে। অনুগ্রহ বেশি হওয়া বা কম হওয়া দিয়েই তার ভালোবাসা বাড়বে বা কমবে।

তৃতীয় কারণ : মহব্বতের তৃতীয় কারণ, কোনো বস্তুকে সেই জিনিসের সত্তার কারণে মহব্বত করা, তার নিকট হতে কোনো ফায়দার জন্য নয়; বরং সে জিনিসের সত্তাই সাক্ষাৎ উপকার। এ মহব্বতকে হাকিকি তথা সত্যিকার মহব্বত বলা হয়। এরূপ মহব্বতের স্থায়িত্ব আশা করা যায়। যেমন, রূপ-সৌন্দর্যের মহব্বত শুধু রূপ ও সৌন্দর্যের জন্যেই হয়। এতে সৌন্দর্য চেনা ও অনুভব করাই প্রকৃত আনন্দ।

এখানে এ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, সুশ্রী অবয়বের মহব্বত কাম-বাসনা চরিতার্থ করা ও বাসনা করা ব্যতীত সম্ভব নয়। কারণ, কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা একটি ভিন্ন আনন্দ এবং স্বয়ং রূপও ভিন্ন আনন্দদায়ক বিষয়। যেমন সবুজের সমারোহ এবং প্রবাহিত পানিকে মহব্বত করা হয়, কিন্তু তা এজন্য নয় যে, এগুলোতে পানাহারের ফায়দা রয়েছে। দেখা ছাড়া এগুলোতে অন্য কোনো আনন্দ নেই। রাসূলুল্লাহ (স) সবুজ শ্যামল বনানী ও প্রবহমান পানিকে খুব ভালোবাসতেন। প্রত্যেক সুস্থ মন বাগবাগিচা, ফুল, সুন্দর প্রাণী, মনোহারী ফুল ও ফলের গাছ এবং সুন্দর চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা আনন্দের কারণ মনে করে। এমনকি মানুষ এগুলোর মাধ্যমে মনের দুঃখ দূর করে থাকে। এ ক্ষেত্রে দেখা ছাড়া অন্য কোনো স্বাদ গ্রহণের উদ্দেশ্য থাকে না। সুতরাং এ বিষয়গুলো স্বাদের বস্তু। প্রত্যেক স্বাদের বস্তুই প্রিয় ও মহব্বতের বস্তু।

এমন কোনো রূপ-সৌন্দর্য নেই, যা অনুভব করাতে সুখ নেই। এমন কানো মানুষ নেই যে বলবে, সৌন্দর্য স্বভাবজাত প্রিয়বস্তু নয়। এখন যদি প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আল্লাহ তাআলা সৌন্দর্যশীল, তাহলে যার দৃষ্টিতে তার সৌন্দর্য ফুটে উঠবে, তার নিকট অবশ্যই তিনি মহব্বতের পাত্র হবেন।

হাদিসে বলা হয়েছে—

إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ.

নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন। (সহিহ মুসলিম : ৯১)

চতুর্থ কারণ : মহব্বতের চতুর্থ কারণ স্বয়ং রূপ-সৌন্দর্য। এখানে রূপ ও সৌন্দর্যের অর্থ আলোচনা করা জরুরি। কল্পনা-বিলাসীদের মতে, যার শারীরিক গড়ন, আকার-আকৃতি সঠিক এবং রং উজ্জ্বল গৌর, সে রূপবান ও সুশ্রী। অধিকাংশ মানুষের মতেও দৃষ্টিকে যা আনন্দ দেয়, তা-ই সুন্দর। তাই তাদের ধারণা, যে জিনিস দেখা যায় না, যার আকার-আকৃতি নেই, রং ও বর্ণ নেই এবং কল্পনায় প্রতিষ্ঠিত হয় না, সে সৌন্দর্যশালী হওয়া সম্ভব নয়। যখন সৌন্দর্যশালী নয়, তখন তাকে অনুভব করে তৃপ্তি পাওয়া যাবে না। সুতরাং এমন বস্তু প্রিয় হতে পারে না। এটা তাদের বিরাট ভুল। কেননা, দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়া, গড়ন সুশ্রী হওয়া এবং রং উজ্জ্বল হওয়ার মধ্যেই সৌন্দর্য সীমিত নয়। যেমন— আমরা বলি, এ হাতের লেখা সুন্দর, এ কণ্ঠস্বর সুন্দর। এ ঘোড়াটি সুন্দর। আমরা এ-ও বলি, এ কাপড় সুন্দর, এ পাত্রটি সুন্দর।

সুতরাং বুঝা গেল, অবয়ব ও আকৃতির মধ্যেই সৌন্দর্য সীমিত নয়। যেমন, চক্ষু সুন্দর হস্তলিপি দেখে স্বাদ গ্রহণ করে। সুন্দর কণ্ঠ ও সুন্দর গান শুনে কান আনন্দ পায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সবকিছুই সুন্দর অথবা অসুন্দর। এ বস্তুগুলোতে সৌন্দর্য বলে যে বিষয় আছে, এ সৌন্দর্যের অর্থ কী?

এ বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। তবে এ আলোচনা দীর্ঘ। ইলমুল মুআমালাতের সঙ্গে এর দীর্ঘ আলোচনা উপযোগী নয়। এখানে আমরা মূল বক্তব্য পেশ করব।

প্রতিটি জিনিসের সৌন্দর্যের মাপকাঠি হচ্ছে তার মধ্যে তার যোগ্যতা ও যাবতীয় গুণ থাকা। যখন কোনো জিনিসের মাঝে সম্ভাব্য যাবতীয় গুণের সমাবেশ ঘটবে, তখন সে জিনিস হবে সর্বাঙ্গ-সুন্দর। যদি কিছু গুণের

সমাবেশ ঘটে, তাহলে সৌন্দর্যও সে তুলনায়ই হবে। যেমন— আমরা সে ঘোড়াকে সুন্দর বলব, যার মধ্যে সুন্দর আকার-আকৃতি, রং-ঢং, দ্রুতগতি ইত্যাদি সম্ভাব্য গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

সুন্দর হস্তলিপির জন্য যা প্রয়োজন সব থাকলে তবেই তা সুন্দর হস্তলিপি। প্রত্যেক বস্তুর জন্য সেটাই সুন্দর যেটা তার উপযোগী। মানুষের সৌন্দর্যের জন্য যা উপযোগী, তা দিয়ে ঘোড়া সুন্দর হবে না। কণ্ঠস্বর যা দিয়ে সুন্দর হয় তা দিয়ে হস্তলিপি সুন্দর হবে না। কাপড় যা দিয়ে সুন্দর হয়, তা দিয়ে পাত্র সুন্দর হবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমন।

আপনি যদি বলেন, কণ্ঠস্বর, সুস্বাদু খাবার, সুগন্ধি এ বস্তুগুলো চোখের সৌন্দর্য দিয়ে অনুধাবন করা না গেলেও এগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার বহির্ভূত নয়। এসবই ইন্দ্রিয়-অনুভূত বিষয়। আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যকে কেউ অস্বীকার করে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন বিষয়ের ক্ষেত্রেই সৌন্দর্যকে অস্বীকার করা যায়।

মনে রাখতে হবে, সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত বিষয়াদির মধ্যেও রয়েছে। যেমন, আমরা বলি— এর চরিত্র কত সুন্দর! এ বিদ্যা কত ভালো! ইলম, আকল, সংযম, সাহস-বীরত্ব, তাকওয়া, মহানুভবতা, মানবিকতা এবং অন্য সকল সৎচরিত্র সুন্দর চরিত্রের অন্তর্ভূক্ত। এ চরিত্রগুলোর কোনোটিই পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে অনুভূত হয় না। বরং অন্তর্দৃষ্টির আলো দিয়ে এগুলো অনুধাবন করা হয়। এসকল গুণ মানুষের প্রিয় এবং যারা এসব গুণে গুণান্বিত, তারাও প্রিয়। যেমন— মানুষের এটা মজ্জাগত স্বভাব যে, তারা নবীদের এবং সাহাবায়ে কেরামকে মহব্বত করে। অথচ তাদের কাউকে নিজ চোখে দেখেনি। মাযহাবসমূহের ইমামদের মহব্বতও তেমনই। যেমন, ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক (র) প্রমুখ। কখনো তো এমন পর্যন্ত হয়ে যায় যে, মান্য আদর্শের প্রধান গুরুকে এতটা ভালোবাসে যে, তা ইশক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এতে সে নিজের মাযহাব ও মতপথের সাহায্যে সব ধনসম্পদও খরচ করে ফেলে। তার নেতা ও নেতার অনুসারীদের রক্ষায় যুদ্ধে পর্যন্ত নেমে পড়ে। মাযহাব ঠিক রাখতে গিয়েও তো পৃথিবীতে কত রক্ত ঝরে গেছে।

ইমাম শাফেয়ি (র)-এর কথাই বলি। তাঁর অনুসারীরা তাঁকে বাস্তবে না দেখেও কীভাবে ভালোবাসে? এমনও তো হতে পারে, বাস্তবে তাকে দেখলে তার আকৃতি দেখে তাকে ভালো লাগবে না।

তাঁর প্রতি এমন অত্যধিক ভালোবাসার কারণ কেবলই তাঁর বাতেনি সুরত; বাহ্য আকার-আকৃতি নয়।

বলা বাহুল্য, তাঁদের এই মহব্বত বাহ্যিক অবয়বের আকার-আকৃতির কারণে নয়। বাহ্যিক অবয়ব তো কবেই মাটির সাথে মিশে গেছে। বরং তাঁদের মহব্বতের কারণ হচ্ছে, ধর্মীয় গুণাবলি যেমন, তাকওয়া, ইলম, দীন প্রচার, শরিয়ত সম্পর্কে গবেষণা ইত্যাদি। এসব গুণের সৌন্দর্য অনুভব করা অন্তর্দৃষ্টির আলো ছাড়া অসম্ভব।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি আবু বকর (রা)-কে ভালোবাসে, সে অন্যদের ওপর তাঁকে প্রাধান্য দেয়, অথবা যে আলী (রা)-কে ভালোবাসে, সে অন্যদের ওপর তাঁকে প্রাধান্য দেয় এবং তাঁর জন্য গোড়ামীতে পর্যন্ত লিপ্ত হয়। এ ভালোবাসাসমূহ কেবলই তাঁদের বাতেনি দিককে ভালো লাগার কারণে। যেমন, তাঁদের ইলম, দীনদারি, তাকওয়া, বীরত্ব, মহানুভবতা ইত্যাদি। কেউ আবু বকর (রা)-কে তাঁর রক্ত মাংস-হাড্ডি, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা আকৃতির কারণে ভালোবাসে না। কারণ, এ সবকিছুই হারিয়ে গেছে, পরিবর্তন ঘটেছে এবং নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে গুণে গুণান্বিত হয়ে তিনি সিদ্দীক হয়েছেন, তা এখনো রয়ে গেছে। যেসব গুণে গুণান্বিত হয়ে তিনি সিদ্দীক হয়েছেন, সেগুলো সুন্দর চরিত্রের উৎস। তাঁর সকল আকৃতি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পরও এ গুণগুলো বাকি থাকার কারণে তাঁর প্রতি ভালোবাসা রয়ে গেছে।

এসকল উত্তম গুণের মূল হচ্ছে ইলম ও কুদরত। কেননা, তিনি প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং নিজে কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে এসকল উত্তম গুণ ধারণ করেছিলেন। আর অন্য সকল গুণ ইলম ও কুদরতের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে। এ দুই গুণ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব নয়। এ দুটি গুণ শরীরের এমন এক অংশ যা অবিভাজ্য। যা বাস্তবিকপক্ষে প্রিয়। অবিভাজ্য অংশের কোনো আকৃতি বা রং হয় না, যা চোখের মাধ্যমে দেখা ও বোঝা যাবে, আর ওই কারণে তা প্রিয় হবে। মোটকথা, এ অংশটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায় না। অতএব মানুষের

স্বভাব-চরিত্রে সৌন্দর্য বিদ্যমান। যদি সুন্দর চরিত্র ইলম ও কুদরত ব্যতীত উদ্ভুত না হতো তাহলে তা প্রিয় হওয়ার উপযুক্ত হতো না। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, সুন্দর চরিত্রের উৎসমূলই হলো প্রিয়। যাকে উত্তম চরিত্র ও উত্তম গুণ বলা হয়। যার মূলসূত্র হচ্ছে ইলম ও কুদরতের পূর্ণতা। আর এ উৎসমূল স্বভাবত প্রিয় এবং তা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভূত হয় না।

এমনকি যখন আমরা কোনো অবুঝ শিশুর অন্তরে কোনো উপস্থিত বা অনুপস্থিত, জীবিত বা মৃত ব্যক্তির মহব্বত সৃষ্টি করতে চাইব তখন ওই ব্যক্তির সাহসিকতা, বদান্যতা, ইলম ইত্যাদি প্রশংসনীয় গুণ অতিরঞ্জণ ব্যতীত তাকে বোঝানোর কোনো পথ থাকবে না। যখন শিশুটি আমাদের কথা বিশ্বাস করে নিবে তখন সে অবশ্যই ওই ব্যক্তিকে পছন্দ করবে। যেমন, আমাদের অন্তরে সাহাবিদের ভালোবাসা ও কাফের আবু জাহেল এবং শয়তানের প্রতি ঘৃণা রয়েছে। কারণ, আমরা সাহাবিদের গুণাগুণ ও শয়তানের মন্দত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি। যেগুলো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় না।

যখন মানুষ হাতিমের দানশীলতার কথা শোনে এবং খালিদ (রা)-এর সাহসিকতার ঘটনা শোনে তখন মানুষের অন্তর এমনিতেই তাদের পছন্দ করতে থাকে। ভালোবাসতে থাকে। এটা কোনো বাহ্যিক আকৃতি দেখে নয় এবং কোনো উপকার লাভের আশায়ও নয়; বরং যখন কোনো বাদশাহর ন্যায়পরায়ণতা, দয়া ইত্যাদি আলোচনা করা হয় তখন তার প্রতি ভালোবাসা জন্মে যায়। যদিও বাদশাহ অনেক দূরে থাকে এবং বাদশাহর ইহসান তার পর্যন্ত না পৌঁছায়।

এর দ্বারা বোঝা গেল, ভালোবাসার জন্য এটা জরুরি নয় যে, যাকে ভালোবাসা হবে তার ইহসান প্রথমে পেতে হবে। বরং মুহসিন ব্যক্তি নিজ থেকেই প্রিয় হয়ে থাকে। যদিও তার ইহসান তাকে পছন্দকারী ব্যক্তির কাছে না পৌঁছে। কারণ, প্রত্যেক সুন্দর ও উত্তম বস্তু পছন্দনীয়। আর আকৃতি দু ধরনের হয়ে থাকে। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ। সৌন্দর্য ও উত্তমতা এ দুই আকৃতির মধ্যে থাকে। বাহ্যিক আকৃতি বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা অবলোকন করা যায়। যার অন্তর্দৃষ্টি থাকবে না, সে অভ্যন্তরীণ আকৃতি দেখতে পাবে না, এর দ্বারা আনন্দ পাবে না, একে ভালোবাসবে না এবং এর প্রতি আগ্রহীও হবে না। যার অন্তর্দৃষ্টি বাহ্যিক দৃষ্টির ওপর প্রভাব বিস্তার করবে, তার ভালোবাসা

বাহ্যিক বস্তুর চেয়ে অভ্যন্তরীণ বস্তুর প্রতি বেশি হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি বাহ্যিক সৌন্দর্যের কারণে দেওয়ালের ওপর অঙ্কিত কারুকার্য দেখে তা পছন্দ করে আর যে নবীকে তাঁর অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের কারণে পছন্দ করে, এ দু ব্যক্তির মাঝে আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে।

পঞ্চম কারণ : মহব্বতের পঞ্চম কারণ আত্মিক মিল, যা হাবীব ও মাহবুবের মধ্যে থাকে। প্রায়ই দুব্যক্তির মধ্যে গভীর মহব্বত হতে দেখা যায়; এগুলো কোনো সৌন্দর্য ও উপকার পাওয়ার কারণে নয়; বরং শুধু আত্মিক মিলের কারণে। হাদিস শরীফে আছে–

الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

আত্মাসমূহ হচ্ছে সমবেশিত সৈন্য। এর মধ্যে যেগুলো পরস্পর পরিচিত হয়েছে, সেগুলো পরস্পর মহব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, আর যেগুলো পরিচিত হয়নি, সেগুলো পৃথক হয়ে গেছে। (সহিহ মুসলিম : ২৬৩৮)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে মহব্বতের যে কারণ পাওয়া গেল তা ৫ প্রকার। যথা- (১) নিজের অস্তিত্বের পরিপূর্ণতা ও স্থায়িত্বের মহব্বত, (২) অনুগ্রহের জন্য মহব্বত, (৩) কোনো জিনিসের সত্তার জন্য মহব্বত, (৪) স্বয়ং রূপ-সৌন্দর্যের জন্য মহব্বত এবং (৫) আত্মিক মিলের জন্য মহব্বত। যদি এ কারণগুলো একই ব্যক্তির মধ্যে অবস্থান করে, তাহলে সন্দেহাতীতভাবে মহব্বত বহুগুণ বেশি হবে।

যেমন কোনো ব্যক্তির যদি এমন কোনো সন্তান থাকে, যে একইসঙ্গে সুদর্শন, চরিত্রবান, জ্ঞানী, দক্ষ ব্যবস্থাপক, মাতা-পিতা এবং অন্যান্যদের সঙ্গে উত্তম আচরণকারী, তাহলে এমন সন্তানের প্রতি নিশ্চিতভাবে ভালোবাসা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তানের মধ্যে যে পরিমাণে হবে, ভালোবাসার শক্তিও সে পরিমাণে হবে। এই গুণগুলো যদি পূর্ণতার চূড়ান্ত পর্যায়ের হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে মহব্বতও উচ্চ পর্যায়ের হবে।

আমরা এখন এ নিয়ে আলোচনা করব যে, এ বৈশিষ্টগুলো পূর্ণমাত্রায় কেবল মহান আল্লাহর মাঝেই সমবেত হতে পারে। সুতরাং মহান আল্লাহই একমাত্র মহব্বতে হাকিকির যোগ্য।

আল্লাহ্ তাআলাই একমাত্র মহব্বতের হকদার

মহব্বতের উল্লিখিত পাঁচটি কারণ আল্লাহ তাআলার সত্তা ব্যতীত অন্য কারও মধ্যে একত্রে পাওয়া অসম্ভব। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মহব্বত সবচেয়ে উত্তম। কারণ, তা হুবহু আল্লাহর মহব্বত। আলেম ও মুত্তাকী লোকদের মহব্বতও একইরকম। যেহেতু প্রেমিকের প্রেমও প্রেমাস্পদ হয়ে থাকে। সুতরাং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলেমদের মতে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ মহব্বতের যোগ্য নয়।

এর ব্যাখ্যা হলো, আমরা উল্লিখিত পাঁচটি কারণ উল্লেখ করে প্রমাণ করব যে, এগুলো সব আল্লাহ তাআলার মধ্যেই একত্রে পাওয়া যায়– অন্য কারও মধ্যে পাওয়া যায় মাত্র একটি অথবা দুটি।

আল্লাহর ক্ষেত্রে মহব্বত হলো বাস্তবিক। অন্যদের ক্ষেত্রে ধারণা ও কল্পনা মাত্র। অন্যদের ক্ষেত্রে এটি কেবলই রূপকার্থে, এর কোনো বাস্তবতা নেই। একথা স্পষ্ট হওয়ার পর প্রত্যেক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে দুর্বল চিন্তা ও মনের অধিকারী ব্যক্তিদের ভাবনার বিপরীত দিক স্পষ্ট হয়ে যাবে। কারণ তারা ভাবেন, বাস্তবিক অর্থে আল্লাহকে মহব্বত করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে আমাদের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, বাস্তবতার দাবি হলো, মানুষ একমাত্র আল্লাহকেই ভালোবাসে।

প্রথম কারণ : মানুষ নিজের সত্তাকে মহব্বত করে এবং তার স্থায়িত্ব আশা করে– বরবাদ, নাস্তি ও ত্রুটি চায় না। এটা প্রত্যেক জীবিত মানুষের স্বভাবগত বিষয়। এ থেকে কেউ মুক্ত নয়। এটিই আল্লাহর মহব্বত দাবি করে । কারণ, যে লোক নিজ সত্তা ও রবকে চেনে, অবশ্যই সে জানে, তার অস্তিত্ব তার নিজের তরফ থেকে নয়। আল্লাহর তরফ থেকে তার সত্তার অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও পূর্ণতা। তার অস্তিত্বের স্রষ্টা তিনিই এবং তিনিই পূর্ণতার গুণাবলি সৃষ্টি করে তাকে পূর্ণতা দান করেছেন এবং এ গুণাবলির দিকে পৌঁছানোর উপকরণ এবং সেগুলো ব্যবহারের দিক-নির্দেশনা সৃষ্টি করেছেন। নতুবা মানুষ নিজ সত্তার দিক দিয়ে নিছক নাস্তি। নিজ অনুগ্রহে আল্লাহ তাআলা অস্তিত্ব দান না করলে এবং তাঁর অনুগ্রহ সহায় না হলে অস্তিত্বের পর মানুষ নিঃসন্দেহে ধ্বংস হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ যদি অনুগ্রহ করে সৃষ্টি করার পর অবয়বে পূর্ণতা না দেন, তার পক্ষে পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

মোটকথা, মহাবিশ্বে এমন কিছু নেই যা নিজ শক্তিতে অস্তিত্ববান। চিরঞ্জীব, পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ ব্যতীত। মারেফাত অর্জনকারী লোক যখন নিজের সত্তাকে মহব্বত করবে, আর তার সত্তা অন্যের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভকারী, তখন ওই সত্তাকেও অবশ্যই মহব্বত করবে, যার মাধ্যমে তার সত্তা অস্তিত্ব লাভ করেছে। যদি সে সত্তাকে মহব্বত না করে, তাহলে সে নিজের সত্তা ও পালনকর্তা উভয় ক্ষেত্রেই থাকবে অজ্ঞ। যেহেতু মহব্বত মারেফাত তথা চেনা ও জানার ফলাফল, মারেফাত ভালোভাবে না হলে মহব্বতও ভালোভাবে হবে না। মারেফাত দুর্বল হলে মহব্বতও দুর্বল হবে এবং মারেফাত মজবুত হলে মহব্বতও মজবুত হবে। এজন্যই হাসান বসরী (র) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের পালনকর্তাকে চিনবে, সে তাঁকে মহব্বত করবে এবং যে দুনিয়াকে চিনবে, সে তার প্রতি নির্লিপ্ত হবে।

একথা ভাবাও যায় না যে, মানুষ নিজের সত্তাকে মহব্বত করবে, অথচ রবকে মহব্বত করবে না। কারণ, পালনকর্তার মাধ্যমেই তার সত্তার প্রতিষ্ঠা। যে লোক প্রখর রৌদ্রতাপে অতিষ্ঠ হয়ে ছায়াকে মহব্বত করে, যার মাধ্যমে ছায়া প্রতিষ্ঠা পায়, সে বৃক্ষকেও মহব্বত করবে।

আল্লাহর কুদরতের সঙ্গে অস্তিত্ববান বস্তুগুলোর সম্পর্ক যেমন, গাছের সঙ্গে ছায়ার সম্পর্কও তেমন। এরকমই আলোর সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক। কারণ, সবকিছুই মহান আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বই তার অস্তিত্বের অনুগামী। যেমন, আলোর অস্তিত্ব সূর্যের অনুগামী। ছায়ার অস্তিত্ব ব্যক্তির অনুগামী।

বরং এ উদাহরণ সাধারণ মানুষের ধারণা অনুপাতে সঠিক। কেননা মানুষ মনে করে, আলো সূর্যের প্রভাব, সূর্য থেকে বহমান, সূর্যের কারণে অস্তিত্বশীল, এসবই ভুল ধারণা। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বুযুর্গদের সামনে যে বাস্তবতা প্রকাশ পায় তা হলো, তা আল্লাহর কুদরতের কারণে সৃষ্ট। যেমনিভাবে সূর্য নিজেই আল্লাহর কুদরত থেকে সৃষ্ট। এখানে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কেবলই বুঝানোর জন্য। এতে হাকিকত অনুসন্ধান করা যাবে না।

সুতরাং মানুষ নিজেকে ভালোবাসা যদি স্বভাব-অপরিহার্য হয় তবে যিনি প্রথমে তাকে সৃষ্টি করলেন, তাকে স্থায়িত্ব দিলেন এবং তার মূল সত্তা, গুণাবলি, জাহের-বাতেন ইত্যাদি সবকিছুর অস্তিত্ব দান করলেন, তাঁকেও ভালোবাসা অপরিহার্য। যার অন্তরে এ ভালোবাসা নেই, সে তো প্রবৃত্তি ও

কামনা-বাসনার বেড়াজালে আবদ্ধ। সে তার প্রতিপালক ও স্রষ্টাকে ভুলে গেছে। মহান আল্লাহর মারেফাত সে উত্তমভাবে অর্জন করেনি। তার দৃষ্টি প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এতো দৃশ্যজগত। ভোগের দিক থেকে এখানে মানুষ ও প্রাণী সমান। পক্ষান্তরে ঊর্ধ্বলোকের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ নয়। যেখানে শুধু এমন ব্যক্তিরাই বিচরণ করেন, যারা চারিত্রিক সাদৃশ্যে ফেরেশতাদের কাছাকাছি। গুণাবলিতে যে ব্যক্তি ফেরেশতাদের যত বেশি নিকটবর্তী হবে, ঊর্ধ্বলোকেও তার দৃষ্টি ততবেশি নিবদ্ধ হবে। চতুষ্পদ প্রাণীর জগতের দিকে যতবেশি দৃষ্টি থাকবে, ঊর্ধ্বলোক থেকে তার দৃষ্টি ততবেশি দূরে সরে যাবে।

দ্বিতীয় কারণ : এমন লোককে মহব্বত করা, যে অর্থ ও কথার মাধ্যমে সাহায্য করে এবং দুশমনের দুশমনি দূরীকরণে ও অনিষ্ট প্রতিহতকরণে সাহায্য করে। বলাবাহুল্য, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে এরকম মহব্বত করা যাবে না। কারণ, বাস্তবে পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলাই একমাত্র অনুগ্রহকারী। বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ অপরিসীম। কারও পক্ষেই তা গণনা করা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا.

তোমরা যদি মহান আল্লাহর নেয়ামতসমূহ গণনা করো, তোমরা গুণে শেষ করতে পারবে না। (সূরা নাহল : ৮১)

'কিতাবুশ শুকর' (শোকর পর্বে) এদিকে কিছুটা ইঙ্গিত করেছি। তবে আমরা এখন কেবল এ আলোচনাই করব যে, মানুষ অনুগ্রহ করলে সে মৌলিক অর্থে অনুগ্রহকারী হয় না। মূল ও হাকিকি অনুগ্রহকারী হলেন মহান আল্লাহ তাআলা। কোনো লোক যদি তার সমস্ত ধনসম্পদ তোমাকে দিয়ে দেয় এবং যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করার ক্ষমতা দেয়, তাহলে তুমি মনে করবেন, তা এই লোকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অনুগ্রহ। অথচ তা ভুল। কারণ, কয়েকটি বিষয় রয়েছে এ অনুগ্রহের পেছনে। ১. স্বয়ং অনুগ্রহকারীর অস্তিত্ব। ২. তার ধনসম্পদ থাকা। ৩. সম্পদের ওপর তার অধিকার থাকা এবং ৪. বিশেষভাবে তোমাকে দান করার ব্যাপারে তার ইচ্ছা। তাহলে এই অনুগ্রহকারীকে সৃষ্টি করেছেন কে? কে সৃষ্টি করেছেন তার ধনসম্পদ? কে তার ক্ষমতা ও ইচ্ছার স্রষ্টা? এ প্রেরণা তার মনে কে

সৃষ্টি করেছেন যে, তোমাকে দান করার মধ্যে তার পার্থিব অথবা পারলৌকিক কোনো ফায়দা আছে? এক কথায়, সব প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, আল্লাহ তাআলাই সব সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তার অন্তরে এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, তোমাকে দান করার মধ্যেই তার দুনিয়া ও আখেরাতের উপকার নিহিত। সুতরাং সে তোমাকে দান করতে বাধ্য এবং এর বিপরীত করতেই পারে না। অতএব, সে সত্তাই প্রকৃত অনুগ্রহকারী যিনি তাকে বাধ্য করেছেন তোমার জন্য।

তবে ধনভান্ডার সে লোকের আয়ত্তে থাকাটা ইঙ্গিত দেয় যে, অনুগ্রহকারী সম্ভবত সে লোকই। এ সম্পর্কে জানা আবশ্যক, এ লোক দান করে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের মাধ্যম হয় মাত্র। অর্থাৎ, আল্লাহ তাকে ধনভান্ডার দিয়েছেন তোমাকে দেওয়ার জন্যই। সুতরাং না দিয়ে সে কী করবে? সে তো পয়ঃপ্রণালীর অনুরূপ। পয়ঃপ্রণালী নিজের ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করতে বাধ্য। এখন যদি আপনি তাকে মাধ্যম মনে না করে প্রকৃত অনুগ্রহকারী মনে করে তাকে ধন্যবাদ জানান, তবে আপনি প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ।

তাছাড়া মানুষ যখন অনুগ্রহ করে, নিজের ওপরই অনুগ্রহ করে। অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, মানুষ যখন দান করে, তখন আগেই অনুমান করে নেয় তার বিনিময়– সওয়াবের আকারে পরকালে অথবা দুনিয়াতে দানশীলতার নাম হাসিল করা কিংবা অপরের অন্তর জয় করে তাকে ইচ্ছাভূত করা ইত্যাদি।

মানুষ তার ধনসম্পদ কখনো পানিতে ফেলে দেয় না। কেননা, এতে কোনো উপকারিতা নেই। তদ্রুপ সে তার অর্থ-সম্পদ অন্যের হাতে বিনা স্বার্থে তুলে দেয় না। যখন সে ধনসম্পদ তোমাকে প্রদান করে, তুমি তখন তার উদ্দেশ্য নন; বরং তুমি তার অর্থ গ্রহণ করে তার উদ্দেশ্য লাভের অসিলা হন মাত্র। নিজের প্রতিই সে অনুগ্রহ করে, তোমার প্রতি নয়। তোমাকে দান করে বিনিময়ে সে যা পাবে, তা যদি তার নিকট প্রধান ও অগ্রগণ্য না হতো, তবে তোমার হাতে সে কখনো সম্পদ তুলে দিত না। সুতরাং, দুই কারণে সে মহব্বত ও শোকর পাওয়ার উপযোগী নয়।

১. মহান আল্লাহ তার ওপর এমন কিছু বিষয় চাপিয়ে দিয়েছেন, যার কারণে সে এটা করতে বাধ্য। এর বিপরীত করার ক্ষমতা তার নেই।

ফলে সে বাদশাহর কোষাধ্যক্ষের মতো। কারণ, বাদশাহ কাউকে কিছু দেওয়ার হুকুম করলে সে যদি তা তাকে প্রদান করে, তবে সে অনুগ্রহকারী হিসেবে ধর্তব্য হয় না। কারণ, বাদশাহ যা আদেশ করবেন তা পালনে সে বাধ্য। তার পক্ষে বাদশাহর বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। যদি বাদশাহ তাকে এ পদ থেকে বরখাস্ত করেন, কোনোভাবেই সে রাজকোষ থেকে কাউকে কিছু দিতে পারবে না। এমনিভাবে প্রত্যেক দান-অনুদানকারীকে যদি আল্লাহ সরিয়ে দেন, একটি সরিষার দানাও সে ব্যয় করতে পারবে না। আল্লাহ তার অন্তরে দানের বিনিময়ে দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়টি ঢেলে দিয়েছেন বলেই সে দান করে।

২. যা দান করছে এর বিনিময়ে সে এমন কিছু পাবে যা তার দান অপেক্ষা বহুগুণ উত্তম ও পছন্দনীয়। একজন বিক্রেতাকে যেমন অনুগ্রহকারী বলা যায় না। কারণ, সে এমন বস্তুর বিনিময়ে তা বিক্রি করেছে, যা তার কাছে বিদ্যমান বস্তুর চেয়ে প্রিয়। এমনিভাবে অনুগ্রহকারী বিনিময়ে সওয়াব, প্রশংসা বা অন্য কিছু পায় বিধায় তাকেও অনুগ্রহকারী বলা যাবে না। বিনিময়ের ক্ষেত্রে এ শর্ত নেই যে, বিনিময়ের বস্তুটি অনুভবযোগ্য সম্পদ হতে হবে। বরং আনন্দ ও উপকার এমন এক বিনিময়, যার সামনে অন্য সম্পদ কিছুই নয়। মোটকথা, ইহসান দানের আকৃতিতে হয়ে থাকে। আর দান হলো, সম্পদ এমনভাবে ব্যয় করা, যার বিনিময়ে দানকারীর কোনো উপকার লাভ হয় না। আর তা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে অসম্ভব ব্যাপার। যিনি মানুষের প্রতি ইহসান করে থাকেন তাদেরই উপকারার্থে। এতে আল্লাহর কোনো উপকার লাভের উদ্দেশ্য নেই। কারণ, তিনি এ থেকে অমুখাপেক্ষী।

সুতরাং দান ও ইহসান আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যের দিকে সম্পৃক্ত করা মিথ্যা ও অসম্ভব। দান ও ইহসানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা একক।

যদি স্বভাবগতভাবে মুহসিনের প্রতি ভালোবাসা থাকে তাহলে আরেফের উচিত, একমাত্র আল্লাহকেই ভালোবাসা। কারণ, তিনি ব্যতীত ইহসান অসম্ভব। একমাত্র তিনিই এ ভালোবাসার যোগ্য।

তৃতীয় কারণ : কোনো ব্যক্তিসত্তার অনুগ্রহ না পেয়েও মহব্বত করা। এও মানুষের চরিত্রে রয়েছে। যেমন— এক বাদশাহ সম্পর্কে সংবাদ পাওয়া গেল, তিনি ন্যায়পরায়ণ, প্রজাহিতৈষী। অন্যদিকে আরেক বাদশাহ সম্পর্কে সংবাদ

পাওয়া গেল, তিনি অত্যাচারী এবং প্রজার অধিকার হরণকারী। উভয় বাদশাহ থেকে তুমি এতদূরে অবস্থান করছ যে, তাদের কোনো অনুগ্রহ অথবা জুলুম তোমার কাছে পৌঁছে না। তা সত্ত্বেও তুমি প্রথম বাদশাহকে মহব্বত এবং দ্বিতীয় বাদশাহকে ঘৃণা করবে। এ হলো মুহসিন হওয়ার কারণে একজন মুহসিনকে ভালোবাসা। তাকে এজন্য ভালোবাসছেন না যে, সে তোমার প্রতি ইহসান করেছে। তোমার এই মহব্বতও আল্লাহ তাআলার মহব্বত দাবি করে। এমনকি আল্লাহ চান, তুমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে মহব্বত না করো। কেননা, তিনিই সর্বস্তরের মানুষের প্রতি অনুগ্রহকারী। কারণ, প্রথমত তিনি তাদের অস্তিত্বে এনেছেন। দ্বিতীয়ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি দিয়ে তাদের পূর্ণতা দিয়েছেন। তৃতীয়ত তাদের জীবন পরিচালনায় অত্যাবশ্যকীয় নয়, তবে আরাম আয়েশের জন্য জরুরি এমন অসংখ্য উপকরণও সৃষ্টি করেছেন। চতুর্থত বাহ্যিক সৌন্দর্যের জন্য এমন অসংখ্য উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যেগুলো আবশ্যক বিষয় নয়।

অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গের উদাহরণ : মাথা, কলব, হৃৎপিণ্ড। প্রয়োজনীয় অঙ্গসমূহ যেমন, চোখ, হাত, পা। সৌন্দর্যের উদাহরণ, বাঁকানো ভ্রু, লাল ঠোঁট, রঙিন চোখ ইত্যাদি, যেগুলো না থাকলে অত্যাবশ্যকীয় বা প্রয়োজনীয় কিছু বাদ পড়বে না।

শরীর বহির্ভূত অত্যাবশ্যকীয় নেয়ামতের উদাহরণ : খাদ্য-পানীয়। প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন, ওষুধ, গোশত, ফলমূল ইত্যাদি। বাড়তি আনুষাঙ্গিক বিষয়, যেমন সবুজ গাছগাছালি, রংবেরঙের ফুল, বিভিন্ন সুস্বাদু ফল ও খাবার, যেগুলো জীবন চালনায় অতীব প্রয়োজনীয় কিছু নয়।

এই তিন প্রকার প্রত্যেক শ্রেণির প্রাণীর মাঝেই বিদ্যমান; বরং প্রত্যেক তৃণলতা ও সৃষ্টির সকল অনু-পরমাণুর মাঝে বিদ্যমান। সুতরাং মহান আল্লাহই প্রকৃত অনুগ্রহকারী। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ কীভাবে অনুগ্রহকারী হয়, কারণ সে-ও তো মহান আল্লাহর কুদরতের অনুগ্রহসমূহের একটি অনুগ্রহ। মহান আল্লাহ হলেন হুসন, মুহসিন, ইহসান ও ইহসানের আসবাবের স্রষ্টা। সুতরাং এ কারণগুলো আংশিকভাবে যদি তিনি ব্যতীত অন্য কারও মাঝে পাওয়া যায়, আর তাকে এজন্য ভালোবাসা হয়, তা হবে নিতান্তই অজ্ঞতা। আর যে ব্যক্তি বিষয়টি উপলব্ধি করবে, আল্লাহ ছাড়া সে কাউকে মহব্বত করবে না।

চতুর্থ কারণ : সৌন্দর্যশালীকে মহব্বত করা। এখানে সৌন্দর্য ব্যতীত মহব্বতকারী অন্য কোনো উপকারের ভিত্তিতে মহব্বত করে না। এটাও মানুষের স্বভাবের মধ্যে গণ্য। সৌন্দর্য দুরকম। (ক) বাহ্যিক সৌন্দর্য, যা খালি চোখে দেখা যায়। (খ) অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য, যা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করা যায়। অনুধাবনকারীর কাছে সৌন্দর্য মাত্রই প্রিয়। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যদি অনুভব করা হয়, তবে মহব্বত হবে আন্তরিক। যেমন, নবী, অলী ও সচ্চরিত্রবানদের মহব্বত। এক্ষেত্রে মহব্বত হয়; কিন্তু এই মাহবুবদের চেহারা থাকে দৃষ্টির আড়ালে। তবে অভ্যন্তরীণ মুখমন্ডল অর্থাৎ, দৃষ্টির সামনে থাকে তাদের গুণাবলি। যেমন— কেউ রাসূলুল্লাহ (স) অথবা হযরত আবু বকর (রা) কিংবা ইমাম শাফেয়িকে মহব্বত করলে এর কারণ হবে, তাঁদের গুণাবলি তথা জ্ঞান-গরিমা তাকে মুগ্ধ করেছে। অথচ আল্লাহ তাআলার গুণাবলির কাছে তাঁদের গুণাবলি অসম্পূর্ণ। অতএব, মহব্বত আরও অধিক হবে আল্লাহর গুণাবলির কারণে।

যে ব্যক্তি লেখকের লেখা, কবির কবিতা, চিত্রশিল্পীর অঙ্কন ও স্থপতির স্থাপনার সৌন্দর্য দেখে, এগুলো দেখার পর তাদের অভ্যন্তরীণ সুন্দর বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের ভালোবাসতে শুরু করবে। এসবকিছুরই সারমর্ম হলো ইলম ও কুদরত। সৌন্দর্যে ও মাহাত্ম্যে মালুম যত মর্যাদাবান ও পূর্ণ হবে, ইলমও সেই অনুপাতে অধিক সুন্দর ও মর্যাদাশীল হবে। মাকদুর মর্যাদা ও অবস্থানে যত বড় হয় কুদরতও সেই অনুপাতে বড় হয়।

সবচেয়ে বড় মালুম হচ্ছেন মহান আল্লাহ। তাই সবচেয়ে সুন্দর ও মাহাত্ম্যবান ইলম মহান আল্লাহর মারেফাত। এমনিভাবে যা কিছু মহান আল্লাহর নৈকট্যশীল এবং তাঁর সঙ্গে খাস, সেসবই মহান ও মর্যাদাবান। প্রত্যেকের মর্যাদা মহান আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্কের মাপ অনুযায়ী হয়ে থাকে।

সিদ্দিকগণ, যাঁদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা স্বভাবগত, তাঁদের গুণাবলির সৌন্দর্য তিন বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে :

১. মহান আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, আসমানি গ্রন্থাবলি, রাসূলগণ ও নবীদের আনীত শরিয়ত সম্পর্কে তাঁদের ইলম-জ্ঞান।

২. পথপ্রদর্শন ও সিফাতের মাধ্যমে নিজেদের এবং আল্লাহর বান্দাদের শুদ্ধি ও সংশোধনের ব্যাপারে সক্ষমতা।

৩. কামনা-বাসনা-প্রবৃত্তি ও হীন বিষয় থেকে তাঁদের মুক্ত থাকা। যেগুলো মানুষকে কল্যাণের পথ থেকে বের করে মন্দের দিকে টেনে নেয়।

নবীগণ, ওলামায়ে কেরাম, খোলাফায়ে রাশেদীন ও ন্যায় ইনসাফগার বাদশাহগণও এ জাতীয় গুণ পছন্দ করেন।

উক্ত তিন গুণের মধ্যে প্রথমটি হলো ইলম। মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান সবকিছু বেষ্টনকারী এবং এতে শেষ সীমা বলে কিছু নেই। আসমান ও জমিনে একটি অণুও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। এর সঙ্গে সকল সৃষ্টির জ্ঞানের কোনো তুলনা হতে পারে? মহান আল্লাহ পুরো সৃষ্টিকে সম্বোধন করে বলেছেন,

وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا.

এবং তোমাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে সামান্যই। (সূরা বনি ইসরাঈল : ৮৫)

পুরো সৃষ্টি যদি একসাথে এ সিদ্ধান্ত নেয় যে, একটি পিঁপড়া বা মাছির সৃষ্টি সম্পর্কে যে বিস্তারিত জ্ঞান মহান আল্লাহ রাখেন তা আয়ত্ত করবে তবে তার একশ ভাগের একভাগও অর্জন করতে সক্ষম হবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَاشَآءَ.

আর সমুদয় সৃষ্টি তাঁর ইলমের কোনো বস্তুকেই স্বীয় জ্ঞানের বেষ্টনীতে আনতে পারে না। (সূরা বাকারা : ২৫৫)

মানুষ আল্লাহর ইলম থেকে সেটুকুই নিতে পারে যেটুকু তিনি সৃষ্টিজগতকে দিবেন বলে ইচ্ছা করেন। খুব সামান্য পরিমাণ তিনি সৃষ্টিজগতকে দিয়েছেন। তিনি এটুকু জানিয়েছেন বলেই তারা জেনেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

خَلَقَ الْاِنْسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন। (সূরা আর রহমান : ৩-৪)

সুতরাং যদি ইলমের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য প্রিয় বস্তু হয় এবং ইলম নিজেই যদি গুণান্বিত ব্যক্তির জন্য সৌন্দর্য ও পূর্ণতা হয় তাহলে এই ইলমের

কারণে আল্লাহকেই কেবল ভালোবাসা উচিত। মহান আল্লাহর ইলমের তুলনায় জ্ঞানীগণ যে জ্ঞান রাখেন তা মূর্খতা এবং ইলম না থাকার সমতুল্য; বরং কোনো ব্যক্তি যদি তার সময়ের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী এবং সবচেয়ে বড় মূর্খব্যক্তি কে চেনে তার পক্ষে এটা সম্ভব হবে না যে, ইলমের কারণে অধিক মূর্খব্যক্তিকে ভালোবাসবে আর জ্ঞানী ব্যক্তিকে ভালোবাসবে না। যদিও মূর্খব্যক্তির জীবনযাপন বিষয়ে যৎসামান্য জ্ঞানও থাকে। সর্বাধিক জ্ঞানী ও সবচেয়ে বড় মূর্খের জ্ঞানের পার্থক্য যেটুকু, আল্লাহর জ্ঞান ও পুরো সৃষ্টির জ্ঞানের পার্থক্য আরও বেশি। কারণ, জ্ঞানীব্যক্তি মূর্খব্যক্তি থেকে খুব সামান্য ও সীমিত কিছু জ্ঞানে মর্যাদাবান। মূর্খব্যক্তির চেষ্টা করে তা অর্জন করা সম্ভব। পক্ষান্তরে পুরো সৃষ্টিজগতের ইলমের তুলনায় মহান আল্লাহর ইলম অসীম। কারণ, তাঁর জানা বিষয়ের সীমা নেই। আর সৃষ্টিজগতের জানা বিষয়ের সীমা-পরিসীমা রয়েছে।

দ্বিতীয় গুণ হলো সক্ষমতা। এ-ও এক প্রকারের পূর্ণতা। আর অক্ষমতা হলো অপূর্ণতা। আর সর্বপ্রকার পূর্ণতা, জাঁকজমক, মাহাত্ম্য, সম্মান ও প্রতিপত্তি মহব্বতের বস্তু। তা গ্রহণ করা স্বাদের বিষয়। যেমন, মানুষ আলী (রা), খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)-এর মতো মহাবীরদের বীরত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা শুনে তাদের প্রতি মুগ্ধ হয়। তাদের বীরত্বগাঁথা না দেখেও কেবল শুনেই মনে আনন্দ-শিহরণ জাগে এবং তাঁদের প্রতি অন্তরে ভালোবাসা জন্মায়। কারণ, এটাও এক প্রকার কামালিয়াত বা পূর্ণতা।

সুতরাং এখন তুমি সৃষ্টিজগতের শক্তির সঙ্গে মহান আল্লাহর শক্তিকে তুলনা করো। যে ব্যক্তি সর্বাধিক ক্ষমতাশীল, সবচেয়ে বড় রাজত্বের অধিকারী, সর্বাধিক প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পন্ন প্রবৃত্তি দমনকারী ইত্যাদি, এমন ব্যক্তির সক্ষমতার চূড়ান্ত পর্যায় হলো, সে বড়জোর নিজের ও অন্যদের কয়েকটি গুণের ওপর ক্ষমতাবান। এতদসত্ত্বেও সে নিজের জীবন-মৃত্যু, হাশর-নাশর বা লাভ-ক্ষতির ক্ষমতা রাখে না। বরং সে নিজের চোখকে অন্ধত্ব থেকে, মুখকে মূক হওয়া থেকে, কানকে বধির হওয়া থেকে এবং শরীরকে অসুস্থতা থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তার শক্তির সাথে সম্পর্কিত নিজের ও অন্যের যে বিষয়াদির ওপর সে অক্ষম, সেগুলোও গণনা করার প্রয়োজন নেই। মহাবিশ্ব, ঊর্ধ্বলোক, মহাকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র, পৃথিবী, পাহাড়, সমুদ্র, বাতাস, মেঘের গর্জন, খনিজ সম্পদ, গাছপালা, তৃণলতা, প্রাণীকুল এবং অন্য সব বস্তু তো অনেক দূরের কথা। এসবের একটি অণুর ওপরও মানুষের ক্ষমতা নেই।

নিজের ও অন্যের যেটুকু বিষয়ের ওপর সে ক্ষমতাবান ওই ক্ষমতাও নিজের পক্ষ থেকে নয়, বরং মহান আল্লাহই তার ও তার ক্ষমতার স্রষ্টা। তিনিই তাকে এ শক্তি ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন। যদি সবচেয়ে বড় ফেরেশতা ও সর্বাধিক শক্তিশালী মানুষকে একটি মাছি মারতে দেওয়া হয়, আর মহান আল্লাহ যদি সামর্থ্য না দেন, তাদের পক্ষে উক্ত মাছি মারার শক্তি থাকবে না। যেমন, তিনি পৃথিবীর বড় বাদশাহদের একজন যুল কারনাইন সম্পর্কে বলেন,

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ.

আমি তাকে ভূপৃষ্ঠে রাজত্ব দিয়েছি। (সূরা কাহাফ : ৮৪)

তার বিশাল রাজত্ব আল্লাহ না দিলে হতো না। মহাবিশ্বের তুলনায় পৃথিবী একটি মাটির টুকরার মতো, আর পৃথিবীর মধ্যকার দেশগুলো ওই মাটির টুকরার ধুলির মতো, যেগুলোতে মানুষ বসবাস করে। উক্ত ধুলিও মহান আল্লাহর অনুগ্রহ। সুতরাং আল্লাহর কোনো বান্দার পক্ষে এটা অসম্ভব যে, সে কোনো মানুষকে তার ক্ষমতা, কৌশল, রাজত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তির পূর্ণতার জন্য ভালোবাসবে অথচ মহান আল্লাহকে ভালোবাসবে না। অথচ মহান আল্লাহ ব্যতীত কোনো শক্তি বা উপায় নেই। তিনিই মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিপত্তির অধিকারী, সর্বজ্ঞ ও ক্ষমতাবান। আসমানসমূহ তাঁর ডানহাতে ভাঁজকৃত অবস্থায়। ভূপৃষ্ঠ ও তার মধ্যকার সবকিছু তাঁর কবজায়। সৃষ্টির সবকিছুর ভাগ্য তাঁর কুদরতি হাতে। তাদের একদল থেকে যদি আরেক দলকে নিঃশেষ করে দেন, তাঁর রাজত্ব থেকে অণু পরিমাণও কমবে না। তিনি যদি এরকম সৃষ্টিজগত অসংখ্যবার সৃষ্টি করেন, তাতেও তিনি সামান্য ক্লান্ত হবেন না। সৃষ্টিকর্মে তাঁকে কোনো প্রকার ক্লান্তি, কষ্ট বা ত্রুটি স্পর্শ করে না। সুতরাং তিনি ব্যতীত কোনো ক্ষমতা বা ক্ষমতাশালী নেই। আর তা তাঁর অসংখ্য নিদর্শনের একটি। সুতরাং সৌন্দর্য, জাঁকজমক, মাহাত্ম্য, বড়ত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তি কেবলই তাঁর। যদি মনে করা হয়, কোনো ক্ষমতাশালীকে তার ক্ষমতার কারণে মহব্বত করা উচিত, তবে একমাত্র আল্লাহই আছেন যাকে কুদরতের কামালিয়াতের কারণে মহব্বত করা উচিত।

তৃতীয় গুণ ছিল কামনা-বাসনা এবং হীন ও ন্যাক্কারজনক বিষয় থেকে মুক্ত হওয়া। এ গুণটির কারণেও অন্যের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়। এর

মাধ্যমে মানুষের বাতেনি দিকও সুন্দর হয়। নবী ও সিদ্দিকগণ যদিও সর্ব প্রকার ত্রুটি ও হীন বিষয় থেকে মুক্ত। তথাপি মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কামালে তাকদীসী (পরিপূর্ণ পবিত্রতা) নেই।

সব সৃষ্টির মাঝে কোনো না কোনো ত্রুটি অবশ্যই থাকে। বরং সৃষ্ট বস্তুর অক্ষম ও সৃষ্টি হওয়াই তার মূল ত্রুটি ও ঘাটতি। সুতরাং কামালিয়াত রয়েছে একমাত্র মহান আল্লাহর।

বান্দা ওই পরিমাণ কামালিয়াতই অর্জন করে যা আল্লাহ তাকে দান করেন। বান্দার পূর্ণ কামালিয়াত অর্জন হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, চূড়ান্ত পর্যায়ের কামালিয়াতের সর্বনিম্নস্তর হলো, বান্দা অন্যের বশীভূত ও অন্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত না থাকা, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে অসম্ভব। তিনিই পূর্ণতার ক্ষেত্রে একক। ত্রুটি ও দোষ থেকে পূতপবিত্র।

সুতরাং দোষমুক্তি ও পূতপবিত্রতার এ গুণ যদি পূর্ণ, সুন্দর ও পছন্দনীয় হয় তাহলে এর হাকিকতও একমাত্র আল্লাহর জন্য, অন্য কারও নয়। কারও মধ্যে যদি পূর্ণতা থাকে তাহলে তা অন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে। যেমন, ঘোড়া গাধার চেয়ে পরিপূর্ণ। আর মানুষ ঘোড়ার চেয়ে কম ত্রুটিপূর্ণ। মূল ত্রুটি সবার মধ্যেই আছে। পার্থক্য শুধু ত্রুটির স্তরের ক্ষেত্রে, কারও মধ্যে কম আর কারও মধ্যে বেশি।

মোটকথা, সুন্দর পছন্দনীয় বিষয়। প্রকৃত সুন্দর ওই সত্তা, যার কোনো সমকক্ষ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তিনি চিরন্তন, তাঁর কোনো বিরোধী নেই। তিনি অমুখাপেক্ষী, তাঁর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই।

তিনি সর্বশক্তিমান, যা ইচ্ছা তা-ই করেন। যেমন ইচ্ছা হুকুম দেন। তাঁর ফয়সালা ও হুকুমের কোনো খণ্ডনকারী নেই।

তিনি সর্বজ্ঞানী। আসমান-জমিনের সামান্য বিষয়ও তাঁর ইলমের বাহিরে নয়। মহাপরাক্রমশালী, কোনো অহংকারী, স্বেচ্ছাচারীর গর্দানও তাঁর কুদরতের কবজার বাহিরে যেতে পারে না। কোনো রাজা-বাদশাহ তাঁর কর্তৃত্বের বহির্ভূত নয়। তিনি শাশ্বত, চিরন্তন। তাঁর অস্তিত্বের কোনো শুরু নেই। তিনি চিরস্থায়ী। তাঁর অস্তিত্বের কোনো শেষ নেই। তিনি অবিনশ্বর সত্তা। যিনি নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত। আর সবকিছু তাঁর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়। আসমান-জমিনের প্রতাপশালী তিনিই। প্রাণী, উদ্ভিদ, জড়পদার্থ

সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা তিনি। সম্মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, রাজত্ব ও কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁর। তিনিই শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, সৌন্দর্য, কুদরত ও কামালের অধিকারী। তাঁর বড়ত্বের মারেফাত লাভে বিবেকবুদ্ধি পেরেশান হয়ে যায়। তাঁর গুণ বর্ণনায় যবান বাকশক্তিহীন হয়ে যায়।

আরেফ ব্যক্তির পূর্ণ মারেফাত হলো, আল্লাহর মারেফাত সম্পর্কে অক্ষমতা স্বীকার করা। আর নবীগণের নবুওয়াতের চূড়ান্ত পর্যায় হলো, গুণ বর্ণনায় নিজের ত্রুটি স্বীকার করা। যেমন নবী কারীম (স) বলেছেন,

لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، اَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيْكَ.

যেভাবে আপনি নিজের প্রশংসা নিজে করেছেন আপনি তেমনই, আমি আপনার প্রশংসা পূর্ণ করতে পারি না। (সহিহ মুসলিম : ৪৮৬)

হযরত আবু বকর (রা) বলেন, পূতপবিত্র ওই সত্তা, যিনি তাঁর মারেফাতের জন্য অক্ষমতা ছাড়া আর কোনো পথ রাখেননি। (আর রিসালাতুল কুশায়রিয়া : ৪৫৯)

আমি জানি না, যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ তাআলার সাথে প্রকৃত ভালোবাসা হতে পারে না; বরং রূপক ভালোবাসা হতে পারে, সে কি আল্লাহর গুণাবলিকে উত্তম ও প্রশংসনীয় মনে করে না, নাকি আল্লাহ তাআলাকে এগুণে গুণান্বিত মনে করে না কিংবা পূর্ণতা, সৌন্দর্য, বড়ত্ব ইত্যাদি গুণাবলিকে পছন্দনীয় মনে করে না?

একক সত্তার সিফাতে কামাল সম্পর্কে মারেফাত লাভের পর যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় তা ইহসানের মাধ্যমে যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় তার চেয়ে শক্তিশালী হয়ে থাকে। কারণ, ইহসান কম-বেশি হয়ে থাকে। হযরত দাউদ (আ)-এর কাছে আল্লাহ তাআলা ওহি পাঠালেন যে, আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ওই বান্দা, যে কোনো প্রতিদানের আশা ছাড়াই আমার ইবাদত করে। কিন্তু প্রভুত্ব তার হক অবশ্যই আদায় করে। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫৬)

যাবুর কিতাবে উল্লেখ আছে, ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে আছে, যে জান্নাত-জাহান্নামের জন্য আমার ইবাদত করে। আমি যদি জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি না করতাম তাহলে কি আমার ইবাদত করা হতো না? (কূতুল কুলূব : ২ : ৫৬)

হযরত ঈসা (আ) ইবাদাতগুজার একটি দলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা খুবই জীর্ণশীর্ণ ছিল। তারা বললো, আমরা জাহান্নামকে ভয় করি এবং জান্নাত কামনা করি। তিনি তাদেরকে বললেন, এক সৃষ্ট বস্তুকে তোমরা ভয় করো আবার এক সৃষ্ট বস্তুকেই তোমরা কামনা করো। এরপর তিনি আরেকটি দলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তারা বললো, আমরা আল্লাহর ইবাদত করি তাঁর ভালোবাসা ও মর্যাদার জন্য। তখন ঈসা (আ) বললেন, তোমরাই আল্লাহর প্রকৃত অলী। তোমাদের সাথেই থাকার জন্য আমাকে আদেশ করা হয়েছে। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫৬)

আবু হাযেম (র) বলেন, আমি সওয়াব লাভ ও শাস্তির ভয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে লজ্জাবোধ করি। এমন করলে তো আমি মন্দ গোলামের মতো হয়ে যাব, যে ভয় না করলে কাজ করে না এবং মন্দ শ্রমিকের মতো হয়ে যাব, যাকে বেতন না দেওয়া হলে কাজ করে না। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫৬)

পঞ্চম কারণ : পারস্পরিক মিল হওয়া। এরও দখল রয়েছে মহব্বতের মধ্যে। কারণ, যে বস্তু যে বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল, সে সেদিকেই ঝোঁকে। এ কারণেই ছোটোরা ছোটোদের এবং বড়রা বড়দের মহব্বত করে। কখনো মিল বাহ্যিক বিষয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন, ছোটোদের মিল ছোটোদের সঙ্গে। আবার কখনো গোপন ব্যাপারে হয়ে থাকে, যা অন্যরা জানতে পারে না। যেমন, ঘটনাক্রমে দুব্যক্তির মধ্যে মহব্বত হয়ে যায়, অথচ তার পূর্বে কখনো একজন অপরজনকে দেখে না এবং তাদের মধ্যে স্বার্থের কোনো লেনদেন থাকে না। এদিকে ইঙ্গিত করে নবী কারীম (স) বলেছেন,

اَلْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

আত্মাসমূহ হচ্ছে সমবেশিত সৈন্যের মতো। এর মধ্যে যেগুলো পরস্পর পরিচিত হয়েছে, সেগুলো মহব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। আর যেগুলো পরিচিত হয়নি, সেগুলো পৃথক হয়ে গেছে। (সহিহ মুসলিম : ২৬৩৮)

মানুষ এবং আল্লাহ তাআলার মধ্যে এ গোপন মিলও মহব্বত দাবি করে। কেননা, এমন অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহে আল্লাহ ও মানুষের মাঝে মিল রয়েছে, যার কিছু অংশ বই-পুস্তকে লেখা যায় আর কিছু আছে যা লেখা সম্ভব নয়; বরং সেগুলো যবনিকার অন্তরালে গোপন থাকতে দেওয়াই উচিত, যাতে সাধকরা সাধনায় সফলতার পর নিজেরাই জেনে নেয়।

পারস্পরিক যে মিল লেখার যোগ্য, তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা যেসব গুণ অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন, সেগুলোতে তাঁর কাছাকাছি হওয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন, تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ. তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও।

অর্থাৎ, সহনশীলতা, অনুগ্রহ, অপরের হিতাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি আল্লাহপ্রদত্ত গুণসমূহ লাভ করো। কারণ, এগুলোর প্রত্যেকটি গুণ মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য দান করে। পক্ষান্তরে যে মিল-মহব্বত বই-পুস্তকে লেখা যায় না, তা এমন বিশেষ মিল-মহব্বত যা শুধু মানুষের মাঝে পাওয়া যায়; ফেরেশতাদের মাঝে নয়। এদিকেই ইঙ্গিত করে এ আয়াতে বলা হয়েছে—

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ.

(হে নবী!) তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলে দিন, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত বিষয়। (সূরা বনি ইসরাঈল : ৮৫)

এতে বলা হয়েছে, রূহ মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞানের বাইরে। অন্য আয়াতে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ.

অতঃপর যখন আমি তাকে ঠিকঠাক করব এবং তাতে আমার পক্ষ থেকে রূহ সঞ্চার করব। (সূরা হিজর : ২৯)

বলা বাহুল্য, এই গোপন মিলের জন্যই ফেরেশতাদের আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিলেন আদমকে সিজদা করতে। এ আয়াতে এই মিলের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ. হে আদম! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। (সূরা ছাদ : ২৬)

সুতরাং মানুষ শুধু এ মিলের কারণেই আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী হয়েছে।

এদিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ. আল্লাহ আদমকে স্বীয় আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। (সহিহ মুসলিম : ১১৫)

এ থেকে কিছুসংখ্যক জ্ঞানপাপী লোক আল্লাহর জন্য দেহ ও আকৃতি গড়ে নিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ)।

হাদিসে কুদসীতেও এই মিলের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মূসা (আ)-কে আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি অসুস্থ হয়েছি, তুমি আমার কুশল জিজ্ঞাসা করোনি। মূসা (আ) আরয করলেন, হে প্রভু! এ কী করে সম্ভব? উত্তর হলো, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল। তুমি তার কুশল জিজ্ঞাসা করোনি। যদি তুমি তার কুশল জিজ্ঞাসা করতে, তবে তার নিকট আমাকে পেতে। বলার অপেক্ষা রাখে না, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার এই মিল তখন প্রকাশ পায়, যখন মানুষ ফরয কাজগুলো পালন করার পর নফল ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে। যেমন, আরেকটি হাদিসে কুদসীতে বলা হয়েছে,

وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ : كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيْذَنَّهُ.

অর্থাৎ, নফল ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা প্রতি মূহূর্তে আমার নৈকট্য হাসিল করতে থাকে। ফলে আমি তাকে মহব্বত করি। যখন মহব্বত করি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনতে পায়, তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়। তার পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলতে পারে। সে আমার কাছে কিছু চাইলে আমি তাকে তা দান করি এবং আশ্রয় চাইলে অবশ্যই আশ্রয় দিই। (সহিহ বুখারী : ৬৫০২)

আল্লাহ তাআলার মধ্যে মহব্বতের উল্লিখিত পাঁচটি কারণই আক্ষরিকভাবে বিদ্যমান রয়েছে এবং সবগুলো উচ্চস্তরে রয়েছে। এরূপ অবস্থায় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীদের মতে কেবল আল্লাহর মহব্বতই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। মানুষের মধ্যে কোনো লোক যদি এগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটির কারণে মাহবুব প্রিয় হয়, অন্য লোকেরও সে কারণে মাহবুব হওয়া সম্ভব। এটি অংশীদারিত্বের বেলায় মহব্বতের অসম্পূর্ণতার প্রমাণ। কিন্তু চূড়ান্ত প্রতাপ ও সৌন্দর্যের গুণাবলিতে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তাঁর কোনো শরীক বর্তমানেও নেই, ভবিষ্যতেও অসম্ভব। সুতরাং এটিই প্রমাণিত হলো যে, সেই সত্তা প্রকৃত মহব্বতের হকদার, যাতে কখনো অন্যের শরীকানা হয় না।

আল্লাহর মারেফাত ও দীদার সবচেয়ে বড় আনন্দ

আনন্দ অনুভূতিশক্তির অনুগত। মানুষের মাঝে অনেক প্রকার শক্তি ও স্বভাবগুণ রয়েছে। যার প্রত্যেকটির স্বাদ-আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন। স্বভাবের চাহিদা মোতাবেক কোনো কিছু অর্জন হওয়াকেই তার আনন্দ বলে। কেননা, মানুষের মাঝে এ সকল গুণ ও স্বভাব অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি; বরং এগুলোকে এমন বিষয়ের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যা তার স্বভাব অনুযায়ী হয়ে থাকে। যেমন ক্রোধ স্বভাব প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং এর আনন্দ অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে লাভ হবে। আর এটাই তার স্বভাবের চাহিদা। এমনিভাবে আহারের চাহিদাশক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে, যার মাধ্যমে মানুষ বেঁচে থাকে। সুতরাং এর আনন্দ খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত হবে, যা তার স্বভাবগত চাহিদা। এমনিভাবে শ্রবণ, দর্শন ও ঘ্রাণ গ্রহণের স্বাদ এমন বস্তুর মাধ্যমেই হবে, যা তার স্বভাব-চাহিদা অনুযায়ী হবে। কোনো স্বভাব এমন নেই, যা তার অনুভূতিশক্তির মাধ্যমে কষ্ট ও আনন্দ লাভ করে না। এমনিভাবে অন্তরে এক শক্তি রয়েছে, যাকে নূরে ইলাহি বা আল্লাহ প্রদত্ত নূর বলে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ.

আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে তার প্রতিপালক প্রদত্ত (হেদায়াতের) আলোয় রয়েছে, (সে কি তার সমান যে এরূপ নয়?) (সূরা যুমার : ২২)

এর আরও কিছু নাম রয়েছে। যেমন, আকল (বুদ্ধি), অন্তর্দৃষ্টি, ঈমান ও একীনের নূর। এর নামসমূহ নিয়ে ব্যস্ত হওয়া উদ্দেশ্য নয়। কেননা, এর পরিভাষা ভিন্ন ভিন্ন। আর স্বল্পকিছু লোক মনে করে, শব্দের ভিন্নতার কারণে অর্থেও ভিন্নতা রয়েছে। আর এমন ব্যক্তির কাজই হলো শব্দ থেকে অর্থ বের করা।

অন্তরে এমন একটি গুণ রয়েছে, যার মাধ্যমে তা সমস্ত শরীর থেকে আলাদা। এ সিফাত বা গুণের কারণেই অন্তর এমন বিষয় উপলব্ধি করে, যা কল্পিত ও অনুভূত নয়। যেমন, পৃথিবী সৃষ্টি হওয়া, প্রজ্ঞাময় পরিচালক, পরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তার অমুখাপেক্ষী হওয়া। যিনি প্রভুত্ব গুণে গুণান্বিত।

এ গুণের নাম হচ্ছে আকল। এ আকল দ্বারা তর্ক বিতর্কের যোগ্য আকল উদ্দেশ্য নয়। সাধারণত মানুষ এটাই বুঝে থাকে। আর এ কারণে কোনো কোনো সুফি আকলকে মন্দ বলেছেন। অন্যথায় যে গুণ মানুষ ও জন্তুর মাঝে পার্থক্য করেছে এবং আল্লাহর মারেফাত যার মাধ্যমে জানা যায় তা তো অনেক উত্তম গুণ। তাকে মন্দ বলা উচিত নয়। আর এ গুণ সৃষ্টি করা হয়েছে যেন এর মাধ্যমে সকল বস্তুর প্রকৃতি জানা যায়। সুতরাং এর স্বভাবের চাহিদা হলো, মারেফাত ও ইলম। আর এটাই তার আনন্দের বিষয়।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইলম ও মারেফাতে আনন্দ রয়েছে। এমনকি কোনো ব্যক্তিকে যদি আলেম ও আরেফ বলা হয় তাহলে সে খুশি হয়, পক্ষান্তরে কাউকে যদি খুব সামান্য বিষয়েও জাহেল বলা হয়, এতে সে দুঃখিত হয়। মানুষ যদি অতি সামান্য কিছুও জানে, তা নিয়ে গর্ব করার ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে পারে না। যেমন, কেউ দাবা খেলা পারে। এটা সামান্য একটা বিষয়। এরপরও সে মানুষকে তা শেখানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর মানুষ যা জানে তা অন্যের সামনে প্রকাশ করেই দেয়। এর কারণ হলো, সে যে জানে, এ বিষয়টা তাকে আনন্দ দেয়। নিজের ইলমকে সে পূর্ণতা মনে করে। কারণ, ইলম হচ্ছে প্রভুত্ব সিফতসমূহের মধ্যে বিশিষ্টতর। যা চূড়ান্ত পর্যায়ের পূর্ণতা। একারণে যখন কোনো ব্যক্তির মেধা ও অধিক ইলমের প্রশংসা করা হয় তখন সে মনে শান্তি অনুভব করে। কারণ, প্রশংসা শুনে মানুষ নিজের ইলমের পূর্ণতা উপলব্ধি করে এবং তাতে আনন্দ লাভ করে।

রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা বিদ্যায় যে আনন্দ পাওয়া যায়, চাষাবাদ ও সেলাই বিদ্যায় সে আনন্দ পাওয়া যায় না। এমনিভাবে নাহু (ব্যাকরণ) ও কবিতা বিদ্যার আনন্দ আল্লাহ, তাঁর সিফাত ও ফেরেশতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের আনন্দের মতো নয়; বরং যেকোনো বিদ্যার মর্যাদা পরিমাণ ইলমের আনন্দ লাভ হয়। আর ইলমের মর্যাদা তথ্যের মর্যাদা পরিমাণ হয়ে থাকে। এমনকি যে ব্যক্তি মানুষের অভ্যন্তরীণ বিষয় জানে, তাকে সে বিষয়ে অবগত করে আনন্দ লাভ করে। যদি সে তা না জানে তাহলে তার মন তা অর্জনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কেউ যদি রাষ্ট্রপ্রধানের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও তার নেতৃত্বের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে জানে তাহলে এতে সে আনন্দ লাভ করে, কৃষকের

অবস্থা জানার চেয়ে। যত বড় ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে সে জানতে পারবে তার আনন্দ ততই বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়ে প্রশংসা পাওয়া ও আলোচনা হওয়া তার কাছে আনন্দের বিষয় হবে। কারণ, এতে মর্যাদা বেশি।

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, জ্ঞানের মধ্যে যা সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান, তার দ্বারাই বেশি আনন্দ লাভ হয়। আর ব্যক্তির মর্যাদা জ্ঞানের মর্যাদার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। সুতরাং জ্ঞানের মধ্যে যা মর্যাদাপূর্ণ, বড় ও পরিপূর্ণ তা জানার মধ্যেই আনন্দ বেশি।

আমার জানা নেই, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, পরিপূর্ণ করেছেন, সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত করেছেন, যার পরিচালক একমাত্র তিনি, তার চেয়ে উত্তম, পরিপূর্ণ ও মর্যাদাবান আর কী হতে পারে? কিংবা তাঁর দরবারের চেয়ে বড়, মর্যাদাপূর্ণ, সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ অন্য কোনো দরবার হতে পারে?!

সুতরাং এ বিষয়ে যদি কারও সন্দেহ না থাকে তাহলে প্রভুত্ব বিষয়ের রহস্যাবলি এবং ঐশী বিষয়াদির বিন্যাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, যা সকল বস্তুকে বেষ্টন করে আছে তা উত্তম, শ্রেষ্ঠ ও আনন্দনীয়। এ বিষয়ে সন্দেহ করা উচিত নয়। যখন মানুষ কোনো গুণে গুনান্বিত হয় তখন অন্তরে নিজের পূর্ণতা ও সৌন্দর্য অনুভব করা, খুশি হওয়া ও আনন্দ পাওয়া স্বাভাবিক।

এ আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল যে, ইলম আনন্দদায়ক। আর সবচেয়ে আনন্দদায়ক হলো, আল্লাহর সত্তা, তাঁর গুণাবলি, তাঁর কর্ম ও পরিচালনার জ্ঞান লাভ করা। সুতরাং মারেফাতের আনন্দকে অন্য সব আনন্দ যেমন, প্রবৃত্তির আনন্দ, পঞ্চেন্দ্রিয়ের আনন্দ ইত্যাদি থেকে সবচেয়ে বড় আনন্দ মনে করা উচিত।

কারণ, প্রথমত আনন্দের ক্ষেত্রে প্রকারের ভিন্নতা রয়েছে। যেমন সঙ্গম ও শ্রবণের আনন্দ ভিন্ন এবং মারেফত ও নেতৃত্বের আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন। দ্বিতীয়ত এক্ষেত্রে কম-বেশির ভিন্নতা রয়েছে। যেমন, যে ব্যক্তির কামোত্তেজনা বেশি আর যার কম তাদের উভয়ের আনন্দ এক হবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তির চেহারা খুব সুন্দর আর যার চেহারা কম সুন্দর তাদের উভয়ের দিকে তাকানোর আনন্দ এক হবে না। আর অধিক আনন্দের পরিচয় হলো, তার আনন্দের বস্তু থাকার পর অন্য বস্তু গ্রহণ না করা। যেমন, আহারের সময়

হয়েছে, খাবারও উপস্থিত। এমন সময় কেউ দাবা খেলায় ব্যস্ত। খাবারের প্রতি তার আগ্রহ নেই। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, আহারের আনন্দের চেয়ে তারা কাছে দাবা খেলা বেশি আনন্দদায়ক।

মোটকথা, এটা এমন এক সত্য মাপকাঠি, যার মাধ্যমে আনন্দের প্রাধান্য বুঝে আসে। সুতরাং এখন আমরা মূল বক্তব্যে ফিরে যাব।

আনন্দ দু প্রকার। এক. বাহ্যিক। যেমন পঞ্চেন্দ্রিয়ের আনন্দ এবং দুই. অভ্যন্তরীণ। যেমন নেতৃত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব সম্মান, ইলম ইত্যাদির আনন্দ। এ আনন্দ চোখ, নাক, কান, স্পর্শ ইত্যাদি দ্বারা বোঝা যায় না। আর অভ্যন্তরীণ আনন্দ কামালিয়তের অধিকারী ব্যক্তিদের ওপর বাহ্যিক আনন্দের চেয়ে প্রবল হয়ে থাকে। সুতরাং কাউকে যদি হালিম, চকলেট আর নেতৃত্ব ও উচ্চপদ গ্রহণের ইচ্ছাধিকার দেওয়া হয়, সে যদি ভীতু, মৃতহৃদয় ও লোলুপ হয়ে থাকে তাহলে সে হালিম ও চকলেট গ্রহণ করবে। আর যদি সাহসী ও বুদ্ধিমান হয় তাহলে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে।

এমনিভাবে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ বিষয় অপূর্ণ যেমন, শিশু অথবা যার অভ্যন্তরীণ শক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন, পাগল, সে অবশ্যই খাবারকে নেতৃত্বের ওপর প্রাধান্য দেবে। অতএব নেতৃত্ব ও মর্যাদার আনন্দের চেয়ে আল্লাহর মারেফাত ও ঐশী বিষয়াবলির রহস্যের প্রতি দৃষ্টিপাতের আনন্দ অনেক বেশি।

এ আনন্দকে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

অতএব, কোনো মানুষ জানে না, এমন লোকদের জন্য তাদের কর্মফলস্বরূপ চক্ষু শীতলকারী কত কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে। (সূরা সিজদাহ : ১৭)

আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এমন নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যা কোনো চোখ দেখেনি। কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের কল্পনায়ও তা আসেনি।

এ আনন্দ কেবল ওই ব্যক্তিই লাভ করতে পারে, যে উভয় আনন্দকে পরখ করে দেখেছে। তখন সে একাকিত্ব ও যিকির-ফিকিরকে প্রাধান্য দিবে।

মারেফাতের নদীতে নিমজ্জিত হবে, নেতৃত্ব বর্জন করবে এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে তুচ্ছ মনে করবে। কারণ সে জানে, নেতৃত্ব ও এর অধিকারীরা চিরকাল স্থায়ী হবে না।

আর এতে রয়েছে কদর্যতা, যা থেকে নিষ্কলুষ হওয়া দুষ্কর। মৃত্যুর সাথে সাথে এসব কিছু শেষ হয়ে যাবে, আর মৃত্যু অবশ্যই আসবে। সুতরাং মানুষ আল্লাহর মারেফাত, তাঁর গুণ, কর্ম ইত্যাদি নিয়ে গবেষণার আনন্দকে বড় মনে করবে।

কারণ, এ আনন্দে কোনো বিরক্তি ও কদর্যতা নেই। মোটকথা, যে আরেফ আল্লাহর মারেফত, গুণ ও কর্ম নিয়ে গবেষণা করে, সে এমন জান্নাতে স্থায়ী হবে, যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিন সমান। যার বাগানে সে বিচরণ করবে। বাগানের ফল পেড়ে খাবে, এর ঝরনার পানি পান করবে এবং সে এ আনন্দ নিঃশেষ হওয়া থেকে নিরাপদ। কারণ, এ বাগানের ফল কখনো শেষ হবে না এবং কাউকে তা থেকে বাধা দেওয়াও হবে না।

এ আনন্দ স্থায়ী ও অন্তহীন। মৃত্যুর মাধ্যমেও যা শেষ হয় না। কারণ, মৃত্যু আল্লাহর মারেফাতের কেন্দ্রকে শেষ করতে পারে না। আর আল্লাহর মারেফতের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে রূহ। যা প্রভুত্ব ও আসমানি বিষয়। মৃত্যু শুধু রূহের অবস্থা পরিবর্তন করে। তার কর্ম ও প্রতিবন্ধকতা রোধ করে এবং তাকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেয়। একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ. فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে,তাদের কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের কাছে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত।

আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের অনুবর্তী যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে। এজন্য যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরা আলে ইমরান : ১৬৯-১৭০)

এখানে এটা মনে করা যাবে না যে, আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু কেবল রণাঙ্গনে মৃত ব্যক্তির সাথে নির্দিষ্ট। কেননা, একজন আরেফের এক নিশ্বাসে হাজার শহীদের মর্যাদা লাভ হয়। হাদিসে আছে, শহীদ ব্যক্তি আখেরাতে আকাঙ্ক্ষা করবে, তাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। যেন তাকে পুনরায় হত্যা করা হয়। কারণ, সে শাহাদাতের বড় ফযিলত দেখেছে। (সহিহ মুসলিম : ১৮৭৭)

আর শহীদগণ আলেমদের উচ্চ মর্যাদা দেখে আলেম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে।

মোটকথা, আসমান-জমিনের সম্পূর্ণ প্রান্ত হলো আরেফের ময়দান, যেখানে ইচ্ছা সে বিচরণ করবে। নিজের দেহ-মন নড়াচড়া করানোর প্রয়োজন ব্যতীত। ঊর্ধ্বলোকের সৌন্দর্যের গবেষণার কারণে সে এমন জান্নাতে থাকবে, যার বিস্তৃতি আসমান-জমিন সমান। প্রত্যেক আরেফের জন্য এমনই নেয়ামত থাকবে। একে অপরের জন্য সংকীর্ণতা সৃষ্টি করবে না। তবে দৃষ্টি ও মারেফাত যার যতটুকু হবে, তার বিচরণক্ষেত্র সে পরিমাণ হবে। আর এর কারণেই আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যা গণণা করে শেষ করা যাবে না।

উক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল যে, নেতৃত্বের আনন্দ কামালিয়াতের অধিকারীদের মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আনন্দ থেকে সুদৃঢ়তর। এ আনন্দ শিশু, পাগল ও জন্তুর হয় না। আর ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির আনন্দ কামালিয়াতের অধিকারীদেরও হয়ে থাকে; কিন্তু তারা নেতৃত্বকে অর্থাৎ, অভ্যন্তরীণ আনন্দকে প্রাধান্য দেয়।

কিন্তু আল্লাহর মারেফত, তাঁর সিফাত, কর্ম, আসমান ও তাঁর রাজত্বের রহস্যাবলির মারেফাতের আনন্দ, নেতৃত্বের আনন্দের চেয়ে অতি উত্তম। এটা কেবল ওই ব্যক্তিই জানে, যে মারেফাতের স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং এর আনন্দ অনুভব করেছে। যার অন্তর নেই, তার জন্য মারেফাত সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কারণ, অন্তর হচ্ছে এ শক্তির মূল উৎস। সুতরাং যার অন্তরই নেই, সে এ আনন্দ কীভাবে বুঝবে?

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর মারেফাতে দীর্ঘ চিন্তা-ফিকির করে এবং আল্লাহর রাজত্বের রহস্যাবলির সামান্য কিছু তার সামনে উন্মোচিত হয় সে

অত্যধিক আনন্দিত হয়। সে আশ্চর্যবোধ করে যে, সে কীভাবে স্থির রয়েছে এবং এ বিষয়টি বহন করতে পেরেছে। আর এটা এমন বিষয়, যা আস্বাদন করা ছাড়া উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এ আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহর মারেফাত হচ্ছে সবচেয়ে আনন্দের। কোনো আনন্দ এর ঊর্ধ্বে নেই। একারণেই আবু সোলায়মান দারানী (র) বলেন, আল্লাহর এমন কিছু বান্দা রয়েছেন, যাদেরকে জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ হতে বিরত রাখতে পারে না। সুতরাং দুনিয়া কীভাবে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা হতে বিরত রাখবে?!

মারুফ কারখি (র)-এর কিছু মুরীদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু মাহফুজ! আমাদেরকে আপনি বলুন, কোন বস্তু আপনাকে ইবাদতে আগ্রহী করেছে এবং বান্দা হতে বিরত রেখেছে? তিনি চুপ রইলেন। প্রশ্নকারী নিজেই বললেন, মৃত্যুর ভয় এমন করেছে? তিনি বললেন, মৃত্যু কী জিনিস? প্রশ্নকারী বললেন, কবর ও বরযখের ভয়ে এমন হয়েছে? তিনি বললেন, কবর কী? প্রশ্নকারী বললেন, জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা এসব করেছে? তিনি বললেন, এ জান্নাত-জাহান্নাম কী জিনিস? শোনো, তুমি এসব যা কিছু বললে তা এক বাদশাহর কবজায় রয়েছে। যদি তুমি বাদশাহকে ভালোবাসো তাহলে তোমার এসব কিছুই মনে থাকবে না। আর যদি তাঁর মারেফাত তোমার হাসিল হয়ে যায় তাহলে তিনিই তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫৬)

হযরত ঈসা (আ) বলেন, যখন তুমি কোনো দীনদারকে আল্লাহর অনুসন্ধানে আগ্রহী দেখবে, এর মানে হলো, আল্লাহ তাকে অন্য সবকিছু থেকে বিরত রেখেছেন। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫৬)

এক শায়খ বিশর ইবনুল হারেস (র)-কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আবু নসর তাম্মার ও আবদুল ওয়াহহাব ওয়াররাক-এর কী অবস্থা? তিনি বললেন, আমি তাদের দুজনকে এমন অবস্থায় রেখে এসেছি যে, তারা আল্লাহর সামনে পানাহার করছে। শায়খ জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কী অবস্থা? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা জানেন, আমার পানাহারে আগ্রহ কম, তাই আমাকে তাঁর দীদার দান করেছেন।

হযরত আলী ইবনুল মুওয়াফফাক (র) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। দেখলাম, এক ব্যক্তি দস্তরখানে

বসে আছে আর দুজন ফেরেশতা তার ডানে-বামে বসে তাকে উৎকৃষ্ট মানের খাবার, ফলমূল খাওয়াচ্ছে। আরেক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে লোকদের চেহারা পর্যবেক্ষণ করছে। তাদের কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে কাউকে আবার ফিরিয়ে দিচ্ছে। এরপর আমি তাদের দুজনকে অতিক্রম করে হাদিকাতুল কুদস-এর দিকে এগিয়ে দেখি, আরশের তাঁবুতে এক ব্যক্তি অপলক দৃষ্টিতে আল্লাহর দিকে তাকিয়ে আছে। আমি প্রহরীকে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? সে বললো, মারুফ কারখী। তিনি আল্লাহর ইবাদত করেছেন জাহান্নামের ভয় ও জান্নাত লাভের আশায় নয়; বরং আল্লাহকে ভালোবেসে। তাই তাকে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, অন্য দুজন ব্যক্তি হলেন, বিশর ইবনে হারিস ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫৬)

এদিক লক্ষ করে আবু সোলায়মান দারানী (র) বলেছেন, আজ যে ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, সে আগামীকালও নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আজ তার প্রভুকে নিয়ে ব্যস্ত, সে আগামী কালও তার প্রভুকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫৭)

সুফিয়ান সাওরী (র) রাবেয়া বসরী (র)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ঈমানের প্রকৃত অবস্থা কী? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর ইবাদত জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের আশায় করি না। অন্যথায় আমি তো মন্দ শ্রমিকের মতো হয়ে যাব; বরং আমি তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসার জন্যই তাঁর ইবাদত করি।

তিনি কবিতায় বলেন,

أُحِبُّكَ حَبَّيْنِ حُبَّ الْهَوٰى - وَحُبًّا لِأَنَّكَ أَهْلٌ لِذَاكَا

فَأَمَّا الَّذِيْ هُوَ حُبُّ الْهَوٰى* فَشُغْلِيْ بِذِكْرِكَ عَمَّنْ سِوَاكَا

وَأَمَّا الَّذِيْ أَنْتَ أَهْلٌ لَهٗ * فَكَشْفُكَ لِيَ الْحُجُبَ حَتّٰى أَرَاكَا

فَلَا الْحَمْدُ فِيْ ذَا وَلَا ذَاكَ لِيْ * وَلٰكِنْ لَكَ الْحَمْدُ فِيْ ذَا وَذَاكَا

আমি দুই ভাবে আপনাকে ভালোবাসি। প্রথমত ইশকের কারণে আপনাকে ভালোবাসি, দ্বিতীয়ত ভালোবাসার যোগ্য একমাত্র আপনি, তাই আপনাকে ভালোবাসি। ইশকের ভিত্তিতে যে মহব্বত তার কারনে আমি সবকিছু থেকে নির্মুখাপেক্ষী হয়ে আপনার যিকিরে মশগুল। আর মহব্বতের যোগ্যতার ভিত্তিতে যে মহব্বত, তার জন্য আপনি পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন, যেন আমি আপনার দীদার লাভ করি। উভয় মহব্বতে আমার কোনো প্রশংসা নেই। কিন্তু উভয় মহব্বতে প্রশংসা কেবল আপনারই। (শরহে নাহজিল বালাগাহ : ১০ : ১৫৬)

সম্ভবত তার প্রথম ভালোবাসার কারণ হলো, তার প্রতি আল্লাহর ইহসান ও নেয়ামত প্রদান আর দ্বিতীয় ভালোবাসার কারণ হলো, আল্লাহর সৌন্দর্য ও বড়ত্ব।

প্রভুত্বের সৌন্দর্য দেখার আনন্দ রাসূলুল্লাহ (স) হাদিসে কুদসীতে ব্যক্ত করেছেন এভাবে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ.

আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের কল্পনায়ও আসেনি। (সহিহ বুখারী : ৩২৪৪; সহিহ মুসলিম : ২৮২৪)

যার অন্তরের স্বচ্ছতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, সে অনেক সময় এ আনন্দ দুনিয়াতে পেয়ে যায়। এ কারণে কোনো কোনো বুযুর্গ বলেন, আমি 'হে আল্লাহ, হে রব' বলে ডাকাকে পাহাড়ের চেয়েও ভারি মনে করি। কারণ, সম্বোধন তো হয় পর্দার আড়াল থেকে, তুমি কি কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুকে তার নাম ধরে ডাকতে শুনেছ? তিনি আরও বলেন, মানুষ যখন এ ইলমের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন লোকেরা তাকে পাথর মারে।

অর্থাৎ, তাদের কথাবার্তা তাদের বিবেক বহির্ভূত হয়ে যায়। তখন লোকেরা তাদের কথাকে পাগলামি অথবা কুফরি মনে করে।

মোটকথা, সকল আরেফের লক্ষ্য হলো, আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছা এবং তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করা, যা তাদের চক্ষুকে শীতল করে। কোনো মানুষ

জানে না, এতে কী নেয়ামত লুক্কায়িত রয়েছে। যদি তা হাসিল হয়ে যায়, অন্তর সে আনন্দে ডুবে যায়। এমনকি যদি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে তা অনুভূত হয় না। যদি জান্নাতের নেয়ামতসমূহ তার সামনে পেশ করা হয় তাহলে সেদিকে সে ভ্রুক্ষেপও করে না। কারণ, পূর্ণ ও চূড়ান্ত পর্যায়ের নেয়ামত সে পেয়ে গেছে। যার ওপরে আর কোনো নেয়ামত হয় না।

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় আনন্দ ব্যতীত আর কিছু বোঝে না, সে কীভাবে আল্লাহকে দেখার আনন্দের ওপর ঈমান আনবে? কারণ, আল্লাহ তো নিরাকার। বরং যে ব্যক্তি আল্লাহকে জানে, সে এটাও জানে যে, বিভিন্ন প্রবৃত্তির কারণে যে সকল আনন্দ লাভ হয় তা এই এক আনন্দ অর্থাৎ, আল্লাহর দীদাদের মাঝে সন্নিবেশিত।

আনন্দের ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন, একটি শিশুর প্রাথমিক অবস্থায় এমন একটি স্বভাব তৈরি হয়, যার কারণে সে খেলাধুলায় আনন্দ লাভ করে। এমনকি তখন তার কাছে সব আনন্দ থেকে খেলাধুলার আনন্দই বড় মনে হয়। এরপর তার মধ্যে সাজসজ্জা, উন্নত কাপড় পরিধান, গাড়িতে ভ্রমণ ইত্যাদির আনন্দের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তখন তার কাছে খেলাধুলার আনন্দ ছোটো মনে হয়। এরপর তার মধ্যে নারী ও তার সংস্পর্শের আনন্দের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তখন সে পূর্বের সব আনন্দ ছেড়ে দিয়ে এদিকে ধাবিত হয়। অতঃপর তার মধ্যে নেতৃত্ব, উচ্চ মর্যাদা ইত্যাদির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যা দুনিয়ার সর্বশেষ আনন্দ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ زِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ.

তোমরা জেনে রেখো, পার্থিব জীবন তো শুধুই ক্রীড়াকৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহমিকা, ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন বৃষ্টি, যা দ্বারা উৎপন্ন ফসলাদি

কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়কুটায় পরিণত হয়। আর পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা হাদীদ : ২০)

এরপর তার মধ্যে অন্য এক শক্তি সৃষ্টি হয়, যার মাধ্যমে সে আল্লাহর মারেফত ও তাঁর ক্রিয়াকর্ম উপলব্ধির আনন্দ লাভ করে। তখন পূর্বের সব আনন্দই তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়।

মোটকথা, যে আনন্দ শেষে আসে তা পূর্বের আনন্দের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হয়। আর আল্লাহর মারেফতের আনন্দ সবার শেষে আসে। কেননা, খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় পার্থক্য উপলব্ধির বয়সে। সাজসজ্জা ও নারীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় সাবালকত্বে। নেতৃত্বের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় বিশ বছরের পর আর ইলমের প্রতি আগ্রহ জাগে চল্লিশের কাছাকাছি বয়সে। আর এটাই চূড়ান্ত লক্ষ্য। যেভাবে ছোটো শিশু ওই ব্যক্তিকে দেখে হাসে, যে খেলাধুলা ছেড়ে নেতৃত্ব অন্বেষণে ব্যস্ত, ঠিক তেমনি নেতারা ওই ব্যক্তিকে দেখে হাসে, যে নেতৃত্ব ছেড়ে আল্লাহর মারেফত নিয়ে ব্যস্ত। আর আরেফগণ বলেন,

إِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ. فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ.

'তোমরা যদি আমাদের উপহাস করো তবে আমরাও তোমাদেরকে উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ। তোমরা অচিরেই জেনে যাবে। (সূরা হুদ : ৩৮-৩৯)

দুনিয়াতে মারেফাত বেশি হলে আখেরাতে আল্লাহর দীদারের আনন্দ বেশি হবে

উপলব্ধিযোগ্য বস্তু দুই প্রকার। এক. যা কল্পনায় আসে। যেমন, কল্পিত আকৃতি, বিভিন্ন রঙের দেহ, পশু-পাখি ও উদ্ভিদ। দুই. যা কল্পনায় আসে না। যেমন, আল্লাহর সত্তা, অশরীরি বস্তু। যেমন, ইলম, কুদরত, ইরাদা ইত্যাদি। কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে দেখার পর চোখ বন্ধ করে তাহলে তার আকৃতি কল্পনায় ভেসে ওঠবে। যেন সে তাকে দেখছে। কিন্তু যখন চোখ খুলে দেখবে তখন কিছুটা পার্থক্য মনে হবে। এ পার্থক্য এদিক থেকে নয় যে, উভয় আকৃতি ভিন্ন। বরং পার্থক্য হলো, অধিক স্পষ্ট

হওয়ার দিক থেকে। অর্থাৎ, কল্পনায় তার আকৃতি স্পষ্ট ছিল না; কিন্তু চোখ খুলে দেখার পর তা একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এর উদাহরণ হলো, কোনো ব্যক্তি ভোরের শুরুলগ্নে দিনের আলো উদ্ভাসিত হওয়ার পূর্বে কাউকে দেখল এরপর দিনের আলোতে তাকে পুনরায় দেখল তাহলে এ দুই অবস্থার মাঝে পার্থক্য শুধু এটুকু যে, অধিক স্পষ্টতা।

সুতরাং প্রথম উপলব্ধির নাম হলো কল্পনা। আর চোখে দেখা হলো কল্পনার উপলব্ধির পূর্ণতা। আর এটাই হলো চূড়ান্ত পর্যায়ের কাশফ।

প্রসঙ্গত, যে সকল মালুমাত এমন, যা কল্পনায়ও আসে না, তা উপলব্ধির দুটি স্তর রয়েছে। এক. প্রথম উপলব্ধি। দুই. প্রথম উপলব্ধির পূর্ণতা। এ দুই উপলব্ধির মধ্যে পার্থক্য হলো কাল্পনিক বস্তু ও চোখে দেখা বস্তুর মতো। দ্বিতীয়টিকেও মুশাহাদা, লেকা ও রুইয়াত বলা হয়। আর এ নামকরণ যথাযথ। রুইয়াত নামকরণের কারণ হলো, রুইয়াত কাশফের চূড়ান্ত পর্যায়কে বলে। যেমনিভাবে আল্লাহর এ রীতি চালু রয়েছে যে, চোখ বন্ধ করলে কোনো বস্তু স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। যদি বস্তু ও চোখের মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে তাহলে রুইয়াত বা দেখার জন্য তা দূর করা আবশ্যক। যতক্ষণ ওই প্রতিবন্ধকতা দূর না হবে ততক্ষণ ওই বস্তু সম্পর্কে যা উপলব্ধি হবে তা কল্পনার ভিত্তিতে হবে। তাকে রুইয়াত বলা হবে না। তেমনিভাবে আল্লাহর রীতির দাবি হলো, আত্মা যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরের আড়ালে লুক্কায়িত থাকবে এবং প্রবৃত্তি ও মনুষ্যত্বের চাহিদায় বেষ্টিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কল্পণা বহির্ভূত মালুমাতের মুশাহাদা ও রুইয়াত তার হবে না; বরং এ পার্থিবজীবনই রুইয়াতের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়েছে। যেমন চোখের পলক বন্ধ করা দেখার জন্য অন্তরায় হয়ে থাকে। আর এ কারণেই হযরত মূসা (আ) আল্লাহকে দেখার আবেদন করলে তিনি বলেন, لَنْ تَرٰنِيْ তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পারবে না। (সূরা আরাফ : ১৪৩)

আরও ইরশাদ হয়েছে, لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ দৃষ্টিসমূহ তাকে অবধারণ করতে পারে না। (সূরা আনআম : ১০৩)

অর্থাৎ পৃথিবীতে। মূলত রাসূলুল্লাহ (স) মেরাজ রজনীতে আল্লাহকে দেখেননি।[১]

---

[১] কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মত হলো, মেরাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ তাআলাকে দেখেছেন।

অতঃপর যখন মৃত্যুর মাধ্যমে অন্তরায় দূর হয়ে যায় তখন আত্মা দুনিয়ার পঙ্কিলতায় মিশ্রিত থাকে। তা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না। যদিও এ পঙ্কিলতা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কোনো কোনো আত্মার অবস্থা এমন হয় যে, ময়লা ও জং পড়তে পড়তে এমন অবস্থা হয় যেমন কোনো আয়নায় ময়লা পড়তে পড়তে তা নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে ঘষা-মাজা করেও কোনো লাভ হয় না। এরা হলো ওই সকল লোক, যারা স্থায়ীভাবে তাদের প্রতিপালক থেকে আড়ালে থাকে। আমরা আল্লাহর কাছে এমন অবস্থা থেকে পানাহ চাই। কিছু আত্মা এমন রয়েছে, যা এ পর্যায়ের নয় যে, পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি কবুল করে না। তাদেরকে জাহান্নামের সম্মুখীন করা হবে। যেন সেই ময়লা দূর হয়ে যায়। আর জাহান্নামের এ সম্মুখীন তার পরিশুদ্ধির প্রয়োজন পরিমাণ হবে। মুমিন ব্যক্তির জন্য এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো এক মূহুর্ত। আর সর্বোচ্চ পরিমাণ হলো সাত হাজার বছর। এমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

যে কোনো আত্মা দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তার সাথে ময়লা ও পঙ্কিলতা লেগেই থাকে। যদিও তা পরিমাণে কম হয়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا.

এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা (জাহান্নাম) অতিক্রম করবে। এটা আপনার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। অতঃপর আমি মুত্তাকীদের নিষ্কৃতি দান করব এবং জালেমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় ফেলে রাখব। (সূরা মারইয়াম : ৭১-৭২)

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রত্যেক নফস নিশ্চিতই জাহান্নামের সম্মুখীন হবে। তা থেকে বাঁচা অনিশ্চিত। মুক্তি তখনই পাবে যখন আল্লাহ নফসকে ভালোভাবে পবিত্র ও পরিষ্কার করবেন, যে সময় আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট করেছেন তা পূর্ণ হবে এবং যে বিষয় শরিয়তে উল্লেখ রয়েছে, যেমন আমলনামা উপস্থাপন ও হিসাব গ্রহণ ইত্যাদি পূর্ণ হবে এবং জান্নাতের যোগ্য হবে। এরপরই সে মুক্তি পাবে। আর সে সময়টি অস্পষ্ট। আল্লাহ

তাঁর কোনো বান্দাকে তা জানাননি। কারণ, তা সংঘটিত হবে কেয়ামতের পর। আর কেয়ামতের সময় জানা নেই। এসব অবস্থার পর নফস এমনভাবে পাক-পবিত্র হবে, তার মধ্যে কোনো ময়লা, দাগ কিছুই থাকবে না। এরপর সে আল্লাহর তাজাল্লীর উপযুক্ত হবে। এ তাজাল্লী ওই সময় এমন হবে যে, তার মাধ্যমে দেখার বিষয়টি প্রথম প্রকার ইলম অর্থাৎ, কল্পনার মতো হবে। এ মুশাহাদা ও তাজাল্লীর নামই হলো রুইয়াত এবং দীদার।

এর দ্বারা বোঝা গেল, রুইয়াত সত্য। তবে শর্ত হলো, এ রুইয়াত দ্বারা কাল্পনিক আকৃতি উপলব্ধির পূর্ণতা মনে করা যাবে না। এমনই রুইয়াত আল্লাহ তাআলারও হবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা সবকিছুর ঊর্ধ্বে। বরং যেমনিভাবে দুনিয়াতে আল্লাহকে প্রকৃতভাবে জেনেছে, কোনো কল্পনা আকৃতির কথা ভাবেনি, আখেরাতেও ঠিক তেমনই দেখবে।

আমার বক্তব্য হলো, দুনিয়াতে যে মারেফত হাসিল হয় তাই পরিপূর্ণ হয়ে কাশফের পূর্ণতার স্তরে পৌঁছে যায়। আর এটাকেই মুশাহাদা ও রুইয়াত বলা হয়। আখেরাতের মুশাহাদা ও দুনিয়াবি মালুমাত তথা জ্ঞানের মাঝে ভিন্নতা হলো অধিক কাশফ ও স্পষ্টতার দিক থেকে। যেমনটি কল্পনার উদাহরণে বলা হয়েছে। সুতরাং যখন আল্লাহর মারেফাতে স্থান ও আকৃতি সাব্যস্ত করা সম্ভব নয় তখন সে মারেফত পূর্ণ হওয়ার জন্য এবং কাশফের স্তরে পৌঁছার ক্ষেত্রে স্থান ও আকৃতি সাব্যস্ত হওয়াও অসম্ভব। কারণ, এদুটি বিষয় একই। পার্থক্য শুধু এই যে, আখেরাতের রুইয়াতে কাশফ বেশি হয়। যেমন, চোখে দেখা বস্তু কল্পনায় দেখা বস্তুর চেয়ে অধিক স্পষ্ট। এ দিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ হয়েছে,

نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا.

তাদের আলো তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন। (সূরা তাহরীম : ৮)

কেননা, অধিক কাশফ ব্যতীত নূরের পূর্ণতা প্রভাব ফেলে না। আর এ কারণেই শুধু আরেফগণই রুইয়াত ও দীদারের স্তরে পৌঁছতে পারেন, অন্য কেউ নয়। কেননা, মারেফাত হলো এমন এক বীজ, যা আখেরাতে

মুশাহাদায় পরিণত হয়। যেমনিভাবে বীজ এক সময় গাছে পরিণত হয়। যে ব্যক্তি জমিনে কোনো বীজ রোপন করে না, সে গাছ পাবে কীভাবে? আর যে দানা বপন করে না, সে ফসল পাবে কীভাবে? ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহর মারেফত হাসিল করবে না, সে আখেরাতে আল্লাহর দীদার লাভ করবে কীভাবে?

মারেফাত বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে। এমনিভাবে তাজাল্লীও বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে। যেমন বীজের ভিন্নতার কারণে উদ্ভিদও বিভিন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ, বীজ যদি কমবেশি হয় বা ভালো-খারাপ হয় তাহলে শস্যও তেমন হবে।

এদিক লক্ষ করে নবী কারীম (স) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সকল মানুষের প্রতি সাধারণ তাজাল্লী দিয়ে থাকেন আর আবু বকরের প্রতি বিশেষ তাজাল্লী দেন। (মুসতাদরাকে হাকেম : ৩ : ৭৮)

সুতরাং এ ধারণা করা উচিত নয় যে, আবু বকর (রা)-এর চেয়ে কম স্তরের লোক এমন মর্যাদা লাভ করবে। বরং তাঁর একশ ভাগের এক ভাগও লাভ করবে না। যেহেতু আবু বকর (রা) মারেফাতের বিষয়ে অন্য লোকের চেয়ে অনেক ওপরে ছিলেন তাই তিনি বিশেষভাবে এ তাজাল্লীর উপযুক্ত হয়েছেন।

দুনিয়াতে দেখা যায়, কিছু লোক নেতৃত্বকে খাবার ও বিবাহের ওপর প্রাধান্য দেয়। আবার কিছু লোককে দেখা যায়, তারা ইলম, আসমান-জমিনের রহস্যের জ্ঞান এবং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয়কে নেতৃত্ব, বিবাহ ও পানাহারের ওপর প্রাধান্য দেয়। ঠিক তেমনিভাবে আখেরাতে এমন কিছু লোক থাকবে, যারা আল্লাহর দীদারকে জান্নাতের অন্য সব নেয়ামতের ওপর প্রাধান্য দিবে। এরা ওই সকল লোক, যারা ইলম, মারেফত ও প্রভুত্ব রহস্যের জ্ঞানকে অন্য সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

হযরত রাবেয়া বসরী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, জান্নাত সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি বললেন, প্রথমে ঘরের মালিক তারপর ঘর।

তাঁর এ বক্তব্য দ্বারা এবিষয়টি স্পষ্ট যে, জান্নাতের প্রতি তাঁর কোনো খেয়াল নেই। তাঁর খেয়াল একমাত্র জান্নাতের মালিক আল্লাহর দিকে।

সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহকে চিনবে না, সে আখেরাতে আল্লাহকে দেখবে না। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মারেফাতের স্বাদ পাবে না, সে

আখেরাতে দীদারের স্বাদও পাবে না। কেননা, দুনিয়ার কর্মই আখেরাতে তার সঙ্গী হবে। যে ফসল বুনেছে সেই ফসল কাটবে। মানুষ যে অবস্থার ওপর মৃত্যুবরণ করেছে, সে অবস্থায়ই তার হাশর হবে। আর যে বিষয়ের ওপর সে জীবিত ছিল তার ওপরই সে মৃত্যুবরণ করবে। সুতরাং যে পরিমাণ মারেফাতের পাথেয় সাথে থাকবে, সে পরিমাণই আনন্দ সে ভোগ করবে। ওই মারেফাতই এক সময় মুশাহাদায় রূপান্তরিত হবে এবং আনন্দ আরও বৃদ্ধি পাবে। যেমন আশেক যখন তার মাহবুবের চেহারা কল্পনায় আনে এরপর স্বচক্ষে দেখে তখন এটাই তার কাছে সবচেয়ে বড় আনন্দের বিষয় হয়। আর জান্নাতে প্রত্যেকেই তার পছন্দের জিনিস পাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর দীদার ব্যতীত অন্য কিছু চায় না, সে আল্লাহর দীদার ব্যতীত অন্য কিছুতে আনন্দ পায় না; বরং কখনো কষ্টও পায়।

মোটকথা, আল্লাহর প্রতি মহব্বতের পরিমাণ অনুযায়ী জান্নাতের নেয়ামত প্রাপ্ত হবে আর আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি হবে মারেফাতের পরিমাণ অনুযায়ী। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, সৌভাগ্যের মূল হচ্ছে মারেফাত। শরিয়ত যাকে ঈমান বলে ব্যাখ্যা করেছে।

দুনিয়াতে মাশুকের চেহারা দেখার আনন্দ কয়েকটি কারণে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

এক. মাশুকের সৌন্দর্যের পূর্ণতা ও অপূর্ণতা। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্যের প্রতি তাকানোর দ্বারা আনন্দ লাভ হওয়া স্বাভাবিক।

দুই. ভালোবাসা ও আগ্রহের পূর্ণতা। সুতরাং যার আগ্রহ ও ভালোবাসা বেশি হবে, তার আনন্দও বেশি হবে। আর যার কম হবে, তার আনন্দও কম হবে।

তিন, অনুভব-উপলব্ধির পূর্ণতা। সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রেমাষ্পদ কোনো অন্তরায় ব্যতীত একেবারে কাছ থেকে পরিপূর্ণ আলোতে দেখবে, তার আনন্দ বেশি হবে। আর যে ব্যক্তি তার প্রেমাষ্পদ অন্ধকারে পর্দার আড়ালে অথবা দূর থেকে দেখবে, তার আনন্দ অবশ্যই কম হবে।

চার. প্রতিবন্ধকতা ও অন্তরের বিশৃঙ্খলা দূর হওয়া। সুতরাং যে ব্যক্তি সুস্থতা ও কোনো ভয় ব্যতীত তার মাশুককে দেখবে, তার আনন্দ বেশি হবে আর যে ব্যক্তি অসুস্থতা ও ভয় নিয়ে তার মাশুককে দেখবে, তার আনন্দ কম হবে।

এখন তুমি ভেবে দেখো, এক আশেক যার ইশক দুর্বল, যে দূর থেকে পাতলা পর্দার আড়ালে তার মাশুককে দেখে এমনভাবে যে, তার প্রকৃত চেহারা সে দেখতে পায় না। তাছাড়া ওই আশেকের আশেপাশে রয়েছে সাপ, বিচ্ছু, যা তাকে দংশন করছে এবং তার মনকে সেদিকে ব্যস্ত রাখছে। এমন পরিস্থিতিতে থেকেও সে তার মাশুককে দেখে কিছু না কিছু আনন্দ লাভ করে। কিন্তু যদি হঠাৎ এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়, যেখানে কোনো পর্দা নেই। চারিদিক স্পষ্ট, আলোকিত। কষ্টদায়ক কোনো কিছুই নেই। লোকটি সুস্থ, চিন্তামুক্ত, কামনা ও ইশকের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তাহলে এমন ব্যক্তির অবস্থা কেমন হবে?

এ উদাহরণের আলোকে মারেফাতের আনন্দ ও দীদাদের আনন্দের পার্থক্য বোঝা উচিত। এখানে পাতলা পর্দা হলো মানুষের দেহের উদাহরণ। সাপ, বিচ্ছু, ইত্যাদি হলো প্রবৃত্তির উদাহরণ, যা মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যেমন ক্ষুধা, পিপাসা, রাগ, চিন্তা ইত্যাদি। আগ্রহ ও মহব্বতের দুর্বলতার উদাহরণ হলো, নফস দুনিয়াতে ব্যস্ত থাকবে, সর্বোচ্চ সমাবেশ অর্থাৎ, ফেরেশতাদের সমাবেশের প্রতি আগ্রহ কম থাকবে এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের প্রতি আগ্রহী হবে। বিষয়টি এমন হলো যে, কোনো শিশু স্বল্প বুদ্ধির কারণে নেতৃত্ব থেকে দূরে থাকে এবং পাখি নিয়ে খেলতে পছন্দ করে। আরেফ ব্যক্তির মারেফাত দুনিয়াতে যতই মজবুত হোক না কেন এসকল বিশৃঙ্খলা তাদের পিছু ছাড়ে না।

তবে অনেক সময় এসকল প্রতিবন্ধকতা দুর্বল হয়ে যায়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় আর কোনো প্রতিবন্ধকতা বাকি নেই। তখন চক্ষু মারেফতের সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিবেক স্থির হয়ে যায়। কখনো এ আনন্দ এত বেশি হয় যে, এর ভারত্ব অন্তর সহ্য করতে পারে না। মনে হয় তা যেন ফেটে যাবে। কিন্তু এ আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না; বরং তা অন্তরে এমনভাবে এসে চলে যায়, যেমন আসমানে বিজলি চমকে। কখনো আরেফের অন্তরে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা চেপে বসে, যা তার সব আনন্দ নষ্ট করে দেয়। এ নশ্বর পৃথিবীতে এমন অবস্থা প্রায়ই হয়ে থাকে। মৃত্যু পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। আর উত্তম জীবন তো মৃত্যুর পর হবে। আর আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত! (সূরা আনকাবুত : ৬৪)

সুতরাং যে ব্যক্তি এ স্তরের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, সে আল্লাহর সাক্ষাতের অপেক্ষা করবে। মৃত্যুকেও পছন্দ করবে। তবে মারেফাতের পূর্ণতার জন্য অপেক্ষা করবে। কারণ, মারেফাত হলো বীজের মতো। যার যত্ন যত ভালো হবে তা তত সুন্দর বৃক্ষে পরিণত হবে। মারেফাত এমন এক সমুদ্র, যার কোনো তীর নেই। যা পার হওয়া অসম্ভব। যদিও আল্লাহর সৌন্দর্য ও বড়ত্বের বাস্তবতা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়; কিন্তু তাঁর সিফাত, ক্রিয়াকর্ম ও রহস্যের মারেফাত যত বেশি হবে আখেরাতের নেয়ামত ও আনন্দও তত বেশি হবে। আর মারেফাতের বীজ দুনিয়া ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। অন্তর তার রোপন ক্ষেত্র। এর ফল পাওয়া যাবে আখেরাতে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি অধিক মারেফাত লাভের আশায় দীর্ঘ জীবনের প্রতি আগ্রহী হলে এটা দূষণীয় নয়। এদিকে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

اَفْضَلُ السَّعَادَاتِ طُوْلُ الْعُمُرِ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ.

সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য হলো আল্লাহর ইবাদতে দীর্ঘ জীবন লাভ করা। (মুসনাদুশ শিহাব : ৩১২)

মোটকথা, দীর্ঘ জীবনের কারণে মানুষের মারেফত বেশি ও পরিপূর্ণ হয়। কেননা, মানুষ ফিকির ও আমলে যে পরিমাণ লিপ্ত থাকবে এবং দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে যে পরিমাণ পরিশ্রম করবে, সে পরিমাণ তার মারেফাত বৃদ্ধি পাবে।

যদি কোনো আরেফ মৃত্যুকে পছন্দ করে তাহলে এর কারণ হলো, সে নিজেকে মারেফাতের ওই স্তরের মনে করে। আর যদি অপছন্দ করে তাহলে এর কারণ হলো, সে দীর্ঘ জীবনের মাধ্যমে অধিক মারেফাত হাসিল করতে চায়। আরেফের মৃত্যুকে পছন্দ ও অপছন্দ করার এ হচ্ছে কারণ।

অন্য দিকে সকল মানুষের দৃষ্টি হলো দুনিয়ার প্রবৃত্তির প্রতি। যদি তা ব্যাপক হয় তাহলে সে দীর্ঘায়ু কামনা করে আর যদি ব্যাপক না হয়

তাহলে সে মৃত্যু কামনা করে। এ দুটি বিষয়ই বঞ্চনা ও ক্ষতির কারণ। যার মূল হচ্ছে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা। সুতরাং দুর্ভাগ্য জন্ম নেয় অজ্ঞতা ও উদাসীনতা থেকে আর সকল সৌভাগ্যের ভিত্তি হলো ইলম ও মারেফাত।

আমাদের আলোচনার মাধ্যমে তুমি ইশক ও মহব্বতের অর্থ জেনে গেছ। মারেফাত ও দীদারের আনন্দের উদ্দেশ্যও বুঝে গেছ। এ বিষয়টিও তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সকল জ্ঞানী ও কামালিয়াতের অধিকারীগণ এসব আনন্দকে অন্যসব আনন্দের ওপর কেন প্রাধান্য দিয়েছেন। যদিও স্বল্প জ্ঞানের লোকদের কাছে তা প্রাধান্যের বিষয় নয়। যেমন ছোটো বাচ্চার কাছে নেতৃত্বের আনন্দ খেলাধুলার আনন্দের চেয়ে বড় নয়।

একটি প্রশ্ন : আখেরাতে রুইয়াত কি অন্তর দিয়ে হবে নাকি চোখ দিয়ে?

উত্তর : এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এ মতভেদের প্রতি দৃষ্টি দেন না। একে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করেন না। তারা বলেন, জ্ঞানী ব্যক্তি ফল খায়; কিন্তু ফলগাছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি তার মাশুককে দেখতে আগ্রহী, সে এ চিন্তা করে না যে, তার চোখ দেখবে না তার কপাল দেখবে; বরং তার উদ্দেশ্য থাকে তাকে দেখা ও আনন্দ লাভ করা। তা চোখের মাধ্যমে হোক বা অন্য কিছুর মাধ্যমে।

এক্ষেত্রে সঠিক কথা হলো, আল্লাহর কুদরত ব্যাপক। এজন্য আমরা নির্দিষ্টভাবে বলতে পারি না যে, রুইয়াত কোনো এক বস্তুর মাধ্যমে হবে। এমনও হতে পারে যে, আখেরাতে চোখ ও অন্তর উভয়টাকেই শক্তি প্রদান করা হবে। এটা একটা সম্ভাব্য বিষয়। মূলত আখেরাতে কী হবে তা আমরা শরিয়ত প্রণেতা থেকে জানা ব্যতীত বলতে পারব না। শরিয়তের প্রমাণাদির মাধ্যমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো, চোখে রুইয়াতের শক্তি দান করা হবে। যাতে করে রুইয়াত, নজর এবং এ বিষয়ে ব্যবহৃত অন্য সব শব্দ নিজের বাহ্যিক অবস্থার ওপর প্রয়োগ হয়। বাহ্যিক অর্থ থেকে বিরত থাকা কেবল প্রয়োজনবশত জায়েয। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহর মহব্বত মজবুত হওয়ার পদ্ধতি

পরকালে সে ব্যক্তি সর্বাধিক ভাগ্যবান হবে, যার মহব্বত আল্লাহ তাআলার সঙ্গে অধিকতর মজবুত হবে। কেননা, পরকালের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নিকট গিয়ে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হাসিল করা। বলাবাহুল্য, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আশেক যখন তার মাশুকের নিকট যাবে, তার দীদারে ধন্য হবে, কোনো প্রকার বাধাবিঘ্ন এবং বিচ্ছিন্নতার কোনো ভয় থাকবে না, তখন কী অভাবনীয় আনন্দই না তার হাসিল হবে। কিন্তু এ আনন্দ হবে মহব্বতের শক্তি অনুপাতে। মহব্বত যত অধিক হবে, আনন্দও তত অধিক হবে।

এ দুনিয়ায় আল্লাহর মহব্বত থেকে কোনো ঈমানদার মুক্ত নয়। কিন্তু মহব্বতের আধিক্য যাকে ইশক বলা হয়, তা অনেকের মধ্যে বিদ্যমান নেই। এই ইশক লাভের উপায় দুটি– দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং অন্তর থেকে গায়রুল্লাহর মহব্বত বের করে দেওয়া। কেননা, অন্তর হচ্ছে অনেকটা পানীয়-পাত্রের মতো। পাত্রে যদি পানি থাকে তাহলে তাতে সিরকা রাখার সুযোগ থাকে না। আল্লাহ তাআলা কাউকে দুটি অন্তর দেননি যে, একটির মাধ্যমে মহব্বত করবে আল্লাহকে এবং অপরটির মাধ্যমে মহব্বত করবে গায়রুল্লাহকে। আল্লাহকে সর্বান্তকরণে চাওয়াই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ মহব্বত। অপরের দিকে যে পর্যন্ত মনোযোগ রাখবে, সে পর্যন্ত মন অপরের সাথে এক প্রকার মগ্ন থাকবে এবং যে পরিমাণ অপরের সাথে মগ্ন থাকবে, সে পরিমাণ অন্তরে আল্লাহর মহব্বত কম হবে। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে এই একাগ্রতার দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে,

قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ.

বলুন, 'আল্লাহই' (তো নাযিল করেছেন), অতঃপর তাদেরকে তাদের নিরর্থক খেলায় মগ্ন থাকতে দিন। (সূরা আনআম : ৯১)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا.

অপরদিকে যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ', অতঃপর অবিচল থাকে। (সূরা হা-মীম সাজদাহ : ৩০)

কালিমায়ে তাইয়িবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর উদ্দেশ্য এটিই। অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত নেই কোনো মাবুদ ও মাহবুব। বলাবাহুল্য, মাহবুবই মাবুদ হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন–

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ.

আপনি কি তাকে দেখেননি, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে? (সূরা ফোরকান : ৪৩)

আল্লাহর রাসূল (স) বলেন–

اَبْغَضُ اِلٰهٍ عُبِدَ فِى الْاَرْضِ الْهَوَاءُ.

অর্থাৎ, সর্বনিকৃষ্ট মাবুদ, পৃথিবীতে যার পূজা করা হয়, সে হচ্ছে মনের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি। (মুজামে কাবীর, তাবারানী : ৮ : ১০৩)

অন্য হাদিসে আছে– مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থাৎ, যে নিষ্কলুষ মনে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (মুজামে আওসাত, তাবারানী : ১২৩৫)

এখানে নিষ্কলুষ অর্থ অন্তরকে আল্লাহর জন্য খাঁটি করা, যাতে অপরের অংশীদারিত্ব না থাকে এবং একমাত্র আল্লাহই অন্তরের মাবুদ, মাহবুব ও উদ্দেশ্য হওয়া। এই অবস্থা যার, দুনিয়া তার জন্য জেলখানা। কেননা, মাহবুবের সঙ্গে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে দুনিয়া একটি প্রতিবন্ধক। মৃত্যু হচ্ছে তার জন্য বন্দিশালা থেকে মুক্তি এবং মাহবুবের কাছে যাওয়ার উপায়। যার মাহবুব এক সত্তা এবং সে জেলখানায় থেকে দীর্ঘ প্রতীক্ষা করে, সে যদি বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে মাহবুবের সঙ্গে মিলিত হয় এবং চিরদিন পর্যন্ত অনাবিল সুখে কাটায়, সে কতই না ভাগ্যবান!

দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে শক্তিশালী হওয়াও আল্লাহর মহব্বত দুর্বল হওয়ার একটি কারণ। দুনিয়ার ভালোবাসায় রয়েছে পরিবার, সন্তান, সম্পদ, আত্মীয়স্বজন, জমিন, পশু-পাখি, বাগান ইত্যাদি। এমনকি কেউ যদি পার্থিব কণ্ঠে মোহিত হয় এবং ভোরের নির্মল বাতাসে বিমুগ্ধ হয় তাহলে বলা হবে, এ ব্যক্তি দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মনযোগী। আর এ কারণে সে আল্লাহর মহব্বতে ত্রুটি করছে।

দুনিয়ার প্রতি তার যে পরিমাণ আসক্তি বৃদ্ধি পাবে আল্লাহ থেকে সে পরিমাণ আগ্রহ তার কমে যাবে। মানুষ দুনিয়া থেকে যে পরিমাণ অংশ গ্রহণ করে ঠিক সে পরিমাণ অংশ আখেরাত থেকে কমিয়ে দেওয়া হয়। যেমন, মানুষ পশ্চিম দিকে যতটুকু অগ্রসর হয় ঠিক ততটুকু সে পূর্ব দিক থেকে দূরে সরে যায়। সুতরাং দুনিয়া ও আখেরাত হলো পূর্ব-পশ্চিমের মতো। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা তাদের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তা অবলোকন করেছেন।

অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বত নির্মূল করার পন্থা হলো যুহদের পথ অবলম্বন করা ও সার্বক্ষণিক ধৈর্য।

তওবা, ধৈর্য, যুহদ, ভয় ও আশা সম্পর্কে ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলোর ওপর আমল করা মূল মহব্বতের দুই রোকনের একটি হাসিল করার মাধ্যম। আর সে রোকন হলো অন্তরকে গায়রুল্লাহ থেকে মুক্ত করা। এর শুরু হলো, আল্লাহ, কেয়ামত দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামের ওপর ঈমান আনয়ন করা। এরপর তা থেকে ভয় ও আশা সৃষ্টি হয়। অতঃপর এদুটি থেকে তওবা ও সবর প্রকাশ পায় এবং ধীরে ধীরে অন্তরের এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, তাতে ধনসম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দুনিয়াবী কোনো আনন্দের প্রতি আগ্রহ থাকে না; বরং অন্তর সব পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র হয়ে যায়। এক পর্যায়ে তা আল্লাহর মহব্বত ও মারেফাতের জন্য বিস্তৃত হয়ে যায়।

এসবকিছুই অন্তর পবিত্রকরণের ভূমিকাস্বরূপ। আর তা মহব্বতের দুই রোকনের একটি। আর এদিকেই ইঙ্গিত করে নবী কারীম (স) বলেছেন,

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ.

পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। (সহিহ মুসলিম : ২২৩)

মহব্বত সুদৃঢ় হওয়ার আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে, খোদায়ী মারেফাত শক্তিশালী হওয়া ও অন্তরে তা বিস্তৃত হওয়া। মারেফাত দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক থেকে অন্তর পবিত্র হওয়ার পর অর্জিত হয়। যেমন, শস্যক্ষেত্রকে আগাছা মুক্ত করার পর তাতে বীজ বপন করা হয়। অন্তরকে এভাবে পবিত্র করার পর তাতে মহব্বত ও মারেফাতের গাছ জন্মে। কালিমায়ে তাইয়িবা এ গাছের নাম। আল্লাহ তাআলা যার বর্ণনা করেছেন এভাবে—

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ.

আপনি কি দেখেননি আল্লাহ কীভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎবাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষের মতো, যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত। (সূরা ইবরাহীম : ২৪)

এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে অন্য এক আয়াতে,

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ.

তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ সমুত্থিত হয় এবং সৎকর্ম তাকে সমুন্নত করে। (সূরা ফাতির : ১০)

এখানে পবিত্র কালামের অর্থ মারেফাত, আর সৎকাজ এই মারেফাতের বাহক ও দাসের মতো।

অন্তরকে পবিত্র করে তার পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখাই সকল প্রকার সৎকর্মের উদ্দেশ্য। এভাবে মারেফাত হাসিল হলে তার পেছনে অবশ্যই মহব্বত থাকবে। আর মহব্বত থাকলে আনন্দও থাকবে।

ইলম হলো আমলের পদ্ধতি জানার নাম। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইলমই প্রথম এবং ইলমই শেষ। প্রথম ইলম হলো ইলমে মুআমালা। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমল। ইলমে মুআমালার মাধ্যমে অন্তরকে পবিত্র করা হয়। যেন তাতে আল্লাহর তাজাল্লী প্রবেশ করে এবং মারেফাতের ইলম দ্বারা সুসজ্জিত হতে পারে। আর ইলমে মারেফাতের অপর নাম হলো ইলমে মুকাশাফা। আর এটাই দ্বিতীয় ইলম।

ইলমে মারেফাত হাসিল হলে মহব্বতও হাসিল হয়ে যায়। বিষয়টি এমন যে, মধ্যম স্বভাবের কোনো ব্যক্তি একটি সুন্দর বস্তু দেখল। যখন সে তার প্রতি আকৃষ্ট হবে তখন তাকে মহব্বত করবে। যখন মহব্বত করবে তখন আনন্দও অনুভব করবে। সুতরাং আনন্দ স্বভাবত মহব্বতের অধীন। আর মহব্বত মারেফাতের অধীন। বান্দা ওই মারেফাত পর্যন্ত তখনই পৌঁছতে পারে যখন সে দুনিয়াবি সকল সম্পর্ক ছিন্ন করবে। আর এ দুনিয়াবি সম্পর্ক ছিন্নকরণ স্বচ্ছ চিন্তাভাবনা, স্থায়ী যিকির, আল্লাহর সত্তা, তাঁর গুণাবলি, তাঁর কর্তৃত্ব ইত্যাদি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা ছাড়া সম্ভব নয়।

মারেফাত ও মহব্বতের এ স্তরের অধিকারীগণ দুশ্রেণির। এক. শক্তিশালী। তারা প্রথমে আল্লাহর মারেফাত হাসিল করে। অতঃপর আল্লাহর মাধ্যমে অন্যকে চেনে।

দুই. দুর্বল। প্রথমে তারা ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে জানে। অতঃপর এর মাধ্যমে কর্তা পর্যন্ত পৌঁছে।

নিম্নোক্ত আয়াতে প্রথম শ্রেণির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

اَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ.

আপনার প্রতিপালক সম্পর্কে এ-ই কি যথেষ্ট নয় যে, তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত? (সূরা হা-মীম সিজদাহ : ৫৩)

আরও ইরশাদ হয়েছে, شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ.

আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। (সূরা আলে ইমরান : ১৮)

এক আরেফকে জিজ্ঞেস করা হলো, কীসের মাধ্যমে আপনি আপনার রবকে চিনতে পেরেছেন? আরেফ বললেন, আমি আমার রবের মাধ্যমেই তাকে চিনতে পেরেছি। যদি তিনি না হতেন তাহলে আমি তাকে চিনতে পারতাম না। (আর রিসালাতুল কুশায়রিয়্যা : ৫১৪)

নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে,

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَ فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ.

তাদেরকে আমি আমার নিদর্শনসমূহ দেখাব, বিশ্বজগতেও এবং তাদের নিজেদের অস্তিত্বের ভেতরেও; ফলে তাদের কাছে স্পষ্ট হবে যে, তা-ই (কুরআন) সত্য। আপনার প্রতিপালক সম্পর্কে এ-ই কি যথেষ্ট নয় যে, তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত? (সূরা হা-মীম সিজদাহ : ৫৩)

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.

তারা কি লক্ষ করে না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে। (সূরা আরাফ : ১৮৫)

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ.

বলুন, তোমরা 'আকাশমণ্ডলী ও ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কিছুর প্রতি লক্ষ করো।' (সূরা ইউনুস : ১০১)

اَلَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ.

যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে আপনি কোনো খুঁত দেখতে পাবেন না। আপনি আবার তাকিয়ে দেখুন, কোনো ত্রুটি দেখতে পান কি?

অতঃপর আপনি বারবার দৃষ্টি ফেরান, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে আপনার দিকে ফিরে আসবে। (সূরা মুলক : ৩-৪)

অধিকাংশ মানুষের জন্য এ পন্থাটি অধিক সহজ। আর সালিকদের জন্য এতে অনেক সুযোগও রয়েছে। কুরআন কারীম অসংখ্য আয়াতের মাধ্যমে চিন্তাভাবনা, উপদেশ গ্রহণ ইত্যাদির প্রতি আহবান করেছে।

যদি কেউ বলে, এ দুটি পদ্ধতিই কঠিন মনে হচ্ছে, যে কোনো একটি পদ্ধতি সহজভাবে বর্ণনা করলে ভালো হতো।

এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো, প্রথম পদ্ধতি অর্থাৎ, যেখানে আল্লাহর মাধ্যমে মাখলুকের মারেফাত হাসিল হয় তা কঠিন ও সূক্ষ্ম, সাধারণ মানুষ তা বুঝতে অক্ষম।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সহজ এবং সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য। মূলত মানুষ এসব বিষয় বুঝতে সচেষ্ট হয় না। বরং পার্থিব প্রবৃত্তি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আলোচ্য পদ্ধতির ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে না। কারণ, এর বিষয়বস্তু অতি দীর্ঘ, তার প্রকারও অসংখ্য, যা গণনা করা অসম্ভব। কারণ, আসমানের উঁচু থেকে জমিনের নিচু পর্যন্ত কোনো অণু এমন নেই যা আল্লাহর পরিপূর্ণ কুদরত, হেকমত, বড়ত্ব ও মর্যাদা প্রমাণ করে না। এমন অণু অসংখ্য পরিমাণে রয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ.

বলুন, আমার প্রতিপালকের কথা লেখার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে। (সূরা কাহাফ : ১০৯)

তাছাড়া এ ইলমে লিপ্ত হওয়ার অর্থ হলো ইলমে মুকাশাফার সমুদ্রে ডুব দেওয়া। ইলমে মুকাশাফাকে ইলমে মুআমালার দিক থেকে গুরুত্বহীন মনে করা ঠিক নয়। আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে সংক্ষেপে এ বিষয়ে আলোচনা করব। যাতে করে এ জাতীয় অন্য বিষয়ে অবহিত হওয়া যায়।

উপরিউক্ত দুটি পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো, ক্রিয়াকর্মের মারেফাতের মাধ্যমে আল্লাহর মারেফাত হাসিল করা। আর আল্লাহর ক্রিয়াকর্ম অনেক। সুতরাং আমরা সবচেয়ে কম ও ছোটো কর্ম তালাশ করবো এবং এর আশ্চর্যজনক বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা করব।

পৃথিবী ও তাতে বসবাসকারী সৃষ্টিজীব ফেরেশতা ও আসমানী সৃষ্টিজীবের তুলনায় ছোটো ও নগন্য। পৃথিবীকে যদি মানুষের দেহের আকৃতিতে দেখা হয় তাহলে সূর্যকে দেখে ছোটো মনে হবে। অথচ সূর্য পৃথিবীর চেয়ে হাজারগুণ বড়। এক দিকে সূর্যের প্রশস্ততা দেখো, আর অন্য দিকে আসমানের প্রশস্ততা দেখো। যার সাথে সূর্য সংযুক্ত। অথচ আসমান ও সূর্যের প্রশস্ততায় কোনো সামঞ্জস্যতা নেই। সূর্যের কেন্দ্র হচ্ছে চতুর্থ আসমান আর এ আসমান ওপরের আসমানের তুলনায় খুবই ছোটো, আর সাত আসমান আল্লাহর কুরসির সামনে বিস্তীর্ণ ভূমিতে ফেলে রাখা লোহার বৃত্তের মতো। ঠিক কুরসিও আরশের সামনে সাত আসামনের মতো।

সূর্য, আসমান, আরশ, কুরসি এগুলোকে সামনে রেখে দেখলে পৃথিবীকে খুব ছোটো ও নগন্য মনে হবে; বরং পৃথিবী তো দুনিয়ার সমুদ্রের চেয়েও ছোটো। যেমন বর্ণনায় রয়েছে, সমুদ্রে পৃথিবী এমন, পৃথিবীতে আস্তাবল যেমন। অভিজ্ঞতা ও মুশাহাদার মাধ্যমেও এ বিষয়টি জানা যায় যে, পৃথিবীর যে সকল অংশ পানি থেকে আলাদা তা দেখতে একটি ছোটো উপদ্বীপের মতো মনে হয়।

পৃথিবীর পর এখন পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের প্রতি লক্ষ করো। যা মাটির তৈরি এবং লক্ষ করো অন্য সকল প্রাণীর প্রতি। পুরো পৃথিবীর সামনে তা একবারেই ছোটো ও নগন্য। সব প্রাণী বাদ দিয়ে সবচেয়ে ছোটো প্রাণী

যেমন মশা ও মাছির কথা খেয়াল করো, মশা এত ছোটো দেহের প্রাণী হয়েও বড় প্রাণী হাতির মতো দেখতে। হাতির মতো তার সুড় রয়েছে এবং অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও রয়েছে। যেমন, ডানা, চোখ, মুখ, কান, নাক ইত্যাদি। তাছাড়া অন্যান্য প্রাণীর মতো তার মধ্যে আহার আকর্ষণ, প্রতিরোধ, বহন ইত্যাদি শক্তিও রয়েছে। এগুলো তার আকৃতি ও গুণের বর্ণনা।

এরপর এটাও লক্ষ করো যে, আল্লাহ তাকে বুদ্ধিও দান করেছেন। তাকে খাবারের প্রতি পথ দেখিয়েছেন। তাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তার খাদ্য হলো মানুষের রক্ত। তাকে ডানা দান করেছেন। তার মাধ্যমে উড়ে মানুষের কাছে যাওয়ার শক্তি দান করেছেন। মশা তার সূক্ষ্ম সুড়ের মাধ্যমে খুব সহজেই মানুষের রক্ত চুষে নেয়। তার দৃষ্টি খুবই তীক্ষ্ণ। অন্ধকারের মধ্যেও সে মানুষের রক্তের স্থানে তার সুড় প্রবেশ করাতে পারে এবং রক্ত তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে তাকে শক্তিশালী করে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে মানুষের হাত থেকে বাঁচার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। তাকে পালানোর কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। তাকে সূক্ষ্ম শ্রবণশক্তি দান করেছেন। ফলে দূরে থেকেও মানুষের হাতের হালকা নড়াচড়া সে উপলব্ধি করতে পারে। আর যখন হাত স্থির হয়ে যায় তখন পুনরায় সেখানে গিয়ে বসে রক্ত খায়।

মশার অক্ষিকোটরগুলো দেখো, কত ছোটো ছোটো। কিন্তু তার দৃষ্টি খুবই তীক্ষ্ণ যে, নিজের খাদ্যের স্থান সে দেখে নিতে পারে। মশা-মাছির মতো প্রাণীর চোখের পাতা ছোটো হওয়ার কারণে তা বহন করতে পারে না। কিন্তু ধুলোময়লা থেকে চোখকে বাঁচানোর জন্য চোখের পাতা প্রয়োজন। একারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুটি হাত দান করেছেন। তুমি লক্ষ করলে দেখবে, এরা সব সময় দু হাত দিয়ে চেহারা মুছতে থাকে।

মানুষ ও অন্য বড় প্রাণীকে চোখের সাথে সাথে এর পাতাও দান করা হয়েছে। যা উপরে ও নিচে থাকে। এ দুটি যখন একত্র হয় তখন চোখ বন্ধ হয়ে যায়। এদুটির কিনারায় চিকন চিকন লোম রয়েছে। যেন ধুলোময়লা সেখানে জমা হয় এবং তাকে চোখের পাতার দিকে স্থানান্তরিত করে। চোখের পাপড়িকে কালো বানানো হয়েছে। যেন চোখের আলো জমা থাকে, দেখার ক্ষেত্রে সহযোগিতা হয়, চোখ দেখতে

সুন্দর লাগে এবং ধুলোবালির সময় জালের মতো হয়ে যায়, যেন বাহিরের ময়লা চোখে না ঢোকে এবং দেখার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা না হয়।

মশার দুটি পরিষ্কার অক্ষিকোটর রয়েছে। কিন্তু তার সাথে পাতা নেই। আল্লাহ তাকে দুহাত দিয়ে তা পরিষ্কার করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন।

মশার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হওয়ার কারণে তাকে কখনো প্রদীপের আগুনে পড়তে দেখা যায়। ফলে সে দিনের আলোর মুখাপেক্ষী। প্রদীপের আলো তার জন্য যথেষ্ট নয়। মশা যখন রাতে কোনো প্রদীপের আলো দেখে তখন মনে করে, সে একটি অন্ধকার ঘরে রয়েছে আর ওই প্রদীপ হলো আলোতে পৌঁছার দরজা। তখন সে আলোর সন্ধানে নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ করে। যদি সে একবার বেঁচেও যায় তখন ভাবে যে, সে অন্ধকারের জন্য দরজা খুঁজে পায়নি। ফলে পুনরায় সেখানে ফিরে যায় এবং আগুনে পুড়ে প্রাণ হারায়।

হয়তো তুমি ভাববে, দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা তো মশার অজ্ঞতা ও ত্রুটি। তাহলে তুমি জেনে রাখো, মানুষের অজ্ঞতা মশার অজ্ঞতার চেয়েও বড়। মানুষ যখন প্রবৃত্তিতে পতিত হয় তখন সে মশার আগুনে পতিত হওয়ার তুলনায় কম নয়। মানুষকে প্রবৃত্তির বাহ্যিক আলো প্রভাবান্বিত করে। সে জানে না যে, এর পিছনে ধ্বংসকারী বিষ রয়েছে।

এরপরও সে বারবার প্রবৃত্তিতে লিপ্ত হয় এবং একেবারে ডুবে যায়। তাতে আবদ্ধ হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষের অজ্ঞতা যদি মশার অজ্ঞতার মতো হতো!

মশা তো আলোতে ধোঁকা খায় এবং ধ্বংস হয়ে বেঁচে যায়। কিন্তু মানুষ প্রবৃত্তিতে ধ্বংস হয়ে চিরস্থায়ী ধ্বংসে পতিত হয়। একারণে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে আগুন থেকে বিরত রাখি। অথচ তোমরা পতঙ্গের ন্যায় আগুনে পতিত হও। (সহিহ বুখারী : ৬৪৮৩; সহিহ মুসলিম : ২২৮৪)

এ হলো আল্লাহর আশ্চর্যজনক সৃষ্টিসমূহের মধ্যে এক ছোটো প্রাণীর বিস্ময়কর সৃষ্টি। এতে এত পরিমাণ আশ্চর্য বিষয় লুক্কায়িত আছে যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই মিলে তার হাকিকত উদ্ভাবন করতে পারবে না। হাকিকত তো দূরের বিষয়, এর বাহ্যিক বিষয়ও জানতে পারবে না। গোপন বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহই জানেন।

সব প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে এমন আশ্চর্যজনক বিষয় রয়েছে। বরং প্রত্যেক প্রাণী ও উদ্ভিদের মাঝে এমন কিছু আশ্চর্য বিষয় রয়েছে, যা অন্য কারও মাঝে নেই। শুধুমাত্র তার মাঝেই নির্দিষ্ট।

তুমি মৌমাছি ও তার আশ্চর্য বিষয়াদির প্রতি লক্ষ করো। আল্লাহ তাআলা তাকে ঘর নির্মাণের পদ্ধতি জানিয়েছেন, ফলে সে পাহার, গাছ ও বাড়ির ছাদে ঘর নির্মাণ করে।

মৌমাছির লালা থেকে মধু ও মোম তৈরি হয়। যার একটি আলো দান করে আর অপরটি দান করে আরোগ্য। আশ্চর্যের বিষয় হলো, সে মধু অর্জনের জন্য ফুল-ফল ও কলির উপর বসে। কোনো নোংড়া ও নাপাক বস্তুর উপর বসে না। মৌমাছি তার আমিরের অনুগত। আমির অন্য মৌমাছির চেয়ে দৈহিকভাবে একটু বড় হয়ে থাকে। আল্লাহ তাকে এমন বিবেকবুদ্ধি দান করেছেন যে, যদি কোনো মৌমাছি ময়লা নিয়ে মৌচাকে আসতে চায় তাহলে সে সাথে সাথে তাকে মেরে ফেলে। কী আশ্চর্যজনক ব্যবস্থা পদ্ধতি! এ বিষয়টি থেকে ওই ব্যক্তিই উপকার লাভ করতে পারবে, যে নিজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। নিজের পেট ও লজ্জাস্থানকে প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত রাখে।

তুমি মৌমাছির ঘরের প্রতি লক্ষ করো, তা মোম দিয়ে তৈরি এবং ছয় কোণ বিশিষ্ট। একেবারে গোল নয় এবং চার, পাঁচ কোণ বিশিষ্টও নয়। এছয় কোণ বিশিষ্ট ঘর দেখে বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারও হতবাক হয়ে যায়। এটা একেবারে গোল নয় তবে গোলাকারের কাছাকাছি। যা মৌমাছির জন্য উপযুক্ত। কেননা, যদি তা চার কোণ বিশিষ্ট হতো তাহলে মৌমাছির জন্য উপকারী হতো না। কারণ, মৌমাছি হলো গোল ও লম্বা আকৃতির। সুতরাং চার কোণ বিশিষ্ট ঘরে থাকা তার জন্য উপকারী নয়। যদি ঘর গোলাকার হতো তাহলে ঘরের বাহিরের ছিদ্র উপকারী হতো না। কারণ, গোলাকার বস্তু যখন একটি অপরটির সাথে মিলিত হয় তখন তা দৃঢ় ও স্থির থাকতে পারে না। সুতরাং গোলাকার প্রাণীর জন্য ছয় কোণ বিশিষ্ট ঘর ব্যতীত অন্য ঘর উপযুক্ত নয়। আর এতে ছিদ্রও অবশিষ্ট থাকে না।

একটু ভেবে দেখো, আল্লাহ তাআলা এ ছোটো দেহের প্রাণীর প্রতি কী পরিমাণ দয়া করেছেন। তার প্রয়োজনীয় বিষয় তাকে সুন্দরভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা পুতপবিত্র। তাঁর মর্যাদা সুউচ্চ। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ বিস্তৃত।

আলোচ্য ক্ষুদ্র প্রাণীর বিস্ময়কর বিষয়াদি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। আর আসমান-জমিনের রহস্যাবলি থেকে বিরত থাকো। মশা-মাছি সম্পর্কে আমাদের স্বল্প জ্ঞানে যেটুকু আমরা লিখেছি তা পরিপূর্ণ নয়। আমরা যদি এর বিশদ আলেচনা করি তাহলে আমাদের জীবন ফুরিয়ে যাবে; কিন্তু তা পরিপূর্ণভাবে লেখা হবে না।

সুতরাং মানুষ যদি আল্লাহ তাআলার আশ্চর্যজনক বিষয়াবলি নিয়ে এমনিভাবে চিন্তা-গবেষণা করে তাহলে তার ওই মারেফাত হাসিল হয়ে যায়, যা পূর্বোল্লিখিত দুটি পদ্ধতির মধ্যে সহজ। আর মারেফাত বেশি হলে মহব্বতও বেশি হয়। যদি তুমি আল্লাহর সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করতে চাও তাহলে দুনিয়া অর্জন থেকে বিমুখ থাকো। স্থায়ী যিকির ও ফিকিরে সময় ব্যয় করো। তাহলে আশা করা যায়, ওই মারেফাত ও মহব্বতের কিছু অংশ তুমি পাবে এবং এর মাধ্যমে তুমি এমন রাজত্ব লাভ করবে, যার কোনো শেষ নেই।

মহব্বতের ক্ষেত্রে মানুষের স্তর ভেদের কারণ

সকল মুমিন ঈমানে এক হলেও মহব্বতে ভিন্ন। যেহেতু দুনিয়াতে নানা ধরনের মহব্বত ও মারেফাত হয়ে থাকে, তাই অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ তাআলার নামসমূহ ও গুণাবলির মধ্য থেকে যা শুনে তা-ই মুখস্থ করে। তারা এর অধিক কিছু জানে না। অনেকে এসব নাম ও গুণের অর্থ এমন কিছু কল্পনা করে, যা থেকে আল্লাহ তাআলা পবিত্র। স্পষ্টতই এরা গোমরাহ। আবার অনেকেই বাস্তব বিষয় সম্পর্কে মোটেই জানে না এবং এসবের কোনো অসার অর্থ কল্পনা করে না। বরং সরলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে এবং সকল প্রকার আলোচনা থেকে নিজেকে হেফাজত করে। সত্যি বলতে, এরাই আসহাবে ইয়ামীন। আর যারা প্রত্যেক নাম ও গুণের স্বরূপ সম্পর্কে যথাযথভাবে জানে তারা নৈকট্যশীল। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই তিন ধরনের মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন,

فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ. فَرَوْحٌ وَّ رَيْحَانٌ ۙ وَّ جَنَّتُ نَعِيْمٍ. وَ اَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ. فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ. وَ اَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ. وَّ تَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ.

অতঃপর সে (মৃত ব্যক্তি) যদি নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়, তবে (তার জন্য আছে) আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও নেয়ামতে ভরপুর উদ্যান, আর যদি সে ডান দিকের লোকদের একজন হয়, তবে (তাকে বলা হবে,) তোমার জন্য ডান দিকের লোকদের পক্ষ থেকে সালাম।' কিন্তু সে যদি (সত্য) অস্বীকারকারী ও পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার আপ্যায়ন হবে উষ্ণ পানির দ্বারা এবং জাহান্নামের দহন। (সূরা ওয়াকিয়া : ৮৭-৯৪)

এক্ষেত্রে আমরা একটি উপমার সাহায্যে মহব্বতের বিভিন্নতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব। যেমন, শাফেয়ি মতাবলম্বীরা হযরত ইমাম শাফেয়িকে মহব্বত করে। এ মহব্বতে ফকীহ, আলেম ও সাধারণ মানুষ সকলেই সমান অংশীদার। কারণ, সাধারণ মানুষ তাঁর জ্ঞান-গরিমা সংক্ষেপে এবং ফকীহগণ বিস্তারিতভাবে জানে। এ কারণে জনসাধারণের তুলনায় ফিকহবিদদের মহব্বতও অধিক হবে।

সাধারণ মানুষ অনেক সময় শুনে থাকে যে, অমুক ব্যক্তি লেখক, তার লেখা সুন্দর। কিন্তু সে লেখার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানে না। এক্ষেত্রে তার মারেফাত পরিপূর্ণ হয় না। একারণে তার মারেফাত ও মহব্বতও পরিপূর্ণ হয় না। কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তি যখন গ্রন্থ ও তার বিষয়বস্তু নিয়ে গবেষণা করে এবং তার আশ্চর্যজনক বিষয়সমূহ জানতে পারে তখন তার মহব্বত দ্বিগুণ হয়ে যায়। কারণ, শিল্প, কবিতা ও রচনার আশ্চর্যজনক বিষয়াবলি কর্তা ও লেখকের গুণের পরিপূর্ণতা প্রমাণ করে।

এমনিভাবে গোটা বিশ্ব আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও কারিগরির জ্বলন্ত উপমা। এ বিষয়টি সাধারণ মানুষ শুধু বিশ্বাস করে এবং এ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানে। এমনকি সামান্য একটি মাছির ভেতরে তারা এমন সব আশ্চর্য নিদর্শন দেখতে পান, যা শুনে জ্ঞান-বুদ্ধি হতবাক হয়ে যায়। একারণেই তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য, প্রতাপ ও পূর্ণতার গুণাবলি পূর্ণমাত্রায় জাগরূক থাকে। ফলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের ভালোবাসাও।

মহব্বতের যে পাঁচটি কারণ আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি, সেগুলোর কারণে মহব্বতে ব্যবধান হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহ তাআলাকে কেউ যদি এ কারণে মহব্বত করে যে, তিনি অনুগ্রহকারী ও নিয়ামতদাতা, তবে

তার এই মহব্বত হবে দুর্বল। কারণ, অনুগ্রহের পরিবর্তনে এ মহব্বতের পরিবর্তন নিশ্চিত। ফলে বিপদাপদে পড়ার সময় এ মহব্বত তেমন থাকে না, যেমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় থাকে। আর যদি কোনো লোক এ কারণে মহব্বত রাখে যে, মহব্বতের যোগ্যই আল্লাহর পবিত্র সত্তা, সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য সবই তাঁর হাসিল রয়েছে, তবে তার মহব্বত অনুগ্রহের পরিবর্তনে কখনো পরিবর্তিত হবে না; বরং সব সময় একই রকম থাকবে।

মোটকথা, আল্লাহ তাআলার মহব্বতের ক্ষেত্রে মানুষের স্তর ভেদ এসব কারণে হয় এবং পারলৌকিক সৌভাগ্যে এই ভেদের আলোকে বিভিন্ন হয়।

একারণে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّ اَكْبَرُ تَفْضِيْلًا.

আখেরাত তো নিশ্চয় মর্যাদার দিক থেকে মহত্তর ও গুণগত দিক থেকে শ্রেষ্ঠতম। (সূরা বনি ইসরাঈল : ২১)

আল্লাহর মারেফাত সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির-অক্ষমতা

পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সেগুলোর মধ্যে অধিকতর দৃশ্যমান ও স্পষ্টতর হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। সেজন্য মারেফাতের মধ্যে আল্লাহর মারেফাতই সর্বাগ্রে বোধগম্য হওয়া যুক্তিযুক্ত। তবে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বিপরীত বলে মনে হয়। এর কারণ অবশ্যই জানা প্রয়োজন।

আমরা আল্লাহ তাআলাকে অস্তিত্ব জগতের সর্বাধিক দৃশ্যমান ও প্রকৃষ্টতর বলেছি। আমরা এর কারণ ব্যাখ্যা করতে একটি উপমার আশ্রয় নিচ্ছি।

আমরা যদি কোনো মানুষকে লিখতে, সেলাই করতে বা অন্য কোনো কাজকর্ম করতে দেখি, তাহলে তার জীবিত হওয়া আমাদের নিকট সর্বাধিক স্পষ্ট হবে। অর্থাৎ, তার জীবন, জ্ঞান ও ক্ষমতা আমাদের মতে তার অন্যান্য বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলির চেয়ে অধিক স্পষ্ট হবে। কারণ, তার অভ্যন্তরীণ গুণাবলি যেমন, স্বাস্থ্য, রোগ ইত্যাদি সম্পর্কে তো আমরা অবগত নই। আর বাহিরের গুণাবলির মধ্যে কোনো কোনোটি আমরা জানি না আর কতক আমাদের জানা হয়ে যায়। যেমন— জীবন, জ্ঞান, কর্মক্ষমতা, ইচ্ছা ইত্যাদি।

এরপর আমরা যদি দুনিয়ার দিকে তাকাই, আমাদের জানা হয়ে যায় আল্লাহ তাআলার গুণাবলি। পাথর, মাটির টিলা, বৃক্ষ, তরুলতা, জীবজন্তু, জমিন, আসমান, সৌরজগত, পানি, স্থল ইত্যাদি সকল কিছুই আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, কুদরত, জ্ঞান ইত্যাদি গুণাবলির সাক্ষ্য দেয়। এগুলো এ বিষয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ যে, একজন স্রষ্টা, পরিচালক ও সবকিছুকে গতিশীলকারী অবশ্যই রয়েছেন। এ ধরনের সৃষ্টবস্তুর কোনো শেষ নেই। তাই আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলির প্রমাণসমূহেরও শেষ নেই।

যদি লেখকের জীবন, জ্ঞান ও কর্মক্ষমতা শুধু একটি প্রমাণ অর্থাৎ, তার হাতের নড়াচড়া দেখে প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে আল্লাহর অস্তিত্ব কীভাবে স্পষ্ট হবে না?! তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করে না, এমন কোনো বস্তু থাকা অসম্ভব। এমন কোনো বস্তু আমাদের ভেতরেও নেই এবং বাইরেও নেই। কারণ, প্রতিটি বিন্দু তার নিজস্ব ভাষায় ডেকে বলছে, আমি এমনিতেই বিদ্যমান ও চলমান নই। অন্য কেউ আমার উদ্ভাবন ও গতিশীলকারী। আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন, অস্থি-গ্রন্থি, রক্ত-মাংস ইত্যাদি সবকিছুই একজন স্রষ্টার প্রমাণ বহন করে বিধায় তিনি এতই স্পষ্ট হয়ে গেছেন যে, তাঁকে উপলব্ধি করতে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি স্থবির হয়ে যায়। কেননা, দুকারণে কোনো বস্তুকে হৃদয়ঙ্গম করতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি অকার্যকর। ১. সেই বস্তুর সত্তাগতভাবে অপ্রকাশ্য ও সূক্ষ্ম হওয়া এবং ২. বস্তুর সীমাতিরিক্ত দৃশ্যমান হওয়া। যেমন, বাদুড় রাতের অন্ধকারে দেখতে পায়; কিন্তু দিনের আলোয় দেখে না। এটা একারণে নয় যে, দিন রাতের চেয়ে অস্পষ্ট; বরং দিন এত বেশি স্পষ্ট যে, বাদুড়ের দুর্বল দৃষ্টি তাতে ধাঁধিয়ে যায়। সূর্যকিরণের তীর্যকতা তার দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত করে দেয়। যখন এর সাথে কিছু অন্ধকার মিলিত হয়, তখন বাদুড় দেখতে পায়। একইভাবে আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দুর্বল, আর আল্লাহ তাআলার বিকাশে রয়েছে অসাধারণ চমক। এমনকি তাঁর বিকাশ দ্বারা প্রতিটি বিন্দু আলোকোজ্জ্বল। ফলে এই অসাধারণ বিকাশই তাঁর গোপন ও অস্পষ্ট থাকার রহস্য হয়ে গেছে।

ব্যাপক প্রকাশের উদ্দেশ্যে গোপন থাকার তত্ত্ব শুনে হতভম্ব হওয়া উচিত নয়। কারণ, বস্তুর প্রকাশ ঘটে তার বিপরীত বস্তু দিয়ে।

যদি কোনো বস্তু এমন ব্যাপক হয় যে, তার কোনো বিপরীত নেই তাহলে তা উপলব্ধি করা খুবই কঠিন।

যদি বস্তুর প্রকার বিভিন্ন হয়, যার কিছু প্রকার বোধগম্য আর কিছু প্রকার বুঝে আসে না তাহলে এর মাঝে খুব সহজেই পার্থক্য করা যায়। আর যদি সকল বস্তু বোঝার পদ্ধতি একটি হয় তাহলে পার্থক্য বোঝা কঠিন হবে। যেমন পৃথিবীতে সূর্যের আলো। আমরা জানি, আলো এমন একটি পদার্থ, যা অন্যের মাধ্যমে অস্তিত্বে আসে। অর্থাৎ, সূর্যের মাধ্যমে। সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে আলোও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যদি সূর্য সর্বদা আলোকজ্জ্বল থাকত এবং কখনো অস্ত না যেত তাহলে আমরা ভাবতাম যে, শরীরের মধ্যে সাদা-কালো ইত্যাদি রং ব্যতীত আর কোনো কিছু নেই। কেননা, আমরা সব সময় এ রঙই চোখে দেখি। তাছাড়া আলো কোনো শরীরি বস্তু নয় যে, তা আয়ত্ত করা যাবে। কিন্তু যখন সূর্য অস্ত যায় এবং চারিদিকে অন্ধকার ছেঁয়ে যায় তখন আলো ও অন্ধকার এ দু অবস্থার মাঝে পার্থক্য বুঝে আসে এবং এ কথা উপলব্ধি হয় যে, শরীরি বস্তু যেমন রোদের আলোতে ছিল এবং একটি বিশেষ গুণে গুনান্বিত ছিল তা সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পৃথক হয়ে গেল। সুতরাং আমরা আলোর অস্তিত্ব তার অনস্তিত্ব দ্বারা জানতে পারলাম। যদি আলোর অস্তিত্বহীনতা না থাকত তাহলে আমরা আলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে কখনোই জানতে পারতাম না। কারণ, রোদের আলোতে শরীরি বস্তু একই রকম দেখা যায়। আলো-অন্ধকারের মাঝে কোনো পার্থক্য হয় না। দেখো, আলোর দ্বারা একটি বস্তুর অবস্থা কীভাবে সংশয়পূর্ণ হয়ে যায়। তাছাড়া অনুভবযোগ্য বস্তুর মধ্যে আলো হলো অধিক স্পষ্ট। কারণ, এর মাধ্যমে অন্য বস্তুও স্পষ্ট হয়।

কিন্তু এক অন্ধকার না হওয়ার কারণে ওই সকল বস্তু সংশয়পূর্ণ হয়ে যায়, যার ওপর আলোর প্রভাব পড়ে। এ উদাহরণকে সামনে রেখে ভাবো, আল্লাহ তাআলা অস্তিত্বের মধ্যে সব চেয়ে বেশি স্পষ্ট। সকল বস্তু তার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। যদি তাঁর অবিদ্যমান হওয়া, অনুপস্থিতি ও পরিবর্তন হওয়া সম্ভব হতো তাহলে আসমান-জমিন ভেঙে পড়তো। রাজ্য-রাজত্ব সব নষ্ট হয়ে যেত। তখন উভয় অবস্থার পার্থক্য বুঝে আসতো। এমনিভাবে যদি কিছু বস্তুর অস্তিত্ব তাঁর মাধ্যমে হতো আর কিছু বস্তুর অস্তিত্ব হতো অন্যের মাধ্যমে তাহলেও এ পার্থক্য বুঝা যেত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার প্রমাণ সব বস্তুর মাঝে একইরকম এবং তাঁর অস্তিত্ব সর্বাবস্থায় চিরস্থায়ী। এর বিপরীত হওয়া অসম্ভব। মোটকথা, আল্লাহর

এ অধিক স্পষ্টতাই তাঁর গোপনীয়তার কারণ হয়ে গেছে। আর এ কারণেই বিবেকবুদ্ধি তাঁকে যথাযথভাবে বুঝতে ত্রুটি করে থাকে।

সুতরাং যে ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও প্রবল, সে এ বিষয়ে পরিমিত অবস্থায় থাকবে। সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে দেখে না। তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে চিনে না। সে বিশ্বাস করে, আল্লাহ ছাড়া অস্তিত্বে আর কিছুই নেই। অন্যের যাবতীয় কর্মকাণ্ড তাঁরই কুদরতের প্রভাব এবং তাঁরই অনুগত। প্রকৃত অস্তিত্ব শুধু তাঁরই রয়েছে। যে ব্যক্তির অবস্থা এমন হবে, সে সব কাজে প্রকৃত কর্তার খোঁজ করবে। তার খেয়াল কাজের ওপর থাকে না যে, এটা আসমান, এটা জমিন, এটা জন্তু, এটা গাছ ইত্যাদি; বরং সে ভাবে, এ সকল বস্তু এক সত্তারই সৃষ্টি। তার চিন্তাভাবনা শুধু তাঁকে নিয়ে থাকে। অন্য দিকে যায় না। বিষয়টি এমন যে, কোনো ব্যক্তি কারো কবিতা বা লেখা দেখল, এটা স্বাভাবিক বিষয় যে, সেখানে সে কবি বা লেখকের প্রভাব ও চমক দেখবে। অন্য কিছু দেখবে না। সুতরাং তার ধ্যান লেখক বা কবির প্রতি থাকবে অন্য কিছুর প্রতি থাকবে না।

এ পৃথিবী আল্লাহ তাআলার এক রচনা। যে ব্যক্তি পৃথিবীকে এদিক থেকে দেখে যে, এটা আল্লাহর কর্ম এবং এরই ভিত্তিতে সে তাঁকে চেনে ও ভালোবাসে তাহলে তার দৃষ্টি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো দিকে হবে না। সে অন্য কাউকে চিনবে না এবং ভালোবাসবে না। সে-ই হবে প্রকৃত একত্মবাদী। তার চিন্তাভাবনায় আল্লাহ ছাড়া আর কেউ থাকবে না। এমনকি নিজেকে নিয়ে ভাবলেও সে এ চিন্তা করে যে, আমি আল্লাহর বান্দা। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা যায় যে, এ ব্যক্তি তাওহীদে মিশে গেছে এবং নিজেকে ভুলে গেছে। এ বিষয়টি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ভালোভাবে জানেন। কিন্তু ওই সকল ব্যক্তি বুঝতে অক্ষম, যাদের বুঝশক্তি কম এবং উপলব্ধি ক্ষমতা দুর্বল অথবা তারা আলেমদের ত্রুটি সাব্যস্ত করে যে, তারা এ বিষয়টি সাধারণ মানুষদের জন্য উপযোগী করে ব্যাখ্যা করতে পারেন না অথবা তারা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত কিংবা তারা মনে করেন, এ বিষয়টি সাধারণ মানুষের জন্য উপকারী নয়।

মোটকথা, মানুষের অক্ষমতা অথবা আলেমদের উদাসীনতা, কারণ যা-ই হোক, সাধারণত লোকেরা আল্লাহর মারেফাত থেকে অক্ষম থেকে যায়।

মানুষ শৈশবেই যখন তার তেমন কোনো জ্ঞানবুদ্ধি থাকে না, তখনই সে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান আয়ত্ত করে নেয়। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন তার জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধি পায় ও অনুভূতি শক্তি সৃষ্টি হয় তখন সে প্রবৃত্তিতে লিপ্ত হয়ে যায় এবং অনুভবযোগ্য বস্তু দেখতে দেখতে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। ফলে অন্তরে নতুন কোনো বিষয়ের মারেফাত লাভের আগ্রহ থাকে না। একারণেই কোনো ব্যক্তির যখন হঠাৎ আশ্চর্যজনক কোনো প্রাণী, গাছ অথবা আল্লাহর কোনো আশ্চর্যজনক সৃষ্টি চোখে পড়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই তার জবান থেকে বের হয়ে যায় 'সুবহানাল্লাহ'। অথচ রাত-দিন সে নিজেকে ও নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে দেখে; কিন্তু তার সুবহানাল্লাহ বলার তাওফিক হয় না।

মোটকথা, এসবকিছুই আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু এগুলোর সাথে মানুষের সম্পর্ক বেশি থাকায় তাদের সাক্ষ্য তারা অনুভব করতে পারে না।

সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি জন্মগতভাবে অন্ধ থাকে এবং হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায় আর প্রথমবার সে আসমান-জমিন, বৃক্ষলতা, পশু ইত্যাদি দেখে তাহলে তার ব্যাপারে এ আশঙ্কা রয়েছে যে, সে মানসিক বিভ্রাটগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে এবং সৃষ্টিকর্তার এ অকাট্য সাক্ষ্যের ব্যাপারে এতটাই বিস্ময়াভিভূত হয়ে যেতে পারে যে, সে তার বিস্ময়ই প্রকাশ করতে পারবে না।

উল্লিখিত কারণ ব্যতীত আরও এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা মানুষকে মারেফাতের নূর দ্বারা আলোকিত হওয়া এবং তার সমুদ্রে সন্তরণ করার পথ বন্ধ করে দেয়। আর সে সকল বিষয় হচ্ছে প্রবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়া।

যে ব্যক্তি মারেফাত অন্বেষণ করে তার অবস্থা আশ্চর্যজনক। তার উদাহরণ ওই ব্যক্তির মতো, যে নিজের গাধার উপর বসে গাধা খুঁজে পেরেশান হচ্ছে। মূলত যখন সুস্পষ্ট বিষয় উদ্দিষ্ট হয়ে যায় তখন বিষয়টি কঠিন হয়ে যায়।

কবি যথার্থই বলেছেন,

لَقَدْ ظَهَرْتَ فَمَا تَخْفٰى عَلٰى أَحَدٍ - إِلَّا عَلٰى اَكْمَهٍ لَا يَعْرِفُ الْقَمَرَا.

لٰكِنْ بَطَنْتَ بِمَا أَظْهَرْتَ مُحْتَجِبًا - فَكَيْفَ يُعْرَفُ مَنْ بِالْعُرْفِ قَدْ سُتِرَا.

তুমি প্রকাশিত, কারও কাছে গোপন নও। তবে যে ব্যক্তি জন্মান্ধ, চাঁদও দেখে না, তার কথা ভিন্ন। কিন্তু তুমি পর্দার আড়ালে রয়েছ। আর তাঁকে কীভাবে চেনা যাবে, যার পরিচয়ই আবৃত।

আল্লাহর প্রতি অনুরাগের স্বরূপ

মহব্বতের বাস্তবতা যারা মানে না, নিঃসন্দেহে অনুরাগের স্বরূপকেও তারা মেনে নেয় না। কারণ, মাহবুবের প্রতিই অনুরাগ হয়ে থাকে। এখনই আমরা প্রমাণ করব, যে আল্লাহকে মহব্বত করে, অবশ্যই তার আল্লাহর প্রতি অনুরাগ থাকে এবং সে অনুরাগে বাধ্য।

আমরা পূর্বে মহব্বত প্রমাণ করার জন্য যেসকল যুক্তি পেশ করেছি, সেগুলোই আগ্রহ- অনুরাগ প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট।

অর্থাৎ, মাহবুব যখন দৃষ্টির অন্তরালে থাকে, তখন তার প্রতি অনুরাগী হওয়া অনিবার্য। এর ব্যাখ্যা এই যে, যে বস্তু একদিক দিয়ে উপলব্ধ এবং অন্য দিক দিয়ে উপলব্ধ নয়, তার প্রতি অনুরাগী হওয়া অসম্ভব। এমনিভাবে যে বস্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে উপলব্ধ হয়ে যায়, তার প্রতিও অনুরাগ থাকে না। চূড়ান্ত উপলব্ধি প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। উদাহরণত এক ব্যক্তি অন্য একব্যক্তিকে কখনো দেখেনি এবং কখনো তার প্রশংসা শোনেনি। এমতাবস্থায় এই অদেখা ও অজানা ব্যক্তির প্রতি তার অনুরাগী হওয়ার কথা কল্পনাই করা যায় না। আর যে ব্যক্তি তার মাহবুবকে সর্বক্ষণ প্রত্যক্ষ করে, সে-ও মাহবুবের প্রতি অনুরাগী হবে না; বরং যে মাহবুব একদিক দিয়ে উপলব্ধ এবং অন্যদিক দিয়ে উপলব্ধ নয়, তার প্রতিই অনুরাগী হয়ে থাকে। যেমন, এক ব্যক্তির মাহবুব তার কাছেই নেই; কিন্তু তার কল্পনা তার অন্তরে বিদ্যমান। এমতাবস্থায় এই কল্পনাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য সে মাহবুবকে দেখতে আগ্রহী হবে। কেননা, অনুরাগের অর্থ হচ্ছে অন্তরস্থিত কল্পনাকে পূর্ণতা দানের প্রয়াস পাওয়া। এমনিভাবে যে ব্যক্তি মাহবুবকে অন্ধকারে দেখে, ফলে তার মুখমণ্ডল উত্তমরূপে দৃষ্টিতে পড়ে না, সে-ও এই অপূর্ণ দীদারকে পূর্ণ করতে আগ্রহী হয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি মাহবুবের মুখমণ্ডল দেখে, কিন্তু তার কেশ ও অন্যান্য সৌন্দর্য দেখে না, সে-ও এগুলো দেখার জন্য আগ্রহী হয়।

আগ্রহ-অনুরাগের উল্লিখিত ধরনগুলো আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; বরং প্রত্যেক মহব্বতকারী সাধকের জন্য এগুলো অপরিহার্য। কারণ, আল্লাহওয়ালাদের সামনে আল্লাহ তাআলার যে সমস্ত বিষয় কঠিনতর হয়েছে, সেগুলো যেন হালকা পর্দার অন্তরাল থেকে দেখার মতোই এবং

তাতে চূড়ান্ত পর্যায়ের স্পষ্টতা নেই; বরং তা কল্পনায় মিশে যায়। কেননা, কল্পনা এ পৃথিবীতে সব মালুমাতের জন্য উদাহরণ ও সামঞ্জস্য থেকে পৃথক হতে পারে না। আরেফের নিকট এ ধরনের কল্পনা খারাপ মনে হয়। এমনিভাবে পার্থিব কর্মকাণ্ডও এ কল্পনার সাথে সংযোজিত হয়ে যায়। পরিপূর্ণ স্পষ্টতা পরিপূর্ণ মুশাহাদা ও তাজাল্লীর মাধ্যমে হবে। যা আখেরাতের পূর্বে সম্ভব নয়। আর আরেফের লক্ষ্য হলো মুশাহাদা ও তাজাল্লী। এ কারণে তার অন্তরে অনুরাগ সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। এটা হচ্ছে অনুরাগের প্রথম প্রকার।

অনুরাগের দ্বিতীয় প্রকার : আল্লাহর বিষয়াদি অসংখ্য। যার সবগুলো বান্দার সামনে স্পষ্ট হয় না; বরং কিছু স্পষ্ট হয় আর কিছু অস্পষ্টতার কারণে প্রকাশ পায় না। আরেফ ব্যক্তির এসকল বিষয়ের অস্তিত্বের ইলম অর্জন হয়ে থাকে। সে এটাও জানে যে, আল্লাহর এ সকল বিষয়ের ইলম রয়েছে। তাছাড়া যে সকল বিষয় তার জানা নেই তা তার জানা বিষয়াদি থেকেও অনেক বেশি। একারণে সে ওই সকল অজানা বিষয় জানার প্রতি আগ্রহী হয়।

প্রথম অনুরাগ আখেরাতে পূর্ণ হবে। যাকে রুইয়াত, লেকা ও মুশাহাদা বলা হয়। দুনিয়াতে এ অনুরাগ পূর্ণ হওয়া অসম্ভব।

হযরত ইবরাহিম ইবনে আদহাম (র) অনুরাগীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি একদিন আরজ করলাম, হে প্রভু! যদি আপনি আপনার কোনো প্রিয় বান্দাকে এমন বিষয় দান করেন, যা তার অন্তরে প্রশান্তি এনে দেয় তাহলে আমাকেও দান করুন। কারণ, আমার অন্তর অস্থির হয়ে আছে। তিনি বলেন, এরপর আমি স্বপ্নে দেখলাম, আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন এবং বলছেন, হে ইবরাহিম! আমার সাক্ষাতের পূর্বে আমার কাছে তোমার অন্তর প্রশান্তিকারী বস্তু চাইতে লজ্জা হলো না? কোনো আশেক কি তার মাহবুবকে দেখার পূর্বে প্রশান্তি লাভ করতে পারে? তখন ইবরাহিম (র) বললেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার মহব্বতে এ পরিমাণ বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছি যে, আমি বুঝতে পারছি না, আমার কী বলা উচিত। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে শিখিয়ে দিন আমি কী বলব। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, তুমি বলো,

اَللّٰهُمَّ رَضِّنِيْ بِقَضَائِكَ وَصَبِّرْنِيْ عَلٰى بَلَائِكَ وَاَوْزِعْنِيْ شُكْرَ نِعَمَائِكَ.

হে আল্লাহ! আমাকে আপনার ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট রাখুন। বিপদে সবর দান করুন এবং আপনার নেয়ামতের শোকর আদায়ের তাওফিক দান করুন। (কূতুল কুলূব : ২ : ৬১)

এ প্রকার অনুরাগ আখেরাতে কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে অনুরাগের দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে বুঝে আসে যে, তা দুনিয়াতে পূর্ণ হবে না এবং আখেরাতেও না। কারণ এ অনুরাগের পূর্ণতা হলো আখেরাতে বান্দার সামনে আল্লাহর সৌন্দর্য, বড়ত্ব, গুণাবলি, হেকমত ও ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পৃক্ত সব বিষয় প্রকাশ পাওয়া, যা সম্পর্কে আল্লাহ জ্ঞাত। কিন্তু এটা অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, আল্লাহর মালুমাত (জ্ঞাত বিষয়) অগণিত। বান্দা সব সময় এটাই জানবে যে, আল্লাহর সৌন্দর্য ও বড়ত্বের এমন অনেক বিষয় বাকি রয়ে গেছে, যা তার সামনে প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং তার অনুরাগ কখনো পূর্ণ হবে না। বিশেষ করে ওই ব্যক্তি, যে নিজের স্তরের চেয়েও বড় স্তর আছে বলে মনে করে। সে অবশ্যই ওই স্তরের প্রত্যাশী হবে। আর এ আগ্রহা অনুরাগ আসল মিলনের পর ওই মিলনের পূর্ণতার জন্য হবে। একারণে এ আগ্রহে আনন্দ লাভ করে। কোনো কষ্ট থাকবে না। এটাও হতে পারে যে, আল্লাহর কাশফ ও নজরের অনুগ্রহ ধারাবাহিকভাবে চলমান থাকবে এবং অধিক পরিমাণে নেয়ামত ও আনন্দ লাভ হতে থাকবে। আর এ আনন্দে ডুবে গিয়ে মানুষ ওই সকল বিষয়ের আগ্রহ থেকে উদাসীন থাকবে যা তার অর্জন হয়নি। আর এ বিষয়টি দুনিয়াতে যে সকল বিষয়ে কাশফ অর্জন হয়নি সেক্ষেত্রে তা সম্ভব। অন্যথায় নেয়ামতের এ আনন্দ কোনো এক পর্যায়ে গিয়ে থেমে যাবে। আর বৃদ্ধি পাবে না। কিন্তু তা স্থায়ী হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا.

তাদের আলো তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন। (সূরা তাহরীম : ৮)

আলোচ্য আয়াতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমটি হলো, ওই নূর পূর্ণতা লাভ করবে, যা দুনিয়াতে সাথে ছিল। দ্বিতীয়ত এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নূরের পূর্ণতা লাভ, যা দুনিয়াতে আলোকজ্জ্বল হয়নি। নিম্নোক্ত আয়াতে প্রথম অর্থ প্রমাণিত হয়। আল্লাহ বলেছেন,

أُنْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا.

তোমরা আমাদের জন্য একটু থামো, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে, তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান করো। (সূরা হাদীদ : ১৩)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে নূর দুনিয়া থেকে সাথে করে আসবে আর আখেরাতে এর আলো বৃদ্ধি পাবে। কোনো নতুন নূর প্রদান করা হবে না।

এটি স্পর্শকাতর বিষয়। এক্ষেত্রে আস্থা ছাড়া কেবল অনুমানের ভিত্তিতে কিছু বলা বিপজ্জনক হতে পারে। আর এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত আমরা এমন কিছু পাইনি যার ওপর পূর্ণ ভরসা করা যায়। আমরা আল্লাহর কাছে হেদায়াত ও ইলম বৃদ্ধি কামনা করি।

আল্লাহ তাআলার প্রতি শওক তথা আগ্রহ অনুরাগের প্রমাণ বহু হাদিস ও মনীষীদের বাণী থেকে পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে রাসূলে কারীম (স)-এর একটি দুআর উল্লেখ করা যায়–

أَسْأَلُكَ اَللّٰهُمَّ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَمَاتِ، وَلَذَّةَ نَظَرٍ إِلٰى وَجْهِكَ، وَشَوْقًا إِلٰى لِقَائِكَ.

অর্থাৎ, ইলাহী! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনার আদেশের পর সম্মতি, মৃত্যুর পর সুখময় জীবন, আপনার প্রিয় চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাতের আনন্দ এবং আপনার সাক্ষাতের প্রতি অনুরাগি। (মুসনাদে আহমদ : ২১৬৬৬)

কা'ব আহবার (রা)-কে আবু দারদা (রা) বললেন, তাওরাতের কোনো একটি আয়াত আমাকে শোনাও তো। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার সাক্ষাতের জন্য সৎলোকেরা খুব আগ্রহ দেখায়, আর আমি

তাদের সাক্ষাতের জন্য আরও অধিক আগ্রহী। তিনি আরও বললেন, তাওরাতে এই আয়াতের কাছাকাছি আরও বর্ণিত আছে, যে লোক আমাকে তালাশ করবে, সে আমাকে পাবে। আর যে আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে খুঁজে বেড়াবে, সে আমাকে পাবে না। আবু দারদা (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ (স)-কেও আমি এরকম বলতে শুনেছি।

আরও বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা দাউদ (আ)-কে বললেন, হে দাউদ! জগদ্বাসীদের জানিয়ে দাও, আমাকে যে মহব্বত করবে, আমি তার হাবীব। যে আমার পাশে বসবে, আমি তার সঙ্গী। যে আমার যিকির দিয়ে মহব্বত হাসিল করবে, আমি তার প্রিয়জন। যে আমাকে গ্রহণ করবে, আমি তাকে গ্রহণ করব। যে আমার কথা মানবে, আমি তার কথা রাখব। যে আমাকে মহব্বত করে, তার মহব্বত আমার খুব জানা হয়ে যায়। ফলে আমি তাকে নিজের জন্য গ্রহণ করে নিই। তাকে এমন মহব্বত করি, আমার সৃষ্টির কেউ তার ওপর অগ্রণী থাকে না। যে সত্যি সত্যি আমাকে খোঁজে, সে আমাকে পায়। আর যে অন্যকে খোঁজে, সে আমাকে পায় না।

হে দুনিয়ার অধিবাসীরা! এখন তোমরা দুনিয়ার মাধ্যমে প্রতারিত হচ্ছো। একে বর্জন করো এবং আমার মর্তবা ও সান্নিধ্যের দিকে অগ্রসর হও। আমার সাথে বন্ধুত্ব করো, আমি তোমাদের সাথে বন্ধুত্ব করব। কারণ, আমি আমার বন্ধুদের স্বভাব-প্রকৃতি আমার বন্ধু ইবরাহীম খলীলুল্লাহ, মূসা কালীমুল্লাহ এবং মুহাম্মদ সফীউল্লাহ থেকে প্রস্তুত করেছি। আমার প্রতি অনুরাগীদের অন্তর আমি নিজের নূর দিয়ে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের লালন করেছি আমার প্রতাপ দিয়ে। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৯ : ৬০৫)

এক মনীষী বলেছেন, আল্লাহ তাআলা জনৈক সিদ্দীককে ইলহাম করেন যে, আমার কিছু বিশিষ্ট বান্দা আমার প্রতি মহব্বত রাখে, আমিও তাদের প্রতি মহব্বত রাখি। আমার প্রতি তারা অনুরাগী, আমিও তাদের প্রতি অনুরাগী। আমাকে তারা স্মরণ করে, আমিও তাদেরকে স্মরণ করি। তারা আমার দিকে লক্ষ করে, আমিও তাদের প্রতি লক্ষ করি। তুমিও যদি তাদের পথ অনুসরণ করো, আমি তোমাকেও মহব্বত করব। আর যদি তাদের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তোমার প্রতি আমি ক্ষুব্ধ হব।

সিদ্দীক ব্যক্তি আরয করলেন, হে আল্লাহ! আপনার এই বান্দাদের পরিচয় কী? ইরশাদ হলো, তারা দিনের বেলায় ছায়ার প্রতি এমন আগ্রহী থাকে, যেমন– রাখাল তার বকরির প্রতি আগ্রহী থাকে। তারা সূর্যাস্তের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে; যেমন পশুপাখি সন্ধ্যায় তাদের বাসায় ফিরে যেতে আগ্রহী হয়। এরপর যখন রাত এসে অন্ধকার গভীর হয়ে যায়, বিছানা পাতা হয়, রহস্য উন্মোচিত হয় এবং বন্ধু বন্ধুর সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন তারা আমার উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়, কপাল বিছায়, আমার কালামের মাধ্যমে আমার কাছে দুআ করে এবং আমার নিয়ামতের ওপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাদের কেউ চিৎকার করে, কেউ করে রোনাজারি আবার কেউ ফেলে দীর্ঘশ্বাস। তাদের কেউ অনুরাগী হয়ে দাঁড়ায়, কেউ বসে, কেউ রুকু করে, কেউ সিজদা করে। আমার উদ্দেশ্যে তারা যা যা সহ্য করে এবং আমার কাছে অভিযোগ করে, আমি তা সমস্তই গ্রহণ করি। আমি তাদের প্রথমে তিনটি বস্তু প্রদান করব।

১. তাদের অন্তরে আমার নূর ঢেলে দেব। ফলে তারা আমার অবস্থা বর্ণনা করবে; যেমন আমি সংবাদ দেই তাদের অবস্থা সম্পর্কে।
২. আসমান, জমিন ও এদুয়ের মাঝে যা কিছু আছে, যদি সবই তাদের মুকাবিলা করে, তবে আমি তাদের খাতিরে এগুলো অল্প মনে করব এবং
৩. আমি আমার পবিত্র চেহারা তাদের দিকে ফিরিয়ে দেব। তুমি তো জানো, যার দিকে আমি মুখ করি, কত কিছু তাকে দান করি। (কূতুল কুলূব : ২ : ৬০)

দাউদ (আ)-এর আরও কাহিনি বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে তাঁকে বললেন, হে দাউদ! জান্নাতকে নিয়ে কত আর ভাববে। তবে কি আমার নিকট আসার প্রতি অনুরাগের আবেদন করবে না? দাউদ (আ) আরয করলেন, ইয়া রাব্বি! আপনার প্রতি অনুরাগী কারা? ইরশাদ হলো, তারা আমার অনুরাগী, যাদের আমি যাবতীয় মলিনতা থেকে পবিত্র করে দিয়েছি এবং ভয় সম্পর্কে অবহিত করেছি। আমার দিকে তাদের অন্তরে একটি ছিদ্র করে দিয়েছি। তারা আমাকে সেই ছিদ্র দিয়েই দেখে। তাদের অন্তরকে হাতে নিয়ে আমি আকাশের ওপর রেখে দেই। এরপর আমি শ্রেষ্ঠ ফেরেশতাদের ডাকি। তারা একত্র হয়ে আমাকে সিজদা করে। তাদেরকে তখন আমি বলি, আমি তোমাদেরকে সিজদার জন্য ডাকিনি;

বরং আমি তোমাদের আমার প্রতি অনুরাগীদের পবিত্র অন্তর দেখাতে চাই এবং তাদের নিয়ে গর্ব করতে চাই। আকাশের ফেরেশতাদেরকে তাদের অন্তর এমন নূর দান করে, যেমন পৃথিবীবাসীকে সূর্য আলো দান করে। হে দাউদ! আমি অনুরাগীদের অন্তর আপন "রেযা" দিয়ে তৈরি করেছি। নিজের নূর দিয়ে তাদের লালন করেছি। তাদের শরীরকে পৃথিবীতে আমার লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করেছি। তারা আমাকে দেখে অন্তরের পথ দিয়ে। ফলে উত্তরোত্তর তাদের অনুরাগ বাড়ে।

দাউদ (আ) আরয করলেন, হে আল্লাহ! আপনার আশিকদের সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিন। আদেশ হলো, লেবাননের (বৈরুতের) পাহাড়ে চলে যাও। সেখানে চৌদ্দজন লোকের দেখা পাবে। তাদের মধ্যে যুবক, বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় সকল শ্রেণির লোক রয়েছে। তাদের নিকট পৌঁছে আমার সালাম দিয়ে বলবে তোমাদের প্রভু সালাম জানিয়ে তোমাদের জিজ্ঞেস করছেন– আমার নিকট তোমরা নিজেদের প্রয়োজন ব্যক্ত করো না কেন? তোমরা তো আমার বন্ধু ও অলী। আমি তোমাদের সুখে সুখী হই এবং তোমাদের মহব্বতের দিকে অগ্রগামী হই।

দাউদ (আ) নির্দেশ অনুযায়ী লেবাননের পাহাড়ে গিয়ে একটি ঝরনার নিকট তাদেরকে আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য নিয়ে চিন্তায় রত দেখলেন। তারা হযরত দাউদকে দেখেই চলে যেতে চাইলেন। দাউদ (আ) বললেন, ভাইসব! আমি আল্লাহর রাসূল। তাঁরই একটি পয়গাম নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছি। এরপর তারা তাঁর দিকে মুখ করে মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগলেন। দাউদ (আ) বলতে লাগলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের এই পয়গাম দিচ্ছেন, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ প্রয়োজন তাঁর নিকট ব্যক্ত করবে, তাঁকে ডাকবে, যাতে তিনি তোমাদের কণ্ঠস্বর শোনেন। তোমরা তাঁর বন্ধু। তোমাদের আনন্দে তিনি আনন্দিত হন। স্নেহময়ী মা যেমন তার সন্তানদের দেখাশোনা করে, তেমনি তিনি প্রতি মুহূর্তে তোমাদের দেখাশোনা করেন।

একথা শুনে তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝড়লো। তাদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মতো দুআ করতে থাকলো। বৃদ্ধলোকটি তার দুআয় বলল, হে রব! আমরা আপনার বান্দা এবং বান্দার ছেলে-মেয়ে। আমরা অতীত জীবনে যে পরিমাণ আপনাকে স্মরণ করিনি, আমাদের সে পরিমাণ মাফ করুন।

দ্বিতীয়জন বলল, হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র। আমরা আপনার দাসানুদাস। আপনার মধ্যে ও আমাদের মধ্যে যে ব্যাপার রয়েছে তাতে কৃপাদৃষ্টি দান করুন।

তৃতীয়জন বলল, আপনি পবিত্র। আমরা কি আপনার নিকট দুআ করার দুঃসাহস করব? আপনি জানেন, আমাদের নিজেদের কোনো প্রয়োজন নেই। তবে সর্বদা আপনার পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান করুন। আমাদের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করুন।

চতুর্থজন বলল, হে আল্লাহ! আপনার সন্তুষ্টি অন্বেষণে আমরা ত্রুটি করেছি। নিজ অনুগ্রহে আপনি এ কাজে আমাদের সাহায্য করুন।

পঞ্চম ব্যক্তি বলল, আল্লাহ! আপনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন বীর্য থেকে এবং আপনার মাহাত্ম্য সম্পর্কে কল্পনা করার গৌরব দান করেছেন। সুতরাং যে লোক আপনার মাহাত্ম্যে ব্যস্ত, সে কি আপনার সাথে কথা বলার দুঃসাহস দেখাতে পারে? আমাদের আপনি আপন নূরের নিকটবর্তী করুন– এটাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল।

ষষ্ঠজন বলল, হে আল্লাহ! আপনি মহান। আপনি আপনার অলীদের নিকটে থাকেন। মহব্বতকারীদের ইহসান করেন। তাই আমরা আপনার নিকট দুআ করার সাহস পাই না।

সপ্তমজন বলল, আল্লাহ! আপনি আমাদের অন্তরকে যিকিরের পথ প্রদর্শন করেছেন এবং আপনার প্রতি মশগুল হওয়ার ধ্যান দান করেছেন। এই নেয়ামতের শোকরে আমাদের তরফ থেকে যে ত্রুটি হয়েছে, তা মাফ করুন।

অষ্টমজন বলল, আল্লাহ! আমাদের প্রয়োজন তো আপনি জানেন। সেটা হচ্ছে শুধু আপনার দিকে দেখা।

নবমজন বলল, হে আল্লাহ! দাস তার প্রভুর সামনে ধৃষ্টতা দেখাতে পারে না। যেহেতু আমাদের আপন কৃপায় দুআ করার আদেশ করেছেন, তাই আরয করছি– আমাদের সেই নূর দান করুন, যা দিয়ে আসমানের অন্ধকার স্তরসমূহে পথ পাওয়া যায়।

দশমজন বলল, হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট আপনাকেই চাই।

এগারোতম লোকটি বলল, হে আল্লাহ! যে নেয়ামত আপনি আমাদের দান করেছেন, আমরা তা পূর্ণ করার আবেদন করি।

দ্বাদশব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আপনার সৃষ্টির মধ্য থেকে আমাদের কোনো বস্তুর দরকার নেই। শুধু কৃপাদৃষ্টি করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।

ত্রয়োদশ লোকটি বলল, হে আল্লাহ! আমার আবেদন এই যে, দুনিয়াকে দেখার ব্যাপারে আমার চক্ষুকে অন্ধ করুন এবং আখেরাতে মগ্ন হওয়ার ব্যাপারে আমার অন্তরকে অন্ধ করুন।

চতুর্দশন ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি জানি, আপনি অলীদের ভালোবাসেন। অতএব, আমাদের প্রতি এটুকু অনুগ্রহ করুন যে, আমাদের অন্তর সকল কিছু থেকে ফিরিয়ে শুধু আপনার প্রতি মগ্ন করে দিন।

আল্লাহ তাআলা দাউদ (আ)-এর নিকট ওহি প্রেরণ করলেন, তাদের বলে দাও, আমি তোমাদের সকল আলোচনা শুনেছি। তোমরা যা যা আশা করেছ, আমি সবই কবুল করলাম। তোমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও এবং ভূগর্ভে গর্ত করে ঘর তৈরি করে নাও। আমি তোমাদের ও আমার মধ্যবর্তী পর্দা সরিয়ে দিতে চাই, যাতে তোমরা আমার নূর ও প্রতাপ দর্শন করো। দাউদ (আ) বললেন, হে আল্লাহ! এরা এই স্তরে কেমন করে উন্নীত হলো? ইরশাদ হলো– তারা আমার প্রতি সুধারণা পোষণ করে এবং দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীকে বর্জন করে আমার সাথে একাকী থাকে এবং মুনাজাত করে।

এ মর্যাদা শুধু ওই ব্যক্তিই হাসিল করতে পারে, যে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীকে ত্যাগ করে। দুনিয়ার কোনো বস্তুর কথা স্মরণ করে না। নিজের অন্তরকে আমার জন্য মুক্ত রাখে। সকল সৃষ্টিজীবের ওপর আমাকে প্রাধান্য দেয়। যে ব্যক্তি এমন করে আমি তার প্রতি দয়া করি। তার অন্তরকে আমার জন্য উন্মুক্ত করে দেই। আমার ও তার মাঝের পর্দা সরিয়ে দেই। এমনকি সে আমাকে এমনভাবে দেখতে পায়, যেমন সে চোখে দেখে। আমি তাকে সর্বদা আমার কারামত দেখাতে থাকি। আমার চেহারার নূরের নিকটবর্তী করি। অসুস্থ হলে স্নেহশীল মায়ের মতো যত্ন করি, শুশ্রূষা দান করি। পিপাসার্ত হলে তৃষ্ণা নিবারণ করি। হে দাউদ! যখন আমি তার সাথে এমন ব্যবহার করি তখন তার অন্তরকে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী থেকে দৃষ্টিহীন করে দেই। দুনিয়াকে তার কাছে মোহনীয় করি না। সে সবসময় আমার যিকির ও চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। কখনো উদাসীন হয় না। তাকে মৃত্যু দেওয়া আমি অপছন্দ করি। কারণ, সৃষ্টিজীবের মধ্যে কেবল সে-ই আমার

দেখার বস্তু। সে আমাকে ছাড়া কিছু দেখে না। আমিও তাকে ছাড়া কিছু দেখি না। হে দাউদ! তার হৃদয় বিগলিত হয়েছে। শরীর দুর্বল হয়ে গেছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গও ভেঙে গেছে। সে যখন আমার যিকির শোনে তখন তার হৃদয় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমি তাকে নিয়ে ফেরেশতা ও আসমানবাসীদের মাঝে গর্ব করি। তখন তার ভয় ও ইবাদত আরও বৃদ্ধি পায়। হে দাউদ! আমার ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম! অবশ্যই আমি তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দিব এবং তার বক্ষ আমার দীদারের মাধ্যমে শীতল করব। ফলে সে সন্তুষ্ট হবে; বরং সে এরও আগে বেড়ে যাবে।

দাউদ (আ)-এর বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, দাউদ! আমার ওই বান্দাদের বলে দাও, যারা আমার মহব্বতে ডুবে আছে, যদি আমি আমার সৃষ্টিজীবের দৃষ্টির আড়ালে থাকি এবং তোমাদের ও আমার মাঝের পর্দা উঠিয়ে নেই তাহলে এতে করে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। তোমরা আমাকে অন্তরের চক্ষু দিয়ে দেখবে। এমনিভাবে আমি যদি তোমাদের থেকে দুনিয়াকে দূরে সরিয়ে দেই এবং আমার দীনকে প্রশস্ত করে দেই তাতেও তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই।

দুনিয়াবাসীর অসন্তুষ্টি তোমাদের কী ক্ষতি করতে পারে যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি তালাশ করো?

আরও বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাঁর কাছে ওহি প্রেরণ করে বলেন, হে দাউদ! যদি তুমি প্রকৃতপক্ষে আমাকে ভালোবাসো তাহলে অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বত দূর করো। কারণ, আমার মহব্বত ও দুনিয়ার মহব্বত এক অন্তরে একত্র হতে পারে না। দাউদ! আমার প্রিয় বান্দাদের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করো আর দুনিয়াবাসীর সাথে স্বাভাবিক আচরণ করো। দীনের ক্ষেত্রে আমার অনুকরণ করো। মানুষের অনুকরণ করো না। যদি এক্ষেত্রে কোনো বিষয় আমার মহব্বতের অনুকূল হয় তাহলে ভালোভাবে তাকে আঁকড়ে ধরো আর যা কঠিন মনে হয় তা আমার নিকট অর্পন করো। আমি তোমাকে নেতৃত্ব ও সঠিক পথে থাকার প্রতি অগ্রসর করব। আমি তোমার পরিচালক ও পথপ্রদর্শক হব। চাওয়া ছাড়াই তোমাকে দিব। বিপদে সাহায্য করব। আমি নিজের ওপর নিজে কসম করছি যে, আমি শুধু ওই বান্দাকেই সওয়াব দিব, যার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা আমার সামনে অক্ষমতা ছাড়া আর কিছু নয় এবং যে আমার মুখাপেক্ষী হয়। তুমি যদি

এমন হয়ে যাও তাহলে আমি তোমার থেকে অপমান ও বিষণ্নতা দূর করে দিব। তোমার অন্তরে প্রাচুর্য দান করব। আমি আরও কসম করছি যে, যে বান্দা নিজের নফসের ওপর আস্থাশীল এবং নিজের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করে, আমি তাকে তার নফসের কাছে সোপর্দ করে দিব। তুমি সবকিছু আমার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করো। তাহলে তোমার আমল এর বিপরীত হবে না। অন্যথায় তুমি গুনাহগার হবে এবং তোমার মাধ্যমে তোমার সঙ্গীদের কোনো উপকার হবে না এবং তুমি আমার মারেফাতের কোনো সীমাও খুঁজে পাবে না। কারণ, আমার মারেফাতের কোনো সীমা নেই।

যখন তুমি আমার কাছে বেশি চাইবে তখন আমি তোমাকে বেশি দিব। কারণ, আমার বেশি প্রদানেরও কোনো সীমা নেই। অতঃপর বনি ইসরাঈলকে বলে দাও, আমার ও বান্দার মাঝে কোনো আত্মীয়তা নেই। এ কারণে আমার প্রতি তাদের আগ্রহ ও ইচ্ছা বেশি হওয়া উচিত। আমি তাদেরকে এমন বস্তু প্রদান করব, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, কোনো মানুষের কল্পনায়ও আসেনি। আমাকে তোমার চোখের সামনে রাখো। অন্তর্চক্ষু দিয়ে আমাকে দেখো এবং চর্মচক্ষু দ্বারা ওই ব্যক্তিদের প্রতি দেখো না, যাদের চক্ষু ও অন্তরে আমার পক্ষ থেকে পর্দা পড়ে গেছে। তাদের ব্যাপারে আমার সওয়াব থাকবে না। আমি আমার ইজ্জত ও মর্যাদার কসম করে বলছি, আমি এমন বান্দার জন্য সওয়াবের দরজা খুলব না, যে আমার আনুগত্যে আসে অভিজ্ঞতা অর্জন অথবা বিদ্রুপ করার জন্য। যে তোমাকে শিক্ষা দেয় তার প্রতি বিনয়ী হও। মুরিদদের প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। যারা আমাকে ভালোবাসে, তারা যদি আমার নিকট মুরিদদের মর্তবা সম্পর্কে অবগত হতো তাহলে মুরিদদের জন্য তারা জমিন হয়ে যেত আর মুরিদরা তাতে পা রেখে হাঁটতো।

দাউদ! আমার কালাম আঁকড়ে ধরো। নিজের মধ্য থেকেই নিজের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করো। তার মধ্যে থেকে কোনো কিছু নষ্ট করো না, অন্যথায় আমি তোমাকে আমার মহব্বত থেকে দূরে সরিয়ে দিব। আমার বান্দাকে আমার রহমত থেকে নিরাশ করো না এবং আমার জন্য প্রবৃত্তি দমন করো। আমি তো প্রবৃত্তি বৈধ করেছি আমার দুর্বল বান্দাদের জন্য। আমার শক্তিশালী বান্দাদের কী হলো? তারা কেন প্রবৃত্তিতে পড়তে চায়? তাদের এমন কর্মে তো আমার মুনাজাতের আনন্দ নষ্ট হয়ে যায়। যদি তারা এমন করে তাহলে

তাদের জন্য আমার সর্বনিম্ন শাস্তি হলো, প্রবৃত্তিতে পতিত হওয়ার সময় তাদের আকলে পর্দা পড়ে যায়। কারণ, আমি আমার প্রিয় বান্দার জন্য দুনিয়া পছন্দ করি না; বরং তাদেরকে দুনিয়ার পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র রাখি।

দাউদ! তুমি আমার ও তোমার মাঝে এমন আলেমকে ওসিলা বানিয়ো না, যে তার উদাসীনতার কারণে তোমাকে আমার মহব্বত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এমন ব্যক্তি আমার মুরিদ বান্দাদের জন্য ডাকাতের চেয়ে কম নয়। দাউদ! প্রবৃত্তি দমনের জন্য তুমি অব্যাহত রোযার সাহায্য গ্রহণ করো এবং ইফতার থেকে বিরত থাকো। কারণ, অব্যাহত রোযাদারকে আমি পছন্দ করি।

দাউদ! তুমি নিজের নফসের বিরোধিতা করে আমার প্রিয় হয়ে যাও। আর নফসকে প্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখো, তাহলে আমি তোমার দিকে তাকাব। আর তুমি দেখবে যে, আমার ও তোমার মাঝে যে পর্দা ছিল তা উঠে গেছে। আমি তোমার সাথে কোমল আচরণ করি, যাতে তুমি তাকওয়া অর্জনে সক্ষম হও। কারণ, আমি তোমাকে সওয়াব দিয়ে ইহসান করতে চাই। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার আনুগত্যে স্থির থাকবে, আমি তোমাকে সওয়াব দিতে থাকব।

আল্লাহ তাআলা ওহি পাঠালেন, হে দাউদ! যারা আমার আনুগত্য থেকে বিমুখ থাকে তারা যদি জানত যে, আমি তাদের জন্য কী পরিমাণ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় আছি, তাদের সাথে কত নরম আচরণ করব এবং আমার কী পরিমাণ ইচ্ছা যে, তারা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে তাহলে তারা আমার প্রতি আগ্রহের আতিশয্যে মারাই যেত এবং আমার মহব্বতে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একটি অপরটি থেকে পৃথক হয়ে যেত।

দাউদ! যারা আমার থেকে বিমূখ তাদের ব্যাপারে আমার ইচ্ছা এমন তাহলে যারা আমার অভিমুখী তাদের ব্যাপারে আমার ইচ্ছা কেমন হবে?

দাউদ! বান্দা যখন আমার থেকে অমুখাপেক্ষী হয় তখন সে দয়া ও করুণার অধিক মুখাপেক্ষী হয়। আর যখন সে আমার থেকে বিমুখ হয় তখন আমার তার প্রতি খুব দয়া হয়। আর সে যখন আমার কাছে ফিরে আসে তখন তা আমার কাছে অনেক বড় বিষয় মনে হয়। (তাহযীবুল আসরার : ১০৮) এ ধরনের বিভিন্ন বর্ণনা ও অসংখ্য হাদিস মহব্বত ও আগ্রহ-অনুরাগের প্রমাণ বহন করে।

বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা

কুরআন মাজীদের অনেক আয়াত থেকে প্রমাণিত, আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি ভালোবাসা রাখেন। সুতরাং মহব্বতের অর্থ জানা জরুরি। আমরা এর আগে সেসব আয়াত ও হাদিস পেশ করেছি, যেগুলোর দ্বারা এই ভালোবাসা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন–

يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ.

যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। (সূরা মায়েদা : ৫৪)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا.

যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। (সূরা সফ : ৪)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও ভালোবাসেন। (সূরা বাকারা : ২২২)

বান্দাকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন– এ জন্যই আল্লাহর ভালোবাসার মিথ্যা দাবি যারা করেছিল, তাদের জবাবে ইরশাদ করেন,

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ.

"আপনি বলুন, তবে পাপের কারণে তিনি তোমাদের শাস্তি দেবেন কেন?" (সূরা মায়েদা : ১৮)

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

اِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ تَعَالٰى عَبْدًا لَا يَضُرُّهٗ ذَنْبٌ وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ.

অর্থাৎ, আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন পাপ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। গুনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি নিষ্পাপ লোকের ন্যায়। (মুসনাদে ফিরদাউস : ২৪৩২)

এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন,

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন। (সূরা বাকারা : ২২২)

এ হাদিসের মর্ম হলো, আল্লাহ তাআলা যে বান্দাকে ভালোবাসেন, মৃত্যুর আগেই তার তাওবা কবুল করে নেন। এরপর তার অতীত পাপ অনেক হলেও তা কোনো ক্ষতি করতে পারে না। যেমন, মুসলমান হওয়ার পর অতীত কুফর অনিষ্ট করে না।

মহব্বতের কারণে আল্লাহ তাআলা গুনাহ মার্জনা ও ভালোবাসার ঘোষণাও করেছেন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ .

বলুন, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। (সূরা আলে ইমরান : ৩১)

নবী কারিম (স) ইরশাদ করেন,

اِنَّ اللّٰهَ يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِى الْاِيْمَانَ اِلَّا مَنْ يُحِبُّ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যাকে ভালোবাসেন এবং যাকে ভালোবাসেন না, উভয়কেই দুনিয়া দেন। কিন্তু ঈমান শুধু তাকেই দেন, যাকে তিনি ভালোবাসেন। (মুসনাদে আহমদ : ১ : ৩৮৭)

তিনি আরও বলেন–

مَنْ يَتَوَاضَعُ لِلّٰهِ دَرَجَةً، يَرْفَعُهُ اللّٰهُ بِهٖ دَرَجَةً، وَمَنْ تَكَبَّرَ عَلَى اللّٰهِ دَرَجَةً، وَضَعَهُ اللّٰهُ بِهٖ دَرَجَةً وَمَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللّٰهِ أَحَبَّهُ اللّٰهُ.

অর্থাৎ, যে লোক আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় প্রদর্শন করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর যে অহংকার করে, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করেন। আর যে আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। (ইবনে মাজাহ : ৪১৭৬)

হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى أُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُبِهِ وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطَشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا وَاِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيْذَنَّهُ.

নফল ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা প্রতি মুহূর্তে আমার নৈকট্য হাসিল করতে থাকে। ফলে আমি তাকে মহব্বত করি। যখন মুহব্বত করি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনতে পায়। তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়। তার পা হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে চলতে পারে। সে আমার কাছে কিছু চাইলে আমি তাকে তা দান করি এবং আশ্রয় চাইলে অবশ্যই তাকে আশ্রয় দেই। (সহিহ বুখারী : ৬৫০২)

যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) বলেন, বান্দাকে আল্লাহ তাআলা এতোই ভালোবাসেন যে, এক পর্যায়ে তাঁকে বলেন, তোমার মন যা চায়, তাই করো। তোমাকে আমি মাফ করলাম। (সহিহ মুসলিম : ২৭৫৮)

আগেই বলা হয়েছে, আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসা আক্ষরিক অর্থেই ভালোবাসা; রূপক অর্থে নয়। কারণ, অভিধানে মহব্বতের অর্থ অনুকূল বস্তুর প্রতি মনের বাসনা। এ বাসনা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেলে তার নাম হয় ইশক। আমরা আরও বর্ণনা করেছি যে, অনুগ্রহ ও সৌন্দর্য উভয়টিই মনের অনুকূল। উভয়টি কখনো চর্মচক্ষু এবং কখনো অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে অনুভূত হয়। অনুগ্রহ ও সৌন্দর্যের উভয় প্রকার অনুভবে মহব্বত অপরিহার্য। চর্মচক্ষুতে অনুভূত হওয়াই জরুরি নয়।

কিন্তু বান্দার প্রতি আল্লাহর মহব্বত এভাবে সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, বরং আল্লাহর জন্য আরও যত শব্দ প্রয়োগ করা হয়, যেমন শোনা, জানা ইত্যাদি মানুষ ও আল্লাহ তাআলার জন্য একই অর্থে বলা যায় না। এমনকি অস্তিত্ব শব্দটি, যা অভিন্নতার দিক দিয়ে অত্যধিক ব্যাপক, সেটিও আল্লাহ ও মানুষের জন্য একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কারণ, আল্লাহ ছাড়া যতকিছু আছে, সবকিছুর অস্তিত্ব আল্লাহর অস্তিত্ব থেকে উদ্ভূত। এমতাবস্থায় অনুসারী ও অনুসৃতের অস্তিত্ব একরকম কীভাবে হতে পারে?

শব্দ রচয়িতারা মহব্বত, কুদরত, ইচ্ছা প্রভৃতি শব্দকে প্রথমে মানুষের জন্য রচনা করেছিল। কারণ, জ্ঞানবুদ্ধিতে মানুষই প্রথমে ছিল। এরপর আল্লাহ তআলার জন্য এসব শব্দের ব্যবহার রূপক অর্থে হয়েছে।

মহব্বত শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে অনুকূল বস্তুর প্রতি মনের বাসনা। এটা ওই অন্তর হতে পারে, যা অনুকূল জিনিস না পাওয়া গেলে অসম্পূর্ণ থাকে এবং পাওয়া গেলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এ অর্থে আল্লাহ তাআলার মহব্বত অসম্ভব। কারণ, পূর্ণতা, সৌন্দর্য, প্রতাপ ইত্যাদি সবই আল্লাহ তাআলার নিকট রয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। আর বাস্তবে তাঁর সত্তা ও কর্ম ছাড়া কোনো কিছুই বিদ্যমান নেই।

এ কারণেই শায়খ আবু সাঈদের সম্মুখে যখন يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ আয়াতটি পাঠ করা হলো, তিনি তখন বললেন, তিনি নিজেকেই ভালোবাসেন। অর্থাৎ, সবকিছু তিনিই। তিনি ছাড়া কোনো কিছু বর্তমান নেই।

সুতরাং বান্দার প্রতি আল্লাহর মহব্বতের অর্থ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার অন্তর থেকে পর্দা সরিয়ে দেওয়া। ফলে বান্দা তাঁকে অন্তর দিয়ে দেখতে অথবা তিনি বান্দাকে নৈকট্য লাভে উপযুক্ত করে দেন। যেমন এক হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এক পর্যায়ে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। (সহিহ বুখারী : ৬৫০২) এখানে নফল ইবাদতকে নৈকট্য লাভের মাধ্যম বলা হয়েছে। এসব কাজ অর্থাৎ, পর্দা খুলে দেওয়া অথবা নৈকট্য লাভে সক্ষম করা, সবই আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপায় হবে। বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার মহব্বতের অর্থ তা-ই।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে। যেমন বাদশাহ তার কোনো গোলামকে নিজ থেকে তার নিকটবর্তী করে। তাকে সব সময় নিজ সেবায় থাকতে বলে। এর কারণ হলো, বাদশাহ তার প্রতি আকৃষ্ট অথবা তাকে তার ক্ষমতা দ্বারা সাহায্য করতে চায় কিংবা তার পরামর্শ নিতে চায় অথবা তার জন্য উৎকৃষ্ট খাবারদাবারের ব্যবস্থা করতে চায়। এ কারণে বলা যায় যে, বাদশাহ তাকে মহব্বত করে। কেননা, এখানে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা তার উদ্দেশ্যের অনুকূলে।

কখনো কখনো কোনো গোলামকে বাদশাহর কাছে যেতে বাধা দেওয়া হয় না। এর কারণ এটা নয় যে, বাদশাহ তার মাধ্যমে কোনো ফায়দা হাসিল করবে অথবা তাকে সাহায্য করবে; বরং এর কারণ হলো, ওই গোলাম সত্তাগতভাবে সচ্চরিত্র ও উত্তম গুণের অধিকারী। যা তার দরবারের শোভা বাড়িয়ে দেয়। এমতাবস্থায় বাদশাহ যদি তার ও গোলামের মাঝে বিদ্যমান পর্দা সরিয়ে দেয় তাহলে বলা যায় যে, সে ওই গোলামকে মহব্বত করে। আর ওই গোলাম যদি উত্তম গুণাবলির মধ্যে শুধু ওই সকল গুণ অর্জন করে, যা বাদশাহর মহব্বত অর্জনে কার্যকর তাহলে বলা হবে যে, ওই গোলাম এ সকল গুণকে মাধ্যম বানিয়ে বাদশাহর মহব্বত লাভ করেছে।

আলোচ্য উদাহরণে দু ধরনের মহব্বত রয়েছে। বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বত দ্বিতীয় প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথম প্রকারের মহব্বত হয় না। তবে দ্বিতীয় প্রকার মহব্বতের জন্য শর্ত হলো, অন্তরে এ ধারণা না হওয়া যে, এ মহব্বতের মাধ্যমে আল্লাহর মধ্যে পরিবর্তন হতে পারে। কারণ, আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিবর্তন সম্ভব নয়। আর আল্লাহর প্রিয় বান্দা সে, যে তাঁর নৈকট্য লাভ করেছে। আর আল্লাহর কাছে বান্দার নৈকট্যের অর্থ হলো, বান্দা পশু, হিংস্র প্রাণী ও শয়তানী গুণাবলি থেকে দূরে থাকবে এবং সর্বোত্তম চরিত্র অর্থাৎ, আল্লাহ প্রদত্ত চরিত্র অর্জন করবে। সুতরাং এ নৈকট্য গুণের মাধ্যমে হয়, স্থানের মাধ্যমে নয়। গুণের নৈকট্যের উদাহরণ হলো, দুই ব্যক্তি কাছাকাছি হয় একে অপরের কাছে যাওয়ার মাধ্যমে। কখনো একজন গমন করে আর অন্যজন নিজ স্থানে বসে থাকে। এক্ষেত্রে গমনকারীর মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আর অপরজনের ক্ষেত্রে এমনটা পরিলক্ষিত হয় না। গুণাবলির মধ্যেও এমন নৈকট্য পাওয়া যায়। যেমন, ছাত্র তার শিক্ষকের ইলমের পূর্ণতা ও সৌন্দর্যের মর্যাদার মাধ্যমে নৈকট্য অর্জনের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে। শিক্ষক তার স্থানে স্থির থাকেন। নিজের স্থান থেকে ছাত্রের স্থানে নেমে আসেন না। ছাত্র তার স্তরে পৌঁছার জন্য এবং অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের হয়ে ইলমের আলোতে পৌঁছার জন্য অব্যাহতভাবে শিক্ষকের কাছে যাতায়াত করে থাকে। এভাবে এক পর্যায়ে সে শিক্ষকের স্তরের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। আল্লাহর সাথে বান্দার নৈকট্যের অবস্থাও এমন। সুতরাং যে

বান্দা গুণ, ইলম, মারেফাতে যে পরিমাণ পূর্ণতা লাভ করবে এবং শয়তানী শক্তি ও প্রবৃত্তি দমনে যে পরিমাণ শক্তিশালী হবে, সে সেই পরিমাণ পূর্ণতার স্তরের নৈকট্য লাভ করবে। পরিপূর্ণ পূর্ণতা একমাত্র আল্লাহর জন্য। প্রত্যেক বান্দা এ সকল বিষয়ে পূর্ণতা অর্জন পরিমাণে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে।

ছাত্র-শিক্ষক এবং আল্লাহ তাআলা ও বান্দার মাঝে পার্থক্য এই যে, ছাত্র অনেক সময় নিজের প্রচেষ্টায় শিক্ষকের সমপর্যায়ে অথবা এর চেয়েও আগে বেড়ে যায়; কিন্তু আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে এমনটা অসম্ভব। কেননা, আল্লাহর কামালিয়াত অসীম। আর বান্দা তার কামালিয়াতের স্তরে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতে পারে না। একারণে বান্দা আল্লাহ তাআলার কামালিয়াতের বরাবর হতে পারে না।

নৈকট্যের স্তরও বিভিন্ন ধরনের, যার কোনো শেষ নেই। কারণ, কামালিয়াতেরও কোনো সীমা নেই।

মোটকথা, বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বত হলো, তাকে পার্থিব ব্যস্ততা ও গুনাহ থেকে দূরে সরিয়ে তার অন্তরকে পার্থিব পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করে এবং অন্তর থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়ে নৈকট্য দান করা। এমনকি ওই বান্দার কাছে এক পর্যায়ে মনে হবে, সে অন্তর দিয়ে আল্লাহকে দেখছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর সাথে বান্দার মহব্বত হলো, সে যে কামালিয়াত থেকে বঞ্চিত তা অর্জনে আগ্রহী হওয়া। আর মানুষ যা থেকে বঞ্চিত থাকে তা অর্জনে আগ্রহী হওয়া স্বাভাবিক। যখন সে তা পেয়ে যায় তখন খুব আনন্দিত হয়। এ অর্থে আগ্রহ ও মহব্বত আল্লাহর জন্য অসম্ভব।

প্রশ্ন হয় যে, বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বত একটি সংশয়পূর্ণ বিষয়। বান্দা কীভাবে বুঝবে যে, সে আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি?

এর উত্তর হলো, মহব্বতের কিছু আলামত রয়েছে। এর মাধ্যমে বুঝে নেবে।

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন—

إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا اِبْتَلَاهُ فَإِذَا اَحَبَّهُ الْحُبَّ الْبَالِغَ اِقْتَنَاهُ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন তাকে (পরীক্ষার জন্য) বিপদগ্রস্ত করেন। যখন তাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে মহব্বত করেন, তাকে বিশুদ্ধ করে নেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-কে "বিশুদ্ধ করে নেন" কথার মর্ম জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, অর্থাৎ, তার নিকট ধন ও জন বলতে কিছুই রাখেন না। (আল কুনা ওয়াল আসমা : ১ : ৪৬)

এ থেকে জানা গেল, বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার পরিচয় হলো, আল্লাহ তাকে গায়রুল্লাহর প্রতি অসহ্যময় করে দেবেন এবং বান্দা ও গায়রুল্লাহর মধ্যে প্রাচীর সৃষ্টি করে দেবেন।

ঈসা (আ)-এর খিদমাতে কোনো এক লোক আরয করল, আপনি সওয়ারির জন্য একটি খচ্চর ক্রয় করেন না কেন? তিনি বললেন, আল্লাহর ইচ্ছা নয়, তিনি আমাকে নিজের সত্তা থেকে পৃথক করে খচ্চরের ব্যস্ততা দান করবেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা : ৩৫৩৭৬)

যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তাকে পরীক্ষায় ফেলেন। যদি বান্দা ধৈর্য ধরে তাহলে তাকে পছন্দ করেন আর যদি সে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে তাকে মনোনীত করেন। (মুসনাদুল ফেরদাউস : ৯৭১)

এক আলেম বলেন, যখন তুমি আল্লাহকে ভালোবাসবে আর আল্লাহ তোমাকে পরীক্ষায় ফেলে দেখবে, তাহলে জেনে রেখো, এর দ্বারা আল্লাহ তোমাকে আন্তরিক করতে চান। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫০)

এক মুরিদ তার মুরশিদকে বলল, আমার অন্তরে মহব্বত অনুভব করছি। মুরশিদ বললেন, আল্লাহ তাআলা কি তোমাকে এমন কোনো প্রিয় বস্তু দ্বারা পরীক্ষা করেছেন, যার ওপর তুমি আল্লাহকে প্রাধান্য দিয়েছ। মুরিদ বলল, না, এমনটি হয়নি। তখন মুরশিদ বললেন, তুমি তাহলে মহব্বতের আশা করো না। কারণ, আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা ব্যতীত কোনো বান্দাকে মহব্বত দান করেন না। (কূতুল কুলূব : ১ : ৫৩)

হাদিসে আছে,

إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِنْ نَفْسِهِ وَزَاجِرًا مِنْ قَلْبِهِ يَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ.

অর্থাৎ, আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তার জন্য তার নিজের মধ্য থেকে একজন হিদায়াতকারী এবং অন্তরের পক্ষ থেকে একজন সতর্ককারী নিযুক্ত করে দেন। সে তাকে সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধ করে।

নবী কারীম (স) বলেছেন,

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا بَصَّرَهُ عُيُوْبَهُ.

আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান তখন তাকে তার... দোষত্রুটি দেখিয়ে দেন। (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ১০০৫৩)

সুতরাং আল্লাহর মহব্বতের বিশেষ আলামত হলো, বান্দা আল্লাহকে ভালোবাসবে। কেননা, এটাই আল্লাহর ভালোবাসা প্রমাণ করে।

পক্ষান্তরে যে কর্ম বান্দার কাছে প্রিয় তা হলো আল্লাহ তাআলা তার সকল প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ বিষয়ের জিম্মাদার হবেন। তিনি তার নির্দেশক ও পরিচালক হবেন। তার চরিত্র সুন্দর করবেন। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমলে ব্যবহার করবেন। তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে ঠিক করবেন। তার সকল মনোযোগ এক দিকে করবেন। অন্তরে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু হতে দূরে রাখবেন। একান্তে মুনাজাতের প্রতি তাকে আগ্রহী করবেন। তার ও মারেফাতের মাঝে যে পর্দা রয়েছে তা উন্মোচন করবেন। এ ধরনের আলামতের মাধ্যমে বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বত প্রমাণিত।

আল্লাহর প্রতি বান্দার মহব্বতের আলামত

আল্লাহর সাথে মহব্বত দাবি করা অত্যন্ত সহজ। কিন্তু এর বাস্তবতা খুবই বিরল। অনেক সময় শয়তানের ধোঁকায়ও মন খোদায়ী মহব্বত দাবি করে। মহব্বতের লক্ষণ দ্বারা মনের পরীক্ষা না নেওয়া পর্যন্ত এ দাবিতে মুগ্ধ হয়ে যাওয়া উচিত নয়।

মহব্বত হচ্ছে একটি গাছ, যার শিকড় দুনিয়াতে এবং শাখাপ্রশাখা উপরের আসমানে বিস্তৃত। এর ফল অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায় এবং এর দ্বারা জানা যায় মহব্বতের অস্তিত্ব। যেমন, ধোঁয়া দেখলে অনুধাবন করা যায় আগুনের অস্তিত্ব। এ ধরনের লক্ষণ অনেক। তন্মধ্যে একটি হলো, আল্লাহ তাআলার সাক্ষাতকে কাশফ ও মুশাহাদার ভিত্তিতে প্রিয় মনে করবে। কারণ, মহব্বতের পর মাহবুবের সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করাই স্বাভাবিক। সবারই জানা যে, এই বাসনা দুনিয়া থেকে প্রস্থান ছাড়া পূর্ণ হবে না। তাই মৃত্যুকে মহব্বত করা ও তাকে অপ্রিয় মনে না করাও

জরুরি। কেননা, মাশুকের দেশে যাওয়ার জন্য এবং তার দীদার দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত হওয়ার জন্য ভ্রমণ করা আশিকের নিকট অপ্রিয় মনে হয় না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ.

অর্থাৎ, যে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহ তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। (সহিহ বুখারী : ৬৫০৭; সহিহ মুসলিম : ২৬৮৩)

এক আল্লাহর অলী বলেন, আল্লাহ তাআলার মহব্বতের পর বান্দার মধ্যে আল্লাহর প্রিয় যে স্বভাবটি প্রকাশ পায়, তা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে সিজদা। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫১)

আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করাকে আল্লাহ তাআলা প্রকৃত সত্য মহব্বত বলে ইরশাদ করেছেন। তাই মুসলমানরা যখন দাবি করল খোদায়ী মহব্বতের, তখন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন,

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا.

যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। (সূরা সফ : ৪)

আরও বলা হয়েছে– يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ.

তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। ফলে তারা হত্যা করে এবং নিহত হয়। (সূরা তাওবা : ১১১)

আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার উদগ্র বাসনাকে এখানে মহব্বতের লক্ষণ বলা হয়েছে।

উমর (রা)-কে আবু বকর (রা) অসিয়ত করে বলেন– সত্য কথা অসহ্য। এসত্ত্বেও তা প্রিয়। মিথ্যা হালকা হয়ে থাকে। তারপরও তা মন্দ। তুমি যদি আমার উপদেশ স্মরণ রাখো, তবে মৃত্যু অপেক্ষা অধিক কোনো অনুপস্থিত বস্তু তোমার নিকট প্রিয় হবে না, যার আগমন সুনিশ্চিত। আর যদি এ উপদেশ এড়িয়ে যাও, তাহলে কোনো অনুপস্থিত বস্তু তোমার নিকট মৃত্যুর চেয়ে অধিক মন্দ হবে না; অথচ তুমি একে ফেরাতে পারবে না। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫১)

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) তাঁর পুত্র ইসহাকের নিকট বর্ণনা করেন— উহুদ যুদ্ধে আমার কাছে এসে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা) বললেন, এসো, আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি। এরপর এক পাশে চলে গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা) দুআ করলেন, হে প্রভু! আমি আপনাকে কসম দিয়ে বলছি– আগামীকাল যুদ্ধে আমার মুকাবিলা যেন কোনো ভয়ংকর ক্রুদ্ধ বীরপুরুষের সঙ্গে হয়। আমি তার বিরুদ্ধে এবং সে আমার বিরুদ্ধে লড়বে। তারপর সে আমাকে ধরাশায়ী করে আমার নাক-কান কাটবে এবং আমার পেট ফেঁড়ে ফেলবে। কিয়ামতে যখন আমি আপনার সামনে দাঁড়াবো, আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, হে আবদুল্লাহ! তোমার নাক-কান কে কেটেছে? আমি বলব, প্রভু! আপনি এবং আপনার রাসূলের রাস্তায় আমার এই অবস্থা হয়েছে। সাদ (রা) বলেন, আমি যুদ্ধের শেষ সময়ে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের নাক ও কান সুতায় বাঁধা ঝুলন্তাবস্থায় দেখেছি। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিাব (রা) বলেন, আমি আশা করছি যে, আল্লাহ তাআলা আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের বাকি কসমও পূরন করবেন। (মুসতাদরাকে হাকেম : ২ : ৭৬)

সুফিয়ান সাওরী ও বিশরে হাফী (র) বলেন– সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিই মৃত্যুকে খারাপ মনে করে। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫১) কারণ, হাবীব কোনো অবস্থায় মাহবুবের সাক্ষাতকে খারাপ মনে করে না।

বুওয়ায়তী (র) জনৈক দরবেশকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মৃত্যুকে পছন্দ করো? দরবেশ নিরুত্তর রইলেন। তিনি বললেন– তুমি সত্যিকার দরবেশ হলে মৃত্যুকে পছন্দ করতে। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন–

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

তোমরা মৃত্যু কামনা করো— যদি সত্যবাদী হও।' (সূরা বাকারা : ৯৪)

দরবেশ বললেন, এক হাদিসে তো রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ.

তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। (সহিহ বুখারী : ৫৬৭১)

বুওয়ায়তী (র) বললেন, এই নিষেধাজ্ঞা তখন, যখন বান্দার ওপর কোনো মুসিবত নাযিল হয়। অর্থাৎ, মুসিবতের কারণে যেন কেউ মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় রাজি থাকা তাঁর হুকুম থেকে পলায়ন করার চেয়ে উত্তম।

যদি প্রশ্ন হয়, মৃত্যুকে মহব্বত না করে কেউ আল্লাহ তাআলাকে মহব্বত করতে পারে কি না? উত্তর হলো, মৃত্যুকে মহব্বত না করার কারণ হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত এবং স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের কাছ থেকে বিচ্ছেদের দুঃখ। এতে আল্লাহ তাআলার মহব্বতে ত্রুটি সৃষ্টি হয়। কিন্তু দুনিয়া ও স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের মহব্বতের পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার প্রতিও কিছু দুর্বল মহব্বত থাকা কঠিন নয়। মহব্বতে মহব্বতে তফাত থাকা তো একটা স্বীকৃত সত্য। এর প্রমাণ নিম্নোক্ত ঘটনা।

হুযাইফা ইবনে উতবা (রা) নিজের বোন ফাতেমাকে তারই আযাদকৃত দাস সালেমের সাথে বিবাহ দিয়ে দেন। এতে কুরাইশ বংশের লোকেরা জোর আপত্তি তুলতে লাগল, তুমি ক্রীতদাসের সাথে একজন কুরাইশি নারীর বিবাহ কী করে দিলে? হুযাইফা (রা) বললেন, সালেম ফাতেমার চেয়ে উত্তম। একথা জেনেই আমি বিয়ে দিয়েছি। কুরাইশদের নিকট এই জবাব বিয়ের চেয়েও অধিক দুঃসহ মনে হলো। তারা বলল, এটা কী করে হতে পারে? ফাতেমা তো তোমার বোন এবং সালেম তোমার আযাদকৃত ক্রীতদাস। হুযাইফা (রা) বললেন, আমি নবী কারীম (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এমন কাউকে দেখতে চায়, আল্লাহ তাআলাকে যে সর্বান্তকরণে মহব্বত করে, সে যেন সালেমকে দেখে নেয়। (ফাযাইলুস সাহাবা, আহমদ : ১২৮৭)

এই হাদিস থেকে জানা যায় যে, কিছু লোক আল্লাহকে সর্বান্তকরণে মহব্বত করে না; বরং তারা দুনিয়ার সাথেও মহব্বত রাখে। অতএব, তারা যখন আল্লাহ তাআলার কাছে যাবে, তখন দীদারের আনন্দ মহব্বত পরিমাণেই পাবে। পক্ষান্তরে তারা দুনিয়ার সাথে যে পরিমাণ মহব্বত রাখবে, দুনিয়া ত্যাগ করার সময় সে পরিমাণ বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ভোগ করবে।

মৃত্যুকে খারাপ মনে করার আরেক কারণ হলো, বান্দা মহব্বতের প্রাথমিক স্তরে থাকার কারণে তাড়াতাড়ি মৃত্যু আসাকে খারাপ মনে করে। অর্থাৎ,

আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পূর্বে মৃত্যুর আগমনকে খারাপ মনে করে। এতে মহব্বত কম হওয়ার অবস্থা বুঝায় না। বরং তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোনো আশেক তার মাশুকের আগমনবার্তা শুনে চায় যে, মাশুক কিছুদিন পরে আসুক, যাতে তার জন্য ঘরদোর পরিষ্কার করে সাজিয়ে নেওয়া যায় এবং গৃহস্থলীর কাজকর্ম গুছিয়ে নেওয়া যায়। ফলে মাশুক আসার পর স্বাচ্ছন্দে তার সাথে সাক্ষাৎ করা যাবে এবং কোনো অসুবিধা থাকবে না। সুতরাং এই জাতীয় কারণে মৃত্যুকে খারাপ মনে করা পূর্ণ মহব্বতের পরিপন্থি নয়। এর পরিচয় হচ্ছে আমলে পুরাপুরি যত্নবান হওয়া এবং চিন্তাকে আখেরাতের প্রস্তুতিতে ডুবিয়ে রাখা।

মহব্বতের আরও একটি আলামত হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় বস্তুকে নিজের প্রিয়বস্তুর ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া, এর জন্য কঠিনতর আমল বাস্তবায়িত করা এবং শৈথিল্য ও অলসতা পরিহার করে সার্বক্ষণিক ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য প্রত্যাশী হওয়া। এরূপ আত্মত্যাগীদের প্রশংসায় কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। আর তারা নিজে অভাবগ্রস্ত হলেও নিজেদের ওপর তাদের অগ্রাধিকার দেয়। (সূরা হাশর : ৯)

আর যে ব্যক্তি সব সময় নিজের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে, তার মাহবুব খেয়ালখুশিই হবে। আশেক তো তার মাশুকের ইচ্ছার অনুসরণ করে। তার ইচ্ছার সামনে নিজের ইচ্ছা বিসর্জন দেয়। বরং খোদায়ী এশক যখন প্রবল হয়, তখন মাশুক ছাড়া সবকিছুর মূলোৎপাটন করে ছাড়ে। যেমন বর্ণিত আছে, জুলায়খা যখন আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল এবং ইউসুফ (আ)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো, তখন তাকে ছেড়ে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হলো এবং তাঁরই হয়ে রইল। ইউসুফ (আ) তাকে দিনের বেলায় কাছে পেতে চাইলে জুলায়খা রাতের কথা বলে এড়িয়ে যেত

এবং রাতে দিনের ওয়াদা দিয়ে পাশ কাটিয়ে যেত। বলত– হে ইউসুফ! আমি আপনাকে তখন মহব্বত করতাম, যখন আল্লাহ তাআলাকে জানতাম না। এখন তাঁকে চিনেছি। এখন তাঁর মহব্বত আমার অন্তরে অন্য কারও মহব্বতের জন্য জায়গা রাখেনি। আমি এই মহব্বতের কোনো বিনিময়ও চাই না। ইউসুফ (আ) বললেন– কিন্তু আমার প্রতি আল্লাহ তাআলার আদেশ, তুমি জুলায়খার সাথে সহবাস করো। তার গর্ভ থেকে তোমার দুটি পুত্র সন্তান হবে। আমি তাদের উভয়কে নবী বানাবো। জুলায়খা বলল, যদি আল্লাহ তাআলা আপনাকে এই আদেশ দিয়ে থাকেন এবং আমাকে এই নেয়ামতের মাধ্যম করে থাকেন, তবে আমি তাঁর ইচ্ছা শিরোধার্য করে নেব এবং সহবাসে সম্মত হব। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫২)

সুতরাং যে আল্লাহকে ভালোবাসে, সে তাঁর নাফরমানি করতে পারে না। এ কারণে ইবনুল মুবারক (র) বলেছেন,

تَعْصِى الْإِلٰهَ وَاَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهٗ - هٰذَا لَعَمْرِىْ فِى الْفِعَالِ بَدِيْعُ.

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهٗ - إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيْعُ.

তুমি আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করো অথচ তাঁর নাফরমানি করো। আল্লাহর শপথ! তোমার এ কাজ খুবই অদ্ভুত। যদি তোমার মহব্বত সত্য হতো তাহলে তুমি তাঁর আনুগত্য করতে। কারণ, মানুষ তার প্রিয় ব্যক্তির অনুগত হয়ে থাকে।

এ অর্থে বলা হয়েছে,

وَأَتْرُكُ مَا اَهْوٰى لِمَا قَدْ هَوِيْتَهٗ - وَأَرْضٰى بِمَا تَرْضٰى وَإِنْ سَخِطَتْ نَفْسِىْ.

তোমার ইচ্ছার সামনে নিজের ইচ্ছাকে ত্যাগ করেছি এবং তোমার সন্তুষ্টিতে আমিও সন্তুষ্ট, যদিও আমার অন্তর এতে খুশি না থাকে। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫৪)

হযরত সাহল তস্তরি (র) বলেন, মহব্বতের আলামত হলো, আল্লাহ তাআলাকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেওয়া। আর আল্লাহর আনুগত্য করার মাধ্যমে সবাই আল্লাহর প্রিয় হয়ে যেতে পারে না; বরং আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি হলো যে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকে। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫৪)

তার এ কথাও সঠিক যে, আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার মহব্বত বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বতের কারণ হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ তিনি যাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। (সূরা মায়েদা : ৫৩)

আর আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে ভালোবাসেন তখন তার জিম্মাদার হয়ে যান। তাকে তার শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। আর তার শত্রু হচ্ছে তার নফস ও প্রবৃত্তি। সুতরাং যদি আল্লাহ তাকে তাঁর প্রিয় বানিয়ে নেন তাহলে তাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করেন না। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا.

আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে ভালোভাবেই জানেন। অভিভাবক হিসেবে তো আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা নিসা : ৪৫)

এখন জানা উচিত, নাফরমানী তথা আদেশ অমান্য করা মূল মহব্বতের পরিপন্থি নয়; বরং পূর্ণ মহব্বতের পরিপন্থি। যেমন, মানুষ নিজেকে মহব্বত করে। সে যখন রোগাক্রান্ত হয়, রোগমুক্তিকে মহব্বত করে। এ সত্ত্বেও সে এমন বস্তু খেয়ে ফেলে, যা তার জন্য ক্ষতিকর; অথচ সে জানে, তা খেয়ে তার রোগ বেড়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বলা হয় না যে, সে নিজেকে মহব্বত করে না। বরং বলা হয়, তার জ্ঞান কম এবং প্রবৃত্তি প্রবল। তাই মহব্বতের দাবির ওপর কায়েম থাকতে অক্ষম। নাফরমানি যে মূল মহব্বতের পরিপন্থি নয়, এর প্রমাণ নিম্নোক্ত ঘটনা। নোমান নামক জনৈক মুসলমান পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে বারবার তাকে ধরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে নিয়ে আসা হতো। একবার তাকে ধরে আনা হলে রাসূলুল্লাহ (স) তার ওপর শরিয়তের শাস্তি 'হদ' জারি করলেন। অতঃপর জনৈক সাহাবি তাকে লানত করলে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন— তাকে লানত করো না। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মহব্বত করে। (সহিহ বুখারী : ৬৭৮০)

এখানে তিনি গুনাহের কারণে নোমানকে মহব্বত থেকে বের করে দেননি। হ্যাঁ, গুনাহ মানুষকে পূর্ণ মহব্বত থেকে বের করে দেয়। জনৈক সাধক

বলেন– যখন মানুষের ঈমান অন্তরের বাহ্যিক অংশে থাকে, তখন সে আল্লাহ তাআলার সাথে মধ্যম পর্যায়ের মহব্বত রাখে। আর যখন ঈমান অন্তরের অন্তস্থলে চলে যায়, তখন পূর্ণ মহব্বত রাখে এবং গুনাহ পরিত্যাগ করে। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫১)

মহব্বতের দাবি করা বিপদমুক্ত নয়। ফুযায়ল (র) বলেন, আল্লাহর সাথে মহব্বত রাখো কি না, এ প্রশ্ন তোমাকে করা হলে তুমি চুপ থাকবে, উত্তর দিবে না। কেননা, যদি বলো 'না', তবে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি হ্যাঁ বলো, তবে তোমার গুণাবলি মাজনুনের মতো নয়। সুতরাং আল্লাহর গযবকে ভয় করো। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫২)

জনৈক আলেম বলেন– জান্নাতে মহব্বতকারীদের সুখ ও আনন্দের চেয়ে বড় কোনো সুখ ও আনন্দ নেই। আর দোযখেও সে ব্যক্তির আযাবের চেয়ে বড় কোনো আযাব নেই, যে মহব্বতের দাবি করে, অথচ মহব্বতের কোনো বিষয় তার মধ্যে নেই। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫২)

মহব্বতের আরেক আলামত হচ্ছে, যিকিরের প্রতি অত্যধিক উৎসাহী হওয়া এবং যিকির থেকে অন্তসারশূন্য না থাকা। কেননা, যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর সাথে মহব্বত রাখে, সে তার যিকির তথা স্মরণ অনেক বেশি করে এবং তার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহকেও অত্যধিক স্মরণ করে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার সাথে মহব্বতের লক্ষণ হবে তাঁর যিকিরকে মহব্বত করা, তাঁর কালাম অর্থাৎ, কুরআন মাজীদকে মহব্বত করা এবং তাঁর রাসূলকে মহব্বত করা। এমনিভাবে যে বস্তু আল্লাহর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, তাকেও মহব্বত করা। এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে মহব্বত করলে মাহবুবের গলির কুকুরকেও মহব্বত করতে থাকে। মহব্বত শক্তিশালী হয়ে গেলে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। একে মহব্বতে অংশীদারিত্ব মনে করা ভুল। কেননা, মাহবুব আল্লাহর রাসূলকে এজন্য মহব্বত করবে যে, তিনি তাঁর রাসূল। এটা হুবহু মাহবুবকেই মহব্বত করা; অপরকে নয়। যে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর মহব্বত প্রবল হয়ে যায়, সে সমগ্র সৃষ্টিকে মহব্বত করতে থাকে। কেননা, সমগ্র সৃষ্টি তো মাহবুবেরই সৃষ্টি। সুতরাং কুরআন মাজীদ, রাসূলুল্লাহ (স) এবং ওলামায়ে কেরামকে মহব্বত না করে উপায় আছে কি? তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ.

বলুন, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তা হলে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। (সূরা আলে ইমরান : ৩১)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

أَحِبُّوا اللّٰهَ لِمَا يَغْذُوْكُمْ مِنْ نِعَمِهٖ وَأَحِبُّونِىْ بِحُبِّ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে এজন্য মহব্বত করো যে, তিনি তোমাদের নেয়ামত দিয়ে লালনপালন করেন। আর আমাকে মহব্বত করো আল্লাহর জন্যে। (জামে তিরমিযি : ৩৭৮৯)

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর মহব্বতকারীকে মহব্বত করে, সে আল্লাহকে মহব্বত করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মানকারীকে সম্মান করে, সে আল্লাহকেই সম্মান করে। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৯ : ৬২২)

এক মুরিদ বলেন, আমি প্রবল অনুরাগের সময় মুনাজাতের স্বাদ পেয়েছি। আমি দিনরাত কুরআন তিলাওয়াতকে নিজের ব্যস্ততা বানিয়ে নিয়েছি। একবার কিছু সময় আমি কুরআন তিলাওয়াত করতে পারিনি। অতঃপর আমি স্বপ্ন দেখলাম, কেউ আমাকে বলছে, যদি তুমি আমাকে ভালোবাসার দাবি করে থাকো তাহলে আমার কুরআনের ওপর কেন জুলুম করো? তুমি কি তাতে বর্ণিত আমার সূক্ষ্ম নিন্দা সম্পর্কে দেখনি? মুরিদ বলেন, আমি ঘুম থেকে জেগে গেলাম। আমার অন্তর তখন কুরআনের মুহব্বতে সিক্ত ছিল। অতঃপর আমি নিজের অবস্থায় ফিরে এলাম। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫৩)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তোমাদের কেউ যেন কুরআন ছাড়া অন্য কিছুর আবেদন না করে। কেননা, যে কুরআনকে মহব্বত করে, সে আল্লাহ তাআলাকে মহব্বত করে। যদি কুরআনের সাথে মহব্বত না থাকে, তবে আল্লাহ তাআলার সাথে মহব্বত হবে না। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫৩)

সাহল তস্তরী (র) বলেন, খোদায়ী মহব্বতের পরিচয় হচ্ছে কুরআন মাজীদের মহব্বত। আল্লাহ তাআলা ও কুরআনের সাথে মহব্বতের পরিচয় হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে মহব্বত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে মহব্বতের পরিচয় হচ্ছে তাঁর সুন্নাহর সাথে মহব্বত। সুন্নাহর সাথে

মহব্বতের লক্ষণ হচ্ছে আখেরাতের মহব্বত। আখেরাত প্রিয় হওয়ার পরিচয় হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা। আর দুনিয়ার প্রতি ঘৃণার আলামত হচ্ছে, দুনিয়া থেকে আখেরাতের পাথেয় ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ না করা। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫৩)

মহব্বতের এক আলামত হচ্ছে, নির্জনবাস, মুনাজাত ও কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি অনুরাগী হওয়া এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়া। হাবীবের সাথে একান্তে বাস ও মুনাজাতের আনন্দকে সুখ মনে করা এই মহব্বতের সর্বনিম্ন স্তর। সুতরাং যে ব্যক্তির কাছে নিদ্রা ও পারস্পরিক গল্পগুজব মুনাজাতের তুলনায় উৎকৃষ্ট ও আনন্দদায়ক, তার মহব্বত কীভাবে হবে? ইবরাহিম ইবনে আদহাম (র) একবার পাহাড় থেকে অবতরণ করেন, তখন কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল– আপনি কোত্থেকে এলেন? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি অনুরাগ থেকে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৮ : ২০)

দাউদ (আ)-এর ঘটনাবলিতে আছে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে বললেন– আমার সৃষ্টির কারও প্রতি অনুরক্ত হয়ো না। কারণ, আমি দুপ্রকার লোককে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দেই। ১. যে আমার সওয়াবকে বিলম্বিত জেনে আলাদা হয়ে যায় এবং ২. যে আমাকে ভুলে গিয়ে নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়। এর পরিচয় এই যে, আমি তাকে তার নিজের হাতে সোপর্দ করি এবং দুনিয়াতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছেড়ে দেই। (কূতুল কুলূব : ৯ : ৬২৩)

মানুষ যদি গায়রুল্লাহর প্রতি অনুরক্ত হয়, তবে যে পরিমাণ অনুরাগ হবে, আল্লাহ থেকে সে পরিমাণ দূরে সরে যাবে এবং মহব্বত থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

বুরখের ঘটনায় রয়েছে। বুরখ ছিল একজন কাফ্রী গোলাম এবং আল্লাহ তাআলার প্রিয়পাত্র। মূসা (আ) তার ওসিলায় বৃষ্টির জন্য দুআ করেছিলেন। তার বৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-কে বললেন– বুরখ ভালো লোক। কিন্তু তার মধ্যে একটি দোষ আছে। মূসা (আ) আরয করলেন– ইলাহী! তার দোষ কী? ইরশাদ হলো– ভোরের মৃদুমন্দ বাতাস তার খুব পছন্দ। সে এর প্রতি অনুরক্ত। আর যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করে, সে কোনো বস্তুর প্রতি অনুরক্ত হয় না। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫৪)

বর্ণিত আছে, জনৈক আবেদ কোনো এক জঙ্গলে দীর্ঘদিন আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে। অতঃপর সে দেখে, একটি পাখি এক গাছের উপর বাসা তৈরি করে তাতে বসে কিচিরমিচির করছে। আবেদ মনে মনে বলল, এই গাছের নিচে ইবাদতের জায়গা করে নিলে পাখির ডাক শুনে মন বেশ প্রফুল্ল থাকবে। অতঃপর সে গাছের নিচে বসে ইবাদত শুরু করলে আল্লাহ তাআলা তৎকালীন নবীর প্রতি ওহি পাঠালেন– অমুক আবেদকে জানিয়ে দাও, সে আমার সৃষ্টির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। এর শাস্তিস্বরূপ আমি তার মর্যাদা হ্রাস করে দিলাম, যা আর কোনো আমল দ্বারা পূর্ণ হবে না। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫৪)

মোটকথা, মহব্বতের আলামত হলো, মানুষ মুনাজাতে তার মাহবুবের সাথে পরিপূর্ণ সান্নিধ্য লাভ করা। আর তার সাথে একান্তে পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ হওয়া। যে বস্তু এই একান্ত বৈঠককে প্রভাবিত করে এবং মুনাজাতের আনন্দ থেকে বাধা দান করে, তা থেকে দূরে থাকা। আর ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্বের আলামত হলো, বান্দার জ্ঞানবুদ্ধি মুনাজাতের আনন্দে এমনভাবে ডুবে যাওয়া, যেমনিভাবে আশেক তার মাশুকের সাথে কথোপকথনের সময় তাকে সম্বোধন করে থাকে।

অনেক বুযুর্গদের অবস্থা এমন ছিল যে, তারা এ আনন্দে এমনভাবে ডুবে থাকতেন যে, তারা নামাযে থাকতেন, এমতাবস্থায় তাদের ঘরে আগুন লেগে গেলে তারা তা উপলব্ধিও করতেন না। বর্ণিত আছে, এক বুযুর্গ পায়ের রোগে আক্রান্ত ছিলেন, যা কেটে ফেলার প্রয়োজন ছিল। ফলে নামাযরত অবস্থায় ওই পা কেটে ফেলা হলো, কিন্তু তিনি তা অনুভবও করতে পারেননি।[২]

মূলত যখন ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতা প্রবল হয়ে যায় তখন অন্তরঙ্গতা ও মুনাজাত চোখের শীতলতায় পরিণত হয় এবং এর মাধ্যমে সকল চিন্তা দূর হয়ে যায়, বরং মহব্বত ও বন্ধুত্ব এমনভাবে অন্তরে বদ্ধমূল হয় যে, মানুষ পার্থিব কোনো কিছু উপলব্ধি করতে পারে না। যতক্ষণ না সে বারবার ওই

---

২. আলোচ্য বুযুর্গ হলেন উরওয়া ইবনে যোবায়ের (রা)। তাঁর ঘটনা ইবনে আবিদ দুনইয়া আল মরয ওয়াল কাফফারাত (পৃ: ১৪১) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

বিষয়টি শুনতে পায়। যেমন কোনো আশেক সবার সাথে কথা বলে; কিন্তু তার অন্তরে মাহবুবের স্মরণ থাকে। সুতরাং প্রকৃত মহব্বতকারী সে, যে তার মাহবুব ব্যতীত প্রশান্তি লাভ করে না।

কুরআন মাজীদে আছে,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে; জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়; (সূরা রাদ : ২৮)

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন– এখানে প্রশান্তির অর্থ খুশি ও আন্তরিক অনুরাগ। (তাফসিরে তাবারী : ৮ : ১৮৩)

আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, যে ব্যক্তি নির্ভেজাল খোদায়ী মহব্বতের স্বাদ আস্বাদন করে, এ স্বাদ তাকে দুনিয়ার পেছনে ছোটাছুটি থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং সমস্ত মানুষের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে দেয়। (তাহযীবুল আসরার : ৯৫)

আল্লাহ তাআলা দাউদ (আ)-এর প্রতি ওহি প্রেরণ করলেন, যে ব্যক্তি আমার মহব্বত দাবি করে, অথচ রাতের বেলায় গাফেল হয়ে ঘুমিয়ে থাকে, সে মিথ্যুক। যে নিজের মাহবুবের সাক্ষাৎ পছন্দ করে না, সে কেমন মহব্বতকারী! রাতের বেলায় যারা আমাকে চায়, আমি তাদের জন্য বিদ্যমান থাকি। (তাহযীবুল আসরার : ৯৬)

মূসা (আ) বললেন, হে প্রভু! আপনি কোথায়? আমি আপনার কাছে আসতে চাই। আল্লাহ তাআলা বললেন, তুমি যখন আমার কাছে আসার ইচ্ছা করলে তখনই আমার কাছে পৌঁছে গেলে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৯ : ৩১১)

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায (র) বলেন, যে ব্যক্তি তিনটি বিষয়কে তিনটি বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দেয় না, সে আল্লাহর আশেক নয়– আল্লাহর কালামকে মানুষের কালামের ওপর, আল্লাহর সাক্ষাতকে মানুষের সাক্ষাতের ওপর এবং আল্লাহর ইবাদতকে জনসেবার ওপর।

মহব্বতের এক আলামত হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া যা কিছু হাতছাড়া হয়ে যায়, তার জন্য পরিতাপ না করা। কোনো মুহূর্ত আল্লাহর যিকির ছাড়া অতিবাহিত হয়ে গেলে সেজন্য অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করা এবং গাফেল হওয়ার সাথে সাথে তাওবা ও ইস্তেগফার করা কর্তব্য। জনৈক

বুযুর্গ বলেন, আল্লাহ তাআলার কিছুসংখ্যক বান্দা তাঁকে মহব্বত করার পর তাঁকে নিয়েই প্রশান্ত। বেহাত বস্তুর জন্য তারা কোনো দুঃখ করে না। নিজের নফসের আনন্দে ব্যস্ত হয় না। কারণ, তার মালিকের রাজত্ব বিস্তৃত ও পরিপূর্ণ। তিনি যা চান তা-ই হয়। তারা যা পাওয়ার তা পেয়ে যায় আর যা থেকে বঞ্চিত থাকে সে ক্ষেত্রে তার মালিক উত্তম ব্যবস্থা করে দেন।

মহব্বতকারীর কর্তব্য হলো, যখন সে নিজের উদাসীনতা থেকে ফিরে আসে তখন তার মাহবুবের অভিমুখী হয়। তাঁর নিন্দা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে এবং এ আবেদন করে যে, হে আল্লাহ! কোন গুনাহর কারণে আপনি আপনার ইহসান আমার থেকে বন্ধ করে দিয়েছেন। আমাকে আপনার দরবার থেকে বঞ্চিত করেছেন। আমাকে আমার নফস ও শয়তানের অনুসরণে লিপ্ত করেছেন?

এ পদ্ধতিতে আল্লাহর যিকিরের ফলে অন্তর স্বচ্ছ ও নরম হবে এবং বিগত উদাসীনতার কাফফারা হবে। কেমন যেন এ উদাসীনতা নতুনভাবে অন্তর স্বচ্ছকরণ ও কোমলতা সৃষ্টির কারণ হবে।

যখন মহব্বতকারী তার মাহবুব ব্যতীত অন্য কিছু দেখে না, শুধু তাকেই দেখে তখন তার কোনো কিছুর আপসোস থাকে না এবং কোনো বিষয়ে সন্দেহ থাকে না; বরং প্রত্যেক অবস্থাকে পূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে গ্রহণ করে এবং এ বিশ্বাস করে যে, মাহবুব তার জন্য যা কল্যাণকর তা-ই নির্ধারণ করেছেন। আর কুরআনের এ আয়াত স্মরণ করবে,

وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ .

হতে পারে তোমরা কিছু অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। (সূরা বাকারা : ২১৬)

মহব্বতের আরেক আলামত হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার ইবাদতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা এবং ইবাদতে কোনোরূপ কষ্ট অনুভব না করা। জনৈক বুযুর্গ বলেন, আমি বিশ বছর পর্যন্ত রাতের বেলায় কষ্ট সহ্য করেছি। এরপর এর মাধ্যমে বিশ বছর আনন্দ লাভ করেছি। (কূতুল কুলূব : ১ : ৩৬)

জুনাইদ (র) বলেন, মহব্বতের আলামত হলো সর্বদা প্রফুল্ল থাকা এবং এমন চেষ্টা করা, যাতে শরীর ক্লান্ত হয় এবং অন্তর ক্লান্ত না হয়। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫৫)

কেউ কেউ বলেন, আসলে মহব্বতে কোনো ক্লান্তি নেই। জনৈক আলেম বলেন, মহব্বতকারী অনেক উঁচু স্তরে পৌঁছে গেলেও ইবাদতে কখনো তৃপ্ত হয় না।

বাস্তবজগতেও এর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। আশেক তার মাশুকের মহব্বতে চেষ্টা করতে ত্রুটি করে না বরং তার খেদমত করাকে আন্তরিকভাবে ভালো মনে করে। শরীরের জন্য কষ্টকর হলেও সে এতেই আনন্দ পায়। শরীর অক্ষম হয়ে গেলে ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য সর্বোতভাবে চেষ্টা করে, যাতে আবার খেদমতে মশগুল হতে পারে।

আল্লাহ তাআলার মহব্বত প্রবল হয়ে গেলেও তেমনি ইবাদত ও খেদমতের চেয়ে উত্তম কোনো কিছু থাকে না। যে বস্তুর মহব্বত মানুষের মধ্যে প্রবল হয়, তা তার নিচের বস্তুকে নির্মূল করে দেয়।

উদাহরণত, কারও মহব্বত ধনসম্পদের মহব্বতের তুলনায় বেশি হলে তার জন্য ধনসম্পদ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হবে না।

জনৈক খোদাপ্রেমিক তার জানমাল সমস্তই উৎসর্গ করে দিয়েছিল। তাকে প্রশ্ন করা হলো, মহব্বতে তোমার এ অবস্থা কীরূপে হলো? সে উত্তর দিলো, আমি একদিন এক আশেককে নির্জনে তার মাশুকের সাথে একথা বলতে শুনেছিলাম, আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে সর্বান্তকরণে ভালোবাসি। কিন্তু তুমি কেন জানি মুখ ফিরিয়ে রাখো। মাশুক বলল, যদি তুমি আমাকে ভালোবাসো, তবে বলো, আমার জন্য কী ব্যয় করবে? আশেক বলল, প্রথমে আমি যেসব বস্তুর মালিক, সেগুলো সব তোমাকে দিয়ে দেব। এরপর তোমার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গ করব। তুমি সম্মত হয়ে যাও। এই কথাবার্তা শুনে আমি ভাবলাম, যদি মানুষ মানুষের জন্য এরূপ করতে পারে, তবে মাবুদের সাথে বান্দার কীরূপ করা উচিত? মহব্বতে আমার উন্নতির এ-ই কারণ। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫৫)

আল্লাহ তাআলার সকল বান্দার প্রতি করুণাশীল ও দয়ালু হওয়াও মহব্বতের একটি আলামত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.

কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে সহানুভূতিশীল। (সূরা ফাতহ : ২৯)

এ ব্যাপারে কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনায় প্রভাবিত না হওয়া এবং আল্লাহর জন্য ক্রুদ্ধ হওয়ার পথে কোনো বাধা না থাকা উচিত। এক হাদিসে কুদসীতে অলীদের এ গুণই উল্লেখ হয়েছে। বলা হয়েছে, তারাই আমার অলী, যারা আমার মহব্বতে পাগলপারা, যেমন শিশু কোনো বস্তুর জন্য পাগলপারা হয়ে থাকে। তারা আমার যিকিরের দিকে এমনভাবে ধাবিত হয়, যেমন পশু-পাখি তাদের বাসার দিকে ধাবিত হয়। তারা আমার নিষিদ্ধ কাজকর্ম দেখে ক্রোধে বাঘের মতো গর্জন করে; মানুষ কম না বেশি, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। (যুহদ, ইবনুল মুবারক : ২১৬)

এই দৃষ্টান্ত ভালোভাবে বোঝা প্রয়োজন। শিশুর মন কোনো বস্তুতে লেগে গেলে সে তা থেকে কখনো আলাদা হয় না। কেউ সেই বস্তু নিয়ে গেলে ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সে চিৎকার করতে থাকে। ঘুমিয়ে পড়ার সময়ও বস্তুটি কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ঘুমায়। জাগ্রত হলে আবার হাতে তুলে নেয়। বস্তুটি হারিয়ে গেলে কাঁদে এবং পেয়ে গেলে আনন্দে হাসতে থাকে। বাঘও ক্রোধের সময় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। ক্রোধের তীব্রতায় সে নিজেকেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

এগুলো হচ্ছে মহব্বতের আলামত। যার ভেতরে এসব বিষয় পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, তার মহব্বত পূর্ণাঙ্গ ও খাঁটি। আর যার মহব্বতে গায়রুল্লাহর মহব্বতের মিশ্রণ থাকবে, সে আখেরাতে মহব্বত পরিমাণই শান্তি পাবে।

অর্থাৎ, তাদের শরাবে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের শরাবের কিছু অংশ মিলিয়ে দেওয়া হবে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ.

নিশ্চয় পুণ্যবানগণ থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে; (সূরা ইনফিতার : ১৩)

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ. خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَ فِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ. وَ مِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ. عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ.

তাদেরকে মোহরকৃত বিশুদ্ধ পানীয় থেকে পান করানো হবে; তার মোহর হবে মিসকের, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের, তা একটি ঝরনা, যা থেকে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করবে। (সূরা মুতাফফিফিন : ২৫-২৮)

সৎকর্মশীলদের শরাব উত্তম হওয়ার কারণ হলো তাতে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ শরাব মিশ্রিত থাকবে। আর শরাব জান্নাতের সকল নেয়ামতের সমষ্টিকে বলে। যেমন কিতাব শব্দটি সমস্ত আমলকে অন্তর্ভুক্ত করে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ. অবশ্যই পুণ্যবানদের আমলনামা ইল্লিয়্যীনে রয়েছে। (সূরা মুতাফফিফিন : ১৮)

يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ. যারা আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত (অর্থাৎ, ফেরেশতা) তারা তা দেখে। (সূরা মুতাফফিফিন : ২১)

অর্থাৎ, তাদের আমলনামা এত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন হবে যে, ফেরেশতারা তা দেখাশুনা করবে।

যেমনিভাবে সৎকর্মশীলরা নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের নৈকট্য ও দেখাশুনার মাধ্যমে তাদের হাল ও মারেফাতে অতিরিক্ত পাবে। আখেরাতেও তাদের একই অবস্থা হবে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ.

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। (সূরা লুকমান : ২৮)

كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ. যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। (সূরা আম্বিয়া : ১০৪)

جَزَآءً وِّفَاقًا. উপযুক্ত প্রতিফল হিসেবে। (সূরা নাবা : ২৬)

অর্থাৎ, প্রতিদান আমলের অনুরূপ পাবে। সুতরাং খাঁটি আমলের বিনিময়ে খাঁটি শরাব পাবে। আর মিশ্রিত আমলের বিনিময়ে মিশ্রিত শরাব দান করা হবে। আর এ মিশ্রণ ওই পরিমাণ হবে, যে পরিমাণ আল্লাহর মহব্বত ও আমলে অন্যের মহব্বত মিশ্রিত থাকবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ.

সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে। (সূরা যিলযাল : ৭-৮)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَابِاَنْفُسِهِمْ.

জেনে রেখো, আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। (সূরা রাদ : ১১)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا.

আল্লাহ (কারও প্রতি) অণু পরিমাণও জুলুম করেন না। আর কোনো পুণ্য কাজ হলে, আল্লাহ তাকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করেন। (সূরা নিসা : ৪০)

وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۭ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ.

এবং আমল যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয়, তাও আমি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট। (সূরা আম্বিয়া : ৪৭)

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মহব্বত করে আর তার আশা থাকে যে, আখেরাতে জান্নাতের নেয়ামত ভোগ করবে, হুর ও জান্নাতী প্রাসাদ লাভ করবে, তাকে প্রত্যাশা অনুযায়ী জান্নাতে স্থান দেওয়া হবে। সে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবে। গিলমানের সাথে খেলাধুলা করবে এবং হুরদের সাথে আনন্দ করবে। আখেরাতে তার আনন্দ এ সকল বস্তু দ্বারাই হয়ে যাবে। কারণ, মহব্বতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষকে ওই বস্তুই দেওয়া হয়ে থাকে, যা সে প্রত্যাশা করে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য হলো আখেরাতের মালিক ও রাজত্বের মালিক আল্লাহ এবং তার মধ্যে খাঁটি ও সত্যিকার ভালোবাসা প্রবল হয়, তাকে এক বিশেষ আসনে স্থান দেওয়া হবে। যার ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ.

এক যোগ্য আসনে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর সান্নিধ্যে। (সূরা কামার : ৫৫)

উক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সৎকর্মশীলরা জান্নাতের বাগানসমূহে ঘুরে বেড়াবে। হুর-গিলমানের সাথে আনন্দ করবে। আর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ আল্লাহর দরবারে অবস্থান করবে। সেদিকেই তারা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে। এর সামান্য পরিমাণ আনন্দের তুলনায় জান্নাতের

সকল নেয়ামতকে তুচ্ছ মনে করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি উদর ও লজ্জাস্থানের প্রবৃত্তি পূরণে লিপ্ত থাকবে, সে ওই ব্যক্তি থেকে আলাদা যে আল্লাহর দরবারে বসে দীদার লাভ করে। আর একারণেই রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

اَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبَلْهُ وَعِلِّيُّوْنَ لِذَوِى الْأَلْبَابِ.

জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী হবে সাধারণ মানুষ আর উচ্চ মাকাম পাবে বুদ্ধিমানরা। (শরহে মুশকিলিল আম্মার : ৮ : ৪৩১)

ইল্লিয়্যিন এক উচ্চ মাকাম। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি এর তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম। একারণে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ.

আপনি কি জানেন ইল্লিয়্যীন কী? (সূরা মুতাফফিফিন : ১৯)

যেমন قَارِعَةُ (মহাপ্রলয়) সম্পর্কে বলেছেন,

اَلْقَارِعَةُ. مَا الْقَارِعَةُ. وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ.

মহাপ্রলয়, মহাপ্রলয় কী? মহাপ্রলয় সম্বন্ধে আপনি কী জানেন? (সূরা কারিআহ : ১-৩)

মহব্বতের আরেকটি আলামত হলো, আল্লাহর মহব্বতে অন্তর ভীত থাকা এবং তাঁর সম্মান ও ভক্তিতে শরীর শীর্ণ থাকা।

অনেকে মনে করে, ভয় ভালোবাসার বিরোধী। কিন্তু বিষয়টি এমন নয়; বরং কারও সম্মান সম্পর্কে জানা থাকলে তার প্রতি ভক্তি সৃষ্টি হয়। যেমন কারও সৌন্দর্য সম্পর্কে জানা থাকলে তার প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হয়। বিশেষ মহব্বতকারীর জন্য মহব্বতের ক্ষেত্রে এমন ভয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয় যা অন্য কারও ক্ষেত্রে হয় না। তাছাড়া তাদের কারও ভয় অন্যের চেয়ে তীব্র হয়ে থাকে।

প্রথম ভয় হচ্ছে আল্লাহ বিমুখতা। দ্বিতীয় ভয় হচ্ছে উভয়ের মাঝে পর্দার অন্তরায় সৃষ্টি হওয়া। আর সবচেয়ে বড় ভয় হলো আল্লাহ তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীতে এ দূরে সরিয়ে দেওয়াকেই বোঝানো হয়েছে। তিনি বলেছেন, সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে। (জামে তিরমিযি : ৩২৯৭)

এর দ্বারাও ভয় ও দূরবর্তীতা উদ্দেশ্য। কারণ সূরা হুদে বর্ণিত আছে, أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ শুনে রাখো! সামুদ সম্প্রদায় রহমত থেকে দূরে নিপতিত হলো। (সূরা হুদ : ৬৮)

أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. শুনে রাখো! মাদইয়ানবাসী রহমত থেকে দূরে সরে পড়লো যেমন দূরে সরে পড়েছিল সামুদ সম্প্রদায়। (সূরা হুদ : ৯৫)

দূরত্বের ভয় ওই ব্যক্তির অন্তরে বেশি হবে, যে নৈকট্যের সাথে মিশে গেছে এবং এর স্বাদ ও আনন্দ অনুভব করেছে। এ কারণে যখন দূরবর্তীদের জন্য দূরত্বের আলোচনা করা হয় তখন নৈকট্যশীলরাও ভয় পেয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি দূরত্বের সাথে মিশে যায়, সে নৈকট্যের প্রতি আগ্রহী হয় না এবং দূরত্বের ভয়ে কাঁদেও না। এ সকল ভয়ের পর কেয়ামতের দিন হিসাবের জন্য দাঁড়ানোর ভয় রয়েছে। এরপর রয়েছে মর্যাদা বৃদ্ধি না পাওয়ার ভয়। যেমন আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, নৈকট্যের স্তরের কোনো সীমা নেই। বান্দার উচিত সব সময় তার মর্যাদার স্তর বাড়ানোর চেষ্টা করা। এ দিকে লক্ষ করেই রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, যার দুটি দিন একই অবস্থায় অতিবাহিত হয়, সে প্রবঞ্চনায় রয়েছে। আর যার আজ গতকাল থেকে মন্দ হয়, সে অভিশপ্ত। (মুসনাদুল ফেরদাউস : ৫৯১০)

তিনি আরও বলেছেন,

إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِيْ، وَإِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

আমার অন্তর আচ্ছাদিত হয়ে যায়, তাই আমি দৈনিক একশবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। (সহিহ মুসলিম : ২৭০২)

রাসূলুল্লাহ (স) সুলুকের পথিক ছিলেন। সর্বদা তিনি এ পথে চলতেন। এ কারণে প্রত্যেক পদক্ষেপে তিনি ইসতিগফার করতেন। কেননা, প্রত্যেক পদক্ষেপ তার পরের পদক্ষেপের তুলনায় দূরবর্তী। সালেক ব্যক্তির জন্য সুলুকের পথে থেমে যাওয়া আযাব সমতুল্য। যেমন এক হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন কোনো আলেম আমার আনুগত্যের ওপর দুনিয়ার মহব্বত ও প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেয় তখন তার জন্য আমার সব চেয়ে ছোটো শাস্তি হলো, তার থেকে আমার মুনাজাতের আনন্দ ছিনিয়ে নেই। (কূতুল কুলূব : ১ : ১৪১)

মোটকথা, প্রবৃত্তির কারণে উচ্চ মর্যাদা ছিনিয়ে নেওয়া সাধারণ সালেকের জন্য শাস্তিতুল্য। এরপর এমন বস্তু হারানোর ভয়, যা নষ্ট হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার আর অর্জন হয় না। হযরত ইবরাহিম ইবনে আদহাম (র) এক সফরে পাহাড়ে অবস্থান করছিলেন। তখন এক ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তি পড়তে শুনলেন,

كُلُّ شَيْءٍ لَكَ مَغْفُوْرٌ - سِوَى الْإِعْرَاضِ عَنِّيْ.

قَدْ وَهَبْنَا لَكَ مَا فَاتَ - فَهَبْ لَنَا مَا فَاتَ مِنِّيْ.

আমাকে উপেক্ষা করা ছাড়া তোমার সব অপরাধ মাফ। তোমার যা হারিয়েছে তা তোমাকে দিলাম। এখন আমার যা হারিয়েছে তা আমাকে দাও। (কাশকুল : ১ : ১৫৪)

এ পঙ্‌ক্তি শোনার পর তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন তার জ্ঞান ফিরল না। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি পাহাড়ের দিক থেকে এক আওয়াজ শুনতে পেলেন। হে ইবরাহিম! তুমি বান্দা হয়ে যাও। অতঃপর তিনি বান্দা হয়ে গেলেন এবং অস্থিরতা থেকে শান্তি পেলেন। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫৮)

এর পরের ভয় হচ্ছে মাহবুব থেকে চিন্তামুক্ত হয়ে যাওয়া। কেননা, আশেক সর্বদা আগ্রহ ও অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে। অধিক কিছু পাওয়ার ক্ষেত্রে অলসতা করে না। সর্বদা নতুন অনুগ্রহ পাওয়ার আশায় থাকে। যদি সে এমন আগ্রহ থেকে থেমে যায় তাহলে সালেক এক স্থানে স্থির হয়ে যাবে। অথবা মুখ্য উদ্দেশ্যে পৌঁছেও ফিরে আসতে শুরু করবে।

এ বিস্মৃতি মানুষের মাঝে এমনভাবে প্রবেশ করে যে, সে বুঝতেও পারে না। এমনিভাবে মহব্বতও মানুষের অন্তরে খুব গোপনে প্রবেশ করে; মানুষ টেরও পায় না।

অন্তরের এ পরিবর্তনের কারণ আসমানী গোপন বিষয়। যা উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ যখন বান্দাকে তার প্রতারণার শাস্তি দিতে ও পাকড়াও করতে চান তখন তার অন্তরের নিশ্চিন্তাকে গোপন করে দেন। তখন সে আশায় ডুবে থাকে। সুধারণায় ধোঁকা খায় অথবা উদাসীনতা ও বিস্মৃতি তার ওপর প্রবল হয়ে যায়। এসবকিছুই শয়তানের সৈন্যবাহিনীর মতো, যা ফেরেশতার সৈন্যবাহিনী তথা ইলম, আকল, যিকির, বয়ান ইত্যাদির ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

যেমনিভাবে আল্লাহর গুণাবলি বিভিন্ন ধরনের। তেমনি এর প্রভাবও বিভিন্ন। যেমন দয়া, অনুগ্রহ ও হেকমত বান্দার মধ্যে মহব্বতের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। আর প্রভাব-প্রতিপত্তি, ইজ্জত ও অমুখাপেক্ষিতা বেপরোয়াভাব ও চিন্তাহীনতা সৃষ্টি করে। যা বঞ্চনা, দুর্ভাগ্য ও শাস্তির কারণ।

এরপর সালেক ব্যক্তির এ ভয় থাকে যে, আল্লাহর মহব্বত যেন অন্যের মহব্বতের মাধ্যমে পরিবর্তন না হয়ে যায়। এটা খুবই বিপদজনক স্থান। এর সূচনা হলো, মাহবুবের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত থাকা। আর এ বেপরোয়াভাব শুরু হয় উপেক্ষা ও পর্দার অন্তরায় সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমে। এরও পূর্বে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তা হলো, সৎকাজ ভালো না লাগা। অব্যাহত যিকির থেকে বিরত থাকা। দুআ-অযীফা থেকে দূরে থাকা। বান্দার মাঝে এসকল বিষয় প্রকাশ পাওয়ার অর্থ হলো, সে মহব্বতের স্থান থেকে গযবের স্থানে পৌঁছে গেছে। নাউযুবিল্লাহ। এসব বিষয়ে ভয় করা এবং তা থেকে বেঁচে থাকা সত্যিকার মহব্বতের আলামত। কেননা, যে ব্যক্তি কোনো বস্তুকে মহব্বত করে, তা হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে সে অস্থির থাকে। সুতরাং আশেকের জন্য ভয় মুক্ত থাকা অসম্ভব যখন তার মহব্বতের বস্তু হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এক আরেফ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে তাঁর ভয় ব্যতীত শুধু মহব্বতের কারণে, সে তার দাম্ভিকতার কারণে ধ্বংস হয়। আর যে আল্লাহর ইবাদত করে শুধু ভয়ের কারণে, মহব্বতের কারণে নয়, সে তাঁর থেকে দূরে সরে যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে মহব্বত ও ভয় উভয় কারণে, আল্লাহ তাকে মহব্বত করেন। নৈকট্য ও ইলম দান করেন। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫৯)

মোটকথা, আশেক ভয় থেকে মুক্ত নয় এবং ভয়কারী মহব্বত থেকে মুক্ত নয়। তবে যে ব্যক্তির ওপর মহব্বত এতটা প্রবল থাকে যে, এর ফলে তার বেশি ভয় অবশিষ্ট থাকে না। তাহলে বলা যায় যে, এ ব্যক্তি মহব্বতের স্থানে রয়েছে এবং তাকে মহব্বতকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ সামান্য পরিমাণ ভয় মহব্বতের নেশাকে আয়ত্তে রাখবে। মহব্বত ও মারেফাত অনেক বেড়ে গেলে তা মানুষের সক্ষমতার বাইরে চলে যায়। কেননা, ভয়ের মাধ্যমে পরিমিত অবস্থা সৃষ্টি হয়।

বর্ণিত আছে, এক আবদাল এক সিদ্দীককে তার জন্য দুআ করতে বলল, যেন আল্লাহ তাকে সামান্য পরিমাণ মারেফাত দান করেন, সিদ্দীক তার জন্য দুআ করলেন। দুআর পর ওই ব্যক্তি এতটাই অস্থির হয়ে ওঠলো যে, সে পাহাড়ে চলে গেল। বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলল। সাত দিন পর্যন্ত সে এক দিকেই স্থির তাকিয়ে রইল। তার এমন অবস্থা দেখে সিদ্দীক দুআ করলেন।' হে আল্লাহ! তার মারেফাত কিছুটা কমিয়ে দিন। তখন আল্লাহ ইলহাম পাঠালেন, আমি তাকে মারেফাতের একটি বিন্দুর এক লাখ অংশ থেকে একটি অংশ দান করেছিলাম। কারণ, তুমি যখন তার জন্য দুআ করেছিলে তখন এক লাখ বান্দা আমার কাছে একই দুআ করেছিল। আমি তাদের দুআ কবুল করতে বিলম্ব করছিলাম। কিন্তু তুমি যখন তার জন্য সুপারিশ করলে তখন আমি তোমার ও তাদের সবার দুআ কবুল করলাম এবং মারেফাতের সামান্য পরিমাণকে ভাগ করে এক লাখ বান্দার মাঝে বণ্টন করে দিলাম। আর ওই এক অংশের কারণেই এ বান্দার এমন অবস্থা হলো। সিদ্দীক বললেন, হে শাসকদের বড় শাসক! আপনি পূতপবিত্র। যা কিছু আপনি দিয়েছেন তা কমিয়ে দিন। তখন আল্লাহ তা থেকে কমিয়ে দিলেন, ফলে মারেফাতের ওই অংশের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকলো। তখন সে স্থির হলো। তার ভয়, মহব্বত ও আশা ভারসাম্যতা ফিরে পেল এবং সে আরেফদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (কূতুল কুলূব : ২ : ৬০)

আরেফদের সম্পর্কে বর্ণিত কবিতা,

قَرِيْبُ الْوَجْدِ ذُوْ مَرْمٰى بَعِيْدِ - عَنِ الْأَحْرارِ مِنْهُمْ وَالْعَبِيْدِ.

غَرِيْبُ الْوَصْفِ ذُوْ عِلْمٍ غَرِيْبٍ - كَأَنَّ فُؤَادَهٗ زُبَرُ الْحَدِيْدِ.

لَقَدْ عَزَّتْ مَعَانِيْهِ فَغَابَتْ - عَنِ الْأَنْصَارِ إِلَّا لِلشَّهِيْدِ.

يَرَى الْأَعْيَادَ فِيْ الْأَوْقَاتِ تَجْرِيْ - لَهٗ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفُ عِيْدِ.

وِلِلْأَحْبَابِ أَفْرَاحٌ بِعِيْدِ - وَلَا تَجِدُ السُّرُوْرَ لَهٗ بِعِيْدِ.

(আরেফ) ভাবতন্ময়তার কাছাকাছি। তার লক্ষ্য স্বাধীন-পরাধীন সবার চেয়ে ভিন্ন। তার গুণাবলি সবার থেকে স্বতন্ত্র। তার ইলম বিরল। তার

অন্তর লোহার চেয়েও মজবুত। তার উদ্দেশ্য সুউচ্চ, যা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে। কেবল গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই তা বুঝতে পারে। সে প্রতি মূহুর্তে আনন্দ দেখতে পায়; বরং প্রতিদিন তার জন্য রয়েছে হাজার আনন্দ। যে সকল বিষয় নিয়ে বন্ধুবর্গ আনন্দিত হয়, তারা তা নিয়ে আনন্দিত হন না।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র) আরেফদের গোপন অবস্থা সম্পর্কে কিছু কবিতা পড়তেন। যদিও তাদের গোপন বিষয় প্রকাশ করা ঠিক নয়। কবিতা নিম্নরূপ,

سِرْتُ بِأُنَاسٍ فِي الْغُيُوْبِ قُلُوْبُهُمْ - فَحَلُّوْا بِقُرْبِ الْمَاجِدِ الْمُتَفَضِّلُ.

عِرَاصًا بِقُرْبِ اللهِ فِيْ ظِلِّ قُدْسِهٖ - تَجُوْلُ بِهَا اَرْوَاحُهُمْ وَتَنْقُلُ.

مَوَارِدُهُمْ فِيْهَا عَلَى الْعِزِّ وَالنُّهٰى - وَمَصْدَرُهُمْ عَنْهَا لِمَا هُوَ أَكْمَلُ.

تَرُوْحُ بِعِزٍّ مُفْرَدٍ مِنْ صِفَاتِهٖ - وَفِيْ حُلَلِ التَّوْحِيْدِ تَمْشِيْ وَتَرْفُلُ.

وَمِنْ بَعْدِ هٰذَا مَا تَدِقُّ صِفَاتُهٗ - وَمَا كَتْمُهٗ أَوْلٰى لَدَيْهِ وَأَعْدَلُ.

سَأَكْتُمُ مِنْ عِلْمِيْ بِهٖ مَا يَصُوْنُهٗ - وَأَبْذُلُ مِنْهُ مَا أَرَى الْحَقَّ يَبْذُلُ.

وَأُعْطِيْ عِبَادَ اللهِ مِنْهُ حُقُوْقَهُمْ - وَاَمْنَعُ مِنْهُ مَا أَرَى الْمَنْعَ يَفْضُلُ.

عَلٰى أَنَّ لِلرَّحْمٰنِ سِرًّا يَصُوْنُهٗ - إِلٰى أَهْلِهٖ فِي السِّرِّ وَالصَّوْنُ أَجْمَلُ.

আমি এমন লোকদের সাথে পথ চলেছি, যাদের অন্তর গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে জানে। তারা বুযুর্গ ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের স্তরে পৌঁছে গেছে। এমন ময়দানে পা রাখে, যার ওপর আল্লাহর পবিত্র ছায়া পড়েছে। সেখানে তাদের আত্মা এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়। ইজ্জত ও হেকমত তাদের অবতরণের স্থান আর সিফাতে কামাল হলো বের হওয়ার পথ। তারা সিফাতের অলংকারে সজ্জিত এবং তাওহীদের পোশাকে চলাফেরা করে। এসকল স্তরের পর যে স্তর রয়েছে তা বর্ণনা করা অনুচিত। বরং তা গোপন করাই উত্তম ও যথাযোগ্য। আমি আমার ইলমের মধ্য থেকে ওই সকল বিষয় গোপন রাখি, যা আল্লাহ তাআলা গোপন রাখেন। আর ওই

বিষয় প্রকাশ করি, যার অনুমতি তিনি দেন। আল্লাহর বান্দাদের ওই পরিমাণই দিয়ে থাকি, যা তার হক। আর ওই বিষয় থেকে বিরত রাখি, যা থেকে বিরত রাখা উত্তম। আল্লাহ তাআলার কিছু গোপন রহস্য রয়েছে, তা তিনি এর যোগ্য লোকদের সামনে উন্মোচন করেন। আর অন্য লোকদের কাছে তা গোপন থাকাই উত্তম। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫৯)

এসকল কবিতায় যে মারেফাতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তাতে সবার শরীক হওয়া সম্ভব নয়। আর এটাও জায়েয নেই যে, যদি কারও সামনে এ মারেফাতের কিছু অংশ প্রকাশ পায় তাহলে সে তা অন্যের সামনে প্রকাশ করবে যাদের কাছে তা প্রকাশিত হয়নি; বরং সবাই যদি এ মারেফাতের শরীক হয়ে যেত তাহলে এ দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যেত। বরং দুনিয়া আবাদ ও ঠিক থাকার জন্য আবশ্যক হলো, এ মারেফাতের বিষয়ে মানুষ উদাসীন থাকবে।

বাস্তব বিষয় হলো, যদি দুনিয়ার সব মানুষ চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুধু হালাল বস্তু খাওয়ার নিয়ত করে তাহলে এ দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। বাজার, মার্কেট বন্ধ হয়ে যাবে। জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে।

আলেমগণ যদি শুধু হালাল ভক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে সে নিজেকে ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। তার জবান ও কলমের মাধ্যমে যে ইলম প্রচার হতো তাও বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর ব্যবস্থাপনা হেকমত থেকে খালি নয়। আমাদের বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা খারাপ মনে হয় তাও রহস্য ও হেকমত মুক্ত নয়। যেমন কল্যাণকর বস্তুতে রহস্য ও হেকমত রয়েছে। আর আল্লাহর কুদরতের মতো তাঁর হেকমতেরও কোনো সীমা নেই।

মহব্বতের আরেকটি আলামত হলো, নিজের মহব্বত গোপন রাখা। মহব্বতের দাবি না করা এবং আবেগ ও মহব্বত প্রকাশে বিরত থাকা। এ কারণে যে, মহব্বত গোপন রাখাই মূলত মাহবুবের সম্মান। আর এটাই মাহবুবের বড়ত্ব ও মর্যাদার দাবি। তার রহস্য প্রকাশ করা তার আত্মসম্মানের পরিপন্থি। কারণ, মহব্বত মাহবুবের এক গোপন রহস্য। তাছাড়া মহব্বতের দাবির ক্ষেত্রে মুখ থেকে এমন কিছু কথা বের হয়ে যাবে, যা বাস্তবের বিপরীত। তখন তা মিথ্যা অপবাদে পরিণত হবে। যা আখেরাতে কঠোর শাস্তির কারণ হবে; এমনকি দুনিয়াতেও এর শাস্তি হতে পারে।

তাছাড়া আশেক মহব্বতে এমনভাবে নিমগ্ন হয় যে, সে হতবুদ্ধি হয়ে যায়, তার অবস্থা এমন হয় যে, সে কী বলছে, কী করছে তার প্রতি খেয়াল থাকে না। এমতাবস্থায় যদি সে মহব্বত প্রকাশ করে তাহলে তাকে মাজুর গণ্য করা হবে। কারণ, সে মহব্বতের উদ্দীপনায় আবদ্ধ।

কখনো মহব্বতের কারণে মনের আগুন এমনভাবে জ্বলে ওঠে যে, তা নেভানো সম্ভব হয় না। কখনো মহব্বত প্লাবনের মতো এসে অন্তরকে প্লাবিত করে যায়। যে ব্যক্তি মহব্বত গোপন করতে সক্ষম, সে নিজের অবস্থা এভাবে ব্যক্ত করে,

وَقَالُوْا قَرِيْبٌ، قُلْتُ : مَا أَنَا صَانِعٌ - بِقُرْبِ شُعَاعِ الشَّمْسِ لَوْ كَانَ فِيْ حِجْرِيْ

فَمَالِيَ مِنْهُ غَيْرُ ذِكْرٍ بِخَاطِرٍ - يُهَيِّجُ نَارَ الْحُبِّ وَالشَّوْقِ فِيْ صَدْرِيْ.

লোকে বলে, মাহবুব কাছেই রয়েছে। আমি বলি, যদি সূর্যকিরণ আমার পার্শ্বদেশে থাকে তাহলে আমি কী করব? আমার জন্য অন্তরে তার এ পরিমাণ স্মরণই যথেষ্ট, যা অন্তরে মহব্বত ও আগ্রহের আগুন প্রজ্বলিত করে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মহব্বত গোপন করতে অক্ষম, সে বলে,

يَخْفٰى فَيُبْدِيْ الدَّمْعُ أَسْرَارَهٗ - وَيُظْهِرُ الْوَجْدَ عَلَيْهِ النَّفَسُ.

তিনি গোপন থাকেন; কিন্তু অশ্রু তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেয়। আর ভাবাবেগ তার অভ্যন্তরকে প্রকাশ করে দেয়।

সে আরও বলে,

وَمَنْ قَلْبُهٗ مَعَ غَيْرِهٖ كَيْفَ حَالُهٗ - وَمَنْ سِرُّهٗ فِيْ جَفْنِهٖ كَيْفَ يَكْتُمُ.

যার অন্তর অন্যের সাথে রয়েছে, তার অবস্থা কী? আর যার রহস্য চোখের পাতায় রয়েছে, সে কীভাবে গোপন থাকতে পারে? (দিওয়ানে মুতানাব্বী বি শারহিল আকবারী : ৪ : ৮১)

যুন্নুন মিসরী (র) তার এক বন্ধুর কাছে গেলেন, যে মহব্বত নিয়ে আলোচনা করতো। তিনি তার বন্ধুকে বিপদগ্রস্ত দেখে বললেন, যে ব্যক্তি মাহবুবের দেওয়া বিপদকে কষ্ট মনে করে, সে তাঁকে ভালোবাসে না। লোকটি বলল, আমার বক্তব্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি তাঁর দেওয়া কষ্টের স্বাদ

অনুভব করে না, সে তাঁকে ভালোবাসে না। তখন যুন্নুন মিসরী (র) বললেন, কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেকে মহব্বতকারী হিসেবে প্রচার করে, সে প্রকৃত মহব্বতকারী নয়। তখন লোকটি তার কাজের জন্য লজ্জিত হলো এবং তওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইল। (কূতুল কুলূব : ২ : ৬৭)

যদি প্রশ্ন হয় যে, মহব্বত হলো সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থান। তা প্রকাশ করাও উত্তম। সুতরাং মহব্বত প্রকাশ নিন্দনীয় হতে পারে কীভাবে?

এর উত্তর হলো, মহব্বত একটি প্রশংসনীয় গুণ। তা নিজ থেকে প্রকাশ পাওয়াও প্রশংসনীয়। কিন্তু তা প্রকাশ করা নিন্দনীয়। কারণ, প্রকাশ করার মাঝে দাবি ও অহংকার দুটোই পাওয়া যায়।

মহব্বতকারীর কর্তব্য, তার কর্ম ও অবস্থার মাধ্যমে নিজের মহব্বত প্রকাশ করবে, কথার মাধ্যমে নয়; বরং মহব্বতকারী এমন হওয়া উচিত যে, তার কোনো কর্ম যেন এটা প্রমাণ না করে যে, সে নিজের মহব্বত প্রকাশ করতে চায়। বরং তার এ ইচ্ছা থাকা উচিত যে, তার মহব্বত যেন মাহবুব ব্যতীত অন্য কেউ না জানে। মাহবুব ব্যতীত অন্য কেউ জানার ইচ্ছা পোষণ করা মূলত মহব্বতের ক্ষেত্রে অংশিদারিত্ব। যা মহব্বতের পরিপন্থি। যেমন ইনজিলে বর্ণিত আছে, যখন তুমি সদকা করো তখন এমনভাবে করো, যেন তোমার বাম হাত না জানে তোমার ডান হাত কী করেছে। যিনি গোপন বিষয় জানেন, তিনি তোমাকে এর বিনিময় প্রকাশ্যে দিবেন। আর যখন তুমি রোযা রাখো তখন মুখ ধৌত করো, মাথায় তেল লাগাও, যেন তোমাকে তরতাজা মনে হয় এবং তোমার প্রভু ছাড়া অন্য কেউ তা না জানে।

মোটকথা, কথা ও কাজ এ দুটির মাধ্যমে মহব্বত প্রকাশ করা নিন্দনীয়। কিন্তু যদি মহব্বতের নেশা প্রবল হয়ে যায়, ফলে জবান ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থির না থাকে তাহলে এক্ষেত্রে মহব্বতকারীকে নিন্দা করা হবে না।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি কোনো মাজনুনকে এমন অবস্থায় দেখল, যে অবস্থা তার মধ্যে ছিল না। সে এ বিষয়টি মারুফ কারখী (র)-কে জানালে তিনি মৃদু হেসে বললেন, দেখো ভাই! আল্লাহর ছোটো-বড়, আকেল-মাজনুন এমন অনেক মহব্বতকারী রয়েছে। ইনি হচ্ছেন সেই মাজনুনদের একজন। (কূতুল কুলূব : ২ : ৬৭)

মহব্বত প্রকাশ করা নিন্দনীয় হওয়ার একটি কারণ হলো, মহব্বতকারী যদি আরেফ হয় এবং অবিরাম মহব্বত ও আগ্রহের ক্ষেত্রে ফেরেশতাদের অবস্থা সম্পর্কে জেনে যায় যে, তারা দিনরাত তাসবীহ পাঠ করে, কখনো ক্ষান্ত হয় না। আল্লাহর নাফরমানি করে না। যা আদেশ দেওয়া হয় তা পালন করে তাহলে সে নিজের অক্ষমতা ও মহব্বতের দাবির ক্ষেত্রে লজ্জিত হবে। নিজেকে মহব্বতকারীদের নিম্নস্তরের মনে করবে এবং নিজের মহব্বতকে অন্যের মহব্বতের তুলনায় খুবই নগন্য মনে করবে।

এক কাশফওয়ালা বুযুর্গ বলেন, আমি ত্রিশ বছর যাবত আমার অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদত করেছি। এক পর্যায়ে আমার এমন ধারণা হলো যে, আল্লাহর নিকট আমার এক মর্তবা রয়েছে। এরপর তিনি তার কাশফের দীর্ঘ আলোচনা করলেন এবং আসমানী রহস্যাবলির বর্ণনা দিলেন। শেষ পর্যায়ে বললেন, আমি ফেরেশতাদের এক কাতারে এসে পৌঁছলাম। যাদের সংখ্যা সমস্ত মাখলুকের সংখ্যার সমান। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কারা? তারা বলল, আমরা আল্লাহর মহব্বতকারী। এখানে তিন লাখ বছর থেকে আল্লাহর ইবাদত করছি। আমাদের মনে কখনো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো চিন্তা আসেনি। তিনি ব্যতীত অন্য কারও যিকিরও আমরা করিনি। বুযুর্গ বলেন, তাদের কথা শুনে আমি খুব লজ্জিত হলাম। আমি নিজের সমস্ত আমল ওই ব্যক্তিদের দান করে দিলাম, যাদের ব্যাপারে শাস্তি নির্ধারিত হয়ে গেছে। যেন জাহান্নামে তাদের শাস্তি কম হয়। (কূতুল কুলূব : ২ : ৬৮)

সুতরাং যে নিজেকে ও তার রবকে চিনে এবং তার ব্যাপারে যথাযথ লজ্জা করে, তার জবান মহব্বতের দাবি প্রকাশের ক্ষেত্রে নির্বাক হয়ে যায়।

তবে ব্যক্তির চলাফেরা ও স্থিরতা, অগ্রসর ও বিরত থাকা ইত্যাদি থেকে তার মহব্বত বুঝে আসে। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র) বলেন, আমার উস্তাদ সিররী সিকতী (র) একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিন্তু অসুস্থতার কোনো কারণ ও ওষুধ আমরা খুঁজে পেলাম না। একজন আমাদেরকে এক অভিজ্ঞ ডাক্তারের সন্ধান দিলেন। আমি সিররী সিকতীর একটি বোতল

নিয়ে ওই ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তার পাত্রটি ভালোভাবে দেখে বললেন, এ পাত্রটি তো কোনো আশেকের মনে হচ্ছে। জুনাইদ বাগদাদী (র) বলেন, একথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে বেঁহুশ হয়ে গেলাম এবং আমার হাত থেকে পাত্রটি পড়ে গেল। আমি ফিরে এসে সিররী সিকতীকে ঘটনাটি খুলে বললাম। তিনি মৃদু হেসে বললেন, ডাক্তার তো বোতল খুব ভালো চেনে! আমি জিজ্ঞেস করলাম, বোতলেও কি মহব্বত প্রকাশ পায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

একবার সিররী সিকতী (র) বললেন, আমি চাইলে বলতে পারি, তাঁর মহব্বতই আমার শরীরের গোশত বিগলিত করে হাড়ের সাথে লাগিয়ে দিয়েছে। একথা বলেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

সিররী সিকতী (র)-এর অজ্ঞান হয়ে পড়ার দ্বারা বুঝে আসে, তিনি বিস্মৃতির প্রবলতায় নিজের গোপন বিষয় প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। আর এটাই মহব্বতের আলামত ও ফলাফল।

সন্তুষ্টি ও ঘনিষ্ঠতাও মহব্বতের ফল। এর আলোচনা পরবর্তীতে আসছে।

মোটকথা, দীনের সকল সুন্দর বিষয় ও উত্তম চরিত্র মহব্বতের ফল। যদি মহব্বতের কোনো ফলাফল না থাকে তাহলে তা মূলত প্রবৃত্তির অনুসরণ। আর প্রবৃত্তির অনুসরণ মন্দ চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত।

দু কারণে মানুষ আল্লাহকে মহব্বত করে থাকে। এক. আল্লাহ তার প্রতি ইহসান করেছেন। দুই. আল্লাহর বড়ত্ব ও সৌন্দর্যের কারণে। যদিও তার প্রতি কোনো ইহসান করা না হয়।

এ কারণে জুনাইদ বাগদাদী (র) বলেন, আল্লাহর সাথে মহব্বতের ক্ষেত্রে মানুষ দু ধরনের হয়ে থাকে। সাধারণ ও বিশেষ। সাধারণ মানুষ আল্লাহকে মহব্বত করে এ কারণে যে, তারা আল্লাহর অনবরত ইহসান ও নেয়ামত সমূহ অবলোকন করে। সুতরাং এসব দেখে তারা মহব্বত না করে পারে না। ফলে ইহসানে কমবেশ হওয়ায় তাদের মহব্বতেও কমবেশ হয়ে থাকে। আর বিশেষ ব্যক্তিরা আল্লাহকে ভালোবাসার কারণ হলো, আল্লাহর শান অনেক বড়। তিনি ইলম, কুদরত, হেকমত ও রাজত্বের একক মালিক। তারা যখন আল্লাহর সিফাতে কামেল ও আসমায়ে হুসনা সম্পর্কে জানে তখন মহব্বত না করে থাকতে পারে না। কারণ, তারা মনে করে, এ মহব্বতের

উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ। যদিও তিনি তাদেরকে কোনো নেয়ামতের যোগ্য মনে না করেন এবং সকল নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রাখেন।

কিছু লোক এমনও রয়েছে, যারা প্রবৃত্তি ও আল্লাহর দুশমন ইবলিসকে মহব্বত করে। অজ্ঞতা ও প্রবঞ্চনাবশত তারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র মনে করে। এরা ওই সকল লোক, যাদের মধ্যে উপরোল্লিখিত মহব্বতের আলামতসমূহ নেই। অথবা তারা কপটতা, লৌকিকতা ও সুখ্যাতির জন্য আল্লাহ ও তার দুশমনের মহব্বতকে মিশ্রিত করে ফেলে। তাদের উদ্দেশ্য থাকে দুনিয়ার নেয়ামত লাভ করা। অথচ সে দীনের পরিপন্থি কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে। যেমন মন্দ আলেম। এরা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর ঘৃণিত ব্যক্তি।

হযরত সাহল তস্তরী (র) যখন কারও সাথে কথা বলতেন তখন তাকে বন্ধু বা প্রিয় বলে সম্বোধন করতেন। একবার কেউ তাকে বলল, আপনি সবাইকে বন্ধু বলেন কেন? সে তো বন্ধু নাও হতে পারে। সাহল (র) তার কানের কাছে এসে আস্তে করে বললেন, ওই ব্যক্তি মুমিন হবে অথবা মুনাফিক। যদি মুমিন হয় তাহলে সে আল্লাহর বন্ধু আর যদি মুনাফিক হয় তাহলে ইবলিসের বন্ধু। (কূতুল কুলূব : ২ : ৮২)

মহব্বতের আলামত সম্পর্কে আবু তুরাব তাখশাবী কিছু কবিতা আবৃত্তি করেছেন, যা নিম্নরূপ,

لَا تُخْدَعَنَّ فَلِلْمُحَبِّ دَلَائِلُ - وَلَدَيْهِ مِنْ تُحَفِ الْحَبِيْبِ وَسَائِلُ.

مِنْهَا تَنَعُّمُهُ بِمُرِّ بَلَائِهِ - وَسُرُوْرُهُ فِيْ كُلِّ مَا هُوَ فَاعِلُ.

فَالْمَنْعُ مِنْهُ عَطِيَّةٌ مَقْبُوْلَةٌ - وَالْفَقْرُ إِكْرَامٌ وَبِرٌّ عَاجِلُ.

وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ يُرٰى مِنْ عَزْمِهِ - طَوْعَ الْحَبِيْبِ وَإِنْ اَلَحَّ الْعَاذِلُ.

وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ يُرٰى مُتَبَسِّمًا - وَالْقَلْبُ فِيْهِ مِنَ الْحَبِيْبِ بَلَابِلُ.

وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ يُرٰى مُتَفَهِّمًا - لِكَلَامِ مَنْ يَحْظٰى لَدَيْهِ السَّائِلُ.

وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ يُرٰى مُتَقَشِّفًا - مُتَحَفِّظًا مِنْ كُلِّ مَا هُوَ قَائِلُ.

তুমি প্রতারিত হয়ো না। কেননা, মহব্বতকারীর কিছু আলামত রয়েছে। আর তার কাছে হাবীবের পক্ষ থেকে রয়েছে উপঢৌকনের মাধ্যম। একটি আলামত হলো, বিপদের তিক্ততার স্বাদ গ্রহণ করা এবং মাহবুবের প্রত্যেক কাজে খুশি হওয়া। যদি মাহবুবের পক্ষ থেকে কিছুই পাওয়া না যায় তাহলে তাকে উপহার মনে করে গ্রহণ করা এবং দারিদ্র্যকে সম্মান ও পুণ্য মনে করা। মহব্বতের আরেকটি আলামত হলো, মাহবুবের আনুগত্যের জন্য দৃঢ়প্রত্যয়ী হওয়া। যদিও লোকে তাকে তিরস্কার করে। আরেকটি আলামত হলো, মহব্বতকারীর সদা হাস্যোজ্জ্বল থাকা, যদিও হৃদয় মাহবুবের বিচ্ছেদে ক্রন্দন করে। আরেকটি আলামত হলো, তার প্রত্যেক কথায় সংযমী ও নিরাপদ থাকা।

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায (র) বলেন,

وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ مُشَمِّرًا - فِيْ خِرْقَتَيْنِ عَلٰى شُطُوْطِ السَّاحِلِ.

وَمِنَ الدَّلَائِلِ حُزْنُهٗ وَنَحِيْبُهٗ - جَوْفَ الظَّلَامِ فَمَا لَهٗ مِنْ عَاذِلِ.

وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ مُسَافِرًا - نَحْوَ الْجِهَادِ وَكُلِّ فِعْلٍ فَاضِلِ.

وَمِنَ الدَّلَائِلِ زُهْدُهٗ فِيْمَا يَرٰى - مِنْ دَارِ ذُلٍّ وَالنَّعِيْمِ الزَّائِلِ.

وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ بَاكِيًا - أَنْ قَدْ رَاٰهُ عَلٰى قَبِيْحِ فَعَائِلِ.

وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ مُسَلِّمًا - كُلَّ الْأُمُوْرِ إِلَى الْمَلِيْكِ حُكْمِ الْعَادِلِ.

وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ رَاضِيًا - بِمَلِيْكِهٖ فِيْ كُلِّ حُكْمٍ نَازِلِ.

وَمِنَ الدَّلَائِلِ ضِحْكُهٗ بَيْنَ الْوَرٰى - وَالْقَلْبُ مَحْزُوْنٌ كَقَلْبِ الثَّاكِلِ.

মহব্বতের একটি আলামত হলো, তুমি মহব্বতকারীকে দেখবে সমুদ্র তীরে দুটি কাপড় গুটিয়ে সাবধানে পা ফেলছে। আরেকটি আলামত হলো, অন্ধকার রাতে সে তার কষ্ট ও রোদন প্রকাশ করে, যখন কোনো ভর্ৎসনাকারী থাকে না। একটি আলামত হলো, সে জিহাদ ও প্রত্যেক নেক কাজের পথিক। আরেকটি আলামত হলো, সে লাঞ্ছনার ঘর ও অস্থায়ী

নেয়ামত পরিত্যাগ করে। আরেকটি আলামত হলো, সে সকল বিষয় ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর কাছে সোপর্দ করে। আরেকটি আলামত হলো, সে মন্দ কর্মে ক্রন্দন করে। আরেকটি আলামত হলো, সে তার মালিকের সমস্ত ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে। আরেকটি আলামত হলো, সে মানুষের মাঝে সদা হাস্যোজ্জ্বল থাকে, অথচ তার হৃদয় সন্তানহারা ব্যক্তির ন্যায় ব্যথিত থাকে।

আল্লাহর প্রতি নৈকট্যের স্বরূপ

অনুরাগ, ভীতি ও নৈকট্য মহব্বতের অন্যতম ফল। কিন্তু এসব ফল অবস্থাভেদে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। যখন মহব্বতকারী আল্লাহর প্রতাপ ও সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে নিজের অক্ষমতা বুঝে নেয় এবং অবস্থাটি প্রবল হয়ে দেখা দেয়, তখন অন্তর তাঁর অন্বেষণে উত্তেজিত থাকে। অন্তরের এই উত্তেজনাকে 'শওক' তথা অনুরাগ বলা হয়। যখন মহব্বতকারীর ওপর খোদায়ী সৌন্দর্য ও নৈকট্যের আনন্দ প্রবল হয়, তখন অন্তরের এই আনন্দ ও খুশির ভাবকে 'উন্‌স' তথা নৈকট্য বলা হয়।

মহব্বতকারীর দৃষ্টি কখনো মাহবুবের শক্তি, অমুখাপেক্ষিতা, বেপরোয়াভাব ইত্যাদি গুণাবলির প্রতি নিবদ্ধ থাকে এবং এগুলো জানার কারণে মনে ব্যথা থাকে। অন্তরে এ ধরনের দুঃখের ভাব প্রবল হয়ে গেলে তাকে বলা হয় 'খওফ' তথা ভীতি।

মোটকথা, খোদায়ী সৌন্দর্য অনুভূত হওয়ার মাধ্যমে অন্তরে যে আনন্দ লাভ হয় তাকে অনুরাগ বলে। যখন এ আনন্দ প্রবল হয় ও তার দৃষ্টিবহির্ভূত বস্তুর প্রতি খেয়াল না থাকে এবং অন্তরে কিছু হারানোর ভয় না থাকে তখন এ আনন্দ অনেক বেড়ে যায়।

এক বুযুর্গকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি আগ্রহী? তিনি বললেন, না, আগ্রহ তো ওই বস্তুর প্রতি হয় যা উপস্থিত থাকে না। যদি তা উপস্থিত থাকে তাহলে কীসের প্রতি আগ্রহ থাকবে? (তাহযীবুল আসরার : ১১০)

এর দ্বারা বোঝা গেল, এ বুযুর্গ এ সকল বস্তু পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে এতটাই দিশেহারা যে, যা সে পায়নি তার প্রতি কোনো খেয়াল তার নেই।

যার মধ্যে অনুরাগ প্রবল, সে নির্জনতাপ্রিয় হয়ে থাকে। এ কারণেই

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) পাহাড় থেকে অবতরণ করলে কেউ প্রশ্ন করল– আপনি কোত্থেকে আসছেন? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি অনুরাগ থেকে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৮ : ২০)

যে আল্লাহর প্রতি অনুরাগী হয়, গায়রুল্লাহর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া তার জন্য অপরিহার্য। বর্ণিত আছে, মূসা (আ) যখন আল্লাহ তাআলার সাথে বাক্যালাপ করতেন, তখন কিছুদিন পর্যন্ত মানুষের কথাবার্তা শুনে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। এর কারণ, মাহবুবের কথা ও তাঁর প্রতি অনুরাগ এত মিষ্ট যে, অন্য বস্তুর মিষ্টতা অন্তর থেকে সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়ে যায়। সেমতে আল্লাহ তাআলা দাউদ (আ)-এর প্রতি ওহি নাযিল করেন, হে দাউদ! আমার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং আমারই প্রতি অনুরাগী হও। অন্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হও। (হিলইয়াতুল আউলিয়া : ১০ : ১০৭)

হযরত রাবেয়া বসরী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কীসের মাধ্যমে আপনি এ স্তর লাভ করেছেন? তিনি বললেন, অনর্থক বিষয় বর্জন এবং অবিনশ্বর সত্তার প্রতি অনুরাগের মাধ্যমে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া : ১০ : ১০৭)

আবদুল ওয়াহেদ ইবন যায়েদ বলেন, আমি জনৈক দরবেশকে বললাম, আপনি কি খুব নির্জনতা পছন্দ করেন? তিনি বললেন, মিঞা সাহেব! আপনি যদি নির্জনতার স্বাদ আস্বাদন করেন, তবে নিজেকেও ঘৃণা করতে শুরু করবেন। নির্জনতাই তো ইবাদতের মূল শিকড়। আমি বললাম, আপনি নির্জনতার সর্বনিম্ন উপকার কী পেয়েছেন? তিনি বললেন, মানুষের তোষামোদ থেকে মুক্তি এবং তাদের অনিষ্ট থকে নিরাপত্তা। আমি বললাম, মানুষ আল্লাহ তাআলার প্রতি অনুরাগের মিষ্টতা কখন পায়? তিনি বললেন, যখন মহব্বত পরিষ্কার এবং আদান-প্রদান খাঁটি হয়। আমি বললাম, মহব্বত কখন পরিষ্কার হয়? তিনি বললেন, যখন ইবাদতে কোনো চিন্তা অবশিষ্ট না থাকে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া : ১০ : ১০৭)

আল্লাহর নৈকট্যের বিশেষ আলামত হচ্ছে, জনকোলাহলে অস্বস্তিবোধ করা এবং খোদায়ী ইবাদতের মিষ্টতা আস্বাদনে তীব্র লোভী হওয়া। এমতাবস্থায় নৈকট্যশীল ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করলেও এমনভাবে করবে যেন সে জনসমাবেশের মধ্যেও একা। আলী (রা) বলেন, নৈকট্যশীল ব্যক্তিরা কেবল দৈহিকভাবে দুনিয়াকে সঙ্গ দেয়।

তাঁদের আত্মা উচ্চতম প্রাসাদে নিবদ্ধ। তারা পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি এবং তাঁর ধর্মের প্রতি আহ্বায়ক। (আল মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম : ৩১১)

এ হলো আল্লাহর নৈকট্যের অর্থ, আলামত ও প্রমাণ।

কতিপয় মুতাকাল্লিমিন (ধর্মতত্ত্ববিদ) অনুরাগ, নৈকট্য ও মহব্বতকে অস্বীকার করে। কারণ, তাদের ধারণা হলো, এগুলো সাব্যস্ত করা মূলত সাদৃশ্য প্রমাণ করে। যা আল্লাহর শানের পরিপন্থি। প্রকৃতপক্ষে তারা জানে না যে, যে বস্তুর সৌন্দর্য অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বোঝা যায়, তা চর্মচক্ষুর মাধ্যমে বোঝার চেয়ে পরিপূর্ণ হয়।

অস্বীকারকারীদের একজন হলো আহমদ ইবনে গালিব। যে গোলাম খলিল নামে পরিচিত। সে হযরত জুনাইদ বাগদাদী, আবুল হাসান নূরী (র) সহ অনেকের মহব্বত, নৈকট্য ও অনুরাগকে অস্বীকার করতো। এধরনের কিছু লোক রিযার মর্তবাকেও অস্বীকার করেছে। তারা বলে, সবর ব্যতীত আর কোনো মর্তবা নেই। আর রিযার কথা তো চিন্তাই করা যায় না। এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা। তারা দীনের মূল সম্পর্কে অবগত নয়; বরং দীনের বাহ্যিক আবরণকে তারা দীন মনে করে এবং এটাকেই সবকিছু ভাবে। তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহকে মূল মনে করে। মূলত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় দীনের আবরণ, যার মূল বস্তু আবরণের ভিতরে থাকে। যে ব্যক্তি আখরোট কে শুধু খোসা মনে করে, তার কাছে আখরোট একটি কাঠের টুকরা ছাড়া কিছু নয়। আখরোট থেকে তেল বের হওয়ার বিষয়টি তার কাছে অসম্ভব মনে হবে। এমন ব্যক্তি মাযুর। কিন্তু তার এ ওযর গ্রহণযোগ্য নয়।

কবি বলেন,

اَلْأُنْسُ بِاللهِ لَا يَحْوِيْهِ بَطَّالُ - وَلَيْسَ يُدْرِكُهُ بِالْحَوْلِ مُحْتَالُ.

وَالْاٰنِسُوْنَ رِجَالٌ كُلُّهُمْ نُجُبٌ - وَكُلُّهُمْ صِفْوَةٌ لِلّٰهِ عُمَّالُ.

আল্লাহর নৈকট্য অকর্মণ্যদের জন্য শোভা পায় না। কোনো প্রতারকও কৌশলের মাধ্যমে তা অর্জন করতে পারে না। যারা আল্লাহর নৈকট্যশীল তারা সকলেই সম্ভ্রান্ত-ভদ্র এবং সকলেই আন্তরিক ও আমলদার।

নৈকট্যের প্রাবল্যের

নৈকট্য যখন স্থায়ী, প্রবল ও মজবুত হয়ে যায়, এবং অনুরাগের পরিবর্তন ও অন্তরায় হওয়ার ভয় তাকে চিন্তিত করতে পারে না তখন তা মুনাজাতে এক প্রকার সন্তুষ্টি ও প্রশস্ততা সৃষ্টি করে, যা বাহ্যত মাঝে মাঝে মন্দ হয়ে থাকে। কারণ, এতে রয়েছে দুঃসাহস ও নির্ভীকতা। কিন্তু যে ব্যক্তি নৈকট্যের স্তরে অবস্থান করে, সে এই প্রশস্ত ভাব সহ্য করে নেয়। আর যে ব্যক্তি এই স্তরে অবস্থান না করে কথায় ও কাজে নৈকট্যশীলদের মতো সাহসিকতা দেখায়, সে ধ্বংস হয়ে যায় এবং কুফরের কাছাকাছি চলে যায়।

এর দৃষ্টান্ত হলো বুরখে আসওয়াদের মুনাজাত। তার সম্পর্কে মূসা (আ)-কে আদেশ করা হয় যে, বনী ইসরাইলের নিমিত্ত বৃষ্টির দুআ করার জন্য তাকে অনুরোধ করো। বুরখে আসওয়াদের কাহিনি নিম্নরূপ।

বনি ইসরাঈলের দেশে সাত বছর পর্যন্ত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ বিরাজ করলে মূসা (আ) সত্তর হাজার লোক সঙ্গে নিয়ে বৃষ্টির জন্য দুআ করতে বের হন এবং দুআ করেন। প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তাআলা এই মর্মে ওহি পাঠালেন, যারা পাপিষ্ঠ, গুনাহে আচ্ছন্ন, বিশ্বাস ছাড়াই দুআ করে এবং আমার আযাবকে ভয় করে না, তাদের দুআ আমি কীভাবে কবুল করব? তুমি আমার এক বান্দর কাছে যাও। যার নাম বুরখ। তাকে বলো, বাইরে এসে বৃষ্টির জন্য দুআ করতে, যাতে আমি কবুল করি। মূসা (আ) বুরখের খোঁজ নিলে কেউ তার সন্ধান দিতে পারল না। একদিন তিনি জনৈক হাবশী গোলামকে পথিমধ্যে দেখতে পেলেন। তার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে সেজদার ধূলি লেগেছিল এবং গলায় একটি চাদর জড়ানো। তিনি খোদাপ্রদত্ত নূরের মাধ্যমে তাকে চিনলেন এবং নাম জিজ্ঞেস করলেন, সে বলল, আমার নাম বুরখ। মূসা (আ) বললেন, আমি তো দীর্ঘদিন থেকে তোমাকেই খুঁজছি। আমার সঙ্গে চলো এবং বৃষ্টির জন্য দুআ করো। বুরখ তাঁর সঙ্গে গেল এবং এভাবে দুআ করল— ইলাহী! এটি আপনার কাজও নয়, হুকুমও নয়। আপনার কী হলো যে, অনাবৃষ্টি সৃষ্টি করে রেখেছেন? আপনার নিকটস্থ নদীনালা শুকিয়ে গেছে কি? না বায়ু আপনার আনুগত্য স্বীকার করছে না? না গুনাহগারদের প্রতি আপনার ক্রোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে? গুনাহগারদের সৃষ্টি করার পূর্বে কি আপনি ক্ষমাকারী

ছিলেন না? আপনিই তো রহমত সৃষ্টি করেছেন এবং অনুগ্রহের আদেশ করেছেন। এখন কী আমাদের দেখাচ্ছেন যে, আপনার কাছ পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে পারে না? মোটকথা, সে দুআর মধ্যে এমনি ধরনের উচিত-অনুচিত কথাবার্তা বলতে লাগল। অবশেষে বৃষ্টি বর্ষিত হলো এবং বনি ইসরাইল সিক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলার আদেশে ঘাস জন্মালো এবং দ্বিপ্রহর অবধি উরু পর্যন্ত বড় হয়ে গেল। এরপর বুরখ স্বস্থানে চলে গেল। পরবর্তী সময়ে মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে সে বলল, আমি আমার রবের সঙ্গে কেমন বিবাদ করেছি আর তিনি আমার সাথে ইনসাফ করেছেন। এবিষয়ে আপনি কী বলেন,? মূসা (আ) কিছু বলার ইচ্ছা করলেন তখন আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-এর কাছে ওহি পাঠালেন, বুরখ আমাকে দিনে তিনবার হাসায়। (কূতুল কুলূব : ২ : ৬৫)

হাসান বসরী (র) বর্ণনা করেন, একবার বসরায় অগ্নিকাণ্ডে অনেক কুঁড়েঘর পুড়ে গেল; কিন্তু সেগুলোর মাঝে একটি কুঁড়েঘর সম্পূর্ণ অক্ষত রয়ে গেল। তখন বসরার গভর্নর ছিলেন আবু মূসা আশআরী (রা)। তিনি এই অভূতপূর্ব ঘটনার সংবাদ পেয়ে সে কুঁড়েঘরের মালিককে ডেকে পাঠালেন। দেখা গেল সে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী? তোমার কুঁড়েঘর জ্বলেনি কেন? সে বলল, আমি আমার ঘরটি ভস্মীভূত না করার জন্য আল্লাহ তাআলাকে কসম দিয়েছিলাম। আবু মূসা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক হবে, যাদের মাথার কেশ থাকবে বিক্ষিপ্ত এবং পোশাক হবে মলিন। কিন্তু তারা আল্লাহ তাআলাকে কোনো বিষয়ে কসম দিলে আল্লাহ তাআলা তা বাস্তবায়ন করে দেখাবেন। (তাহযীবুল আসরার : ৫৯২)

হাসান বসরী (র) থেকে আরও বর্ণিত আছে, বসরায় একবার অগ্নিকাণ্ড ঘটলে আবু ওবায়দা খাওয়াস সেখানে এসে আগুনের উপর হাটতে লাগলেন। বসরার শাসনকর্তা আরয করলেন– দেখুন, আপনি জ্বলে না যান। তিনি বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আগুনে না জ্বালানোর জন্য আমি আল্লাহ তাআলাকে কসম দিয়ে রেখেছি। শাসনকর্তা বললেন, তাহলে আগুনকেও নিভে যাওয়ার জন্য কসম দিন। তিনি আগুনকে কসম দিলেন এবং তা নিভে গেল। (তাহযীবুল আসরার : ৫৯২)

একদিন আবু হাফস (র) পথ চলছিলেন, এমন সময় এক ধোপা সামনে এল। সে প্রকৃতিস্থ ছিল না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন– তোমার কী হয়েছে? সে বলল, আমার একমাত্র সম্বল গাধাটি হারিয়ে গেছে। এখন আমি কী করি? একথা শুনে আবু হাফস (র) আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করলেন, আপনার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম, আমি এক পা-ও সামনে এগুব না, যে পর্যন্ত আপনি এই ব্যক্তির গাধা তার কাছে পৌঁছে না দেবেন। একথা বলার সাথে সাথে গাধা সেখানে এসে হাজির হলো। অতঃপর তিনি সামনে এগুলেন। (তাহযীবুল আসরার : ৫৯৩)

এগুলো হচ্ছে নৈকট্যশীলদের কর্মকাণ্ড। অন্যদের এরূপ করার অধিকার নেই। জুনাইদ বাগদাদী (র) বলেন, নৈকট্যশীলরা তাদের কথাবার্তায় ও নির্জন মুনাজাতে এমন সব কথা বলেন, যা সাধারণ মানুষের কাছে কুফর মনে হয়ে থাকে। তারা এগুলো শুনলে নৈকট্যশীলদের সোজা কাফের বলতে শুরু করবে। অথচ এসব বিষয়ে নৈকট্যশীলরা নিজেদের উন্নতি অনুভব করেন। তাদের জন্যেই এসব কথাবার্তা শোভনীয়; অন্যদের জন্য নয়।

এমনটাও সম্ভব নয় যে, একই কথার কারণে আল্লাহ তাআলা এক বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং অন্য বান্দার প্রতি অসন্তুষ্ট, যদি উভয়ের অবস্থান তথা মাকাম ভিন্ন ভিন্ন হয়। অন্তর্দৃষ্টি থাকলে কুরআন মাজীদে এ বিষয়ে অনেক ইশারা-ইঙ্গিত রয়েছে। বলাবাহুল্য, কুরআন পাকের সমস্ত ঘটনা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে শিক্ষা গ্রহণের অমূল্য ইঙ্গিত ছাড়া কিছু নয়। আর যারা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন তাদের কাছে এগুলো নিছক কিচ্ছা-কাহিনি।

প্রথম ঘটনা হচ্ছে আদম (আ) ও অভিশপ্ত ইবলীসের। গুনাহ ও বিরুদ্ধাচরণে তারা উভয়েই অংশীদার ছিলেন। কিন্তু যে গুনাহের পর ইবলীস রহমত থেকে বিতাড়িত হলো এবং অভিশাপের বেড়ি গলায় পরল, সে গুনাহের পরই আদম (আ) সম্পর্কে ইরশাদ হলো,

وَ عَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى. ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدٰى.

এভাবে আদম তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল। ফলে সে ভ্রমে পতিত হলো। তারপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন। সুতরাং তার তওবা কবুল করলেন এবং তাঁকে পথ দেখালেন। (সূরা ত্বহা : ১২১-১২২)

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে এক বান্দার প্রতি মনোনিবেশ করে অন্য বান্দা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে ভর্ৎসনা করেছেন। অথচ তারা উভয়েই ছিল আল্লাহর বান্দা; কিন্তু তাদের অবস্থান ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ইরশাদ হয়েছে,

وَ اَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى. وَ هُوَ يَخْشٰى. فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى.

পক্ষান্তরে যে আপনার কাছে ছুটে আসল, আর সে ভয় করে (আল্লাহকে), আপনি তাকে উপক্ষো করলেন; (সূরা আবাসা : ৮-১০)

আর অন্য বান্দা সম্পর্কে বলা হয়েছে,

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى. فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى.

পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না, আপনি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। (সূরা আবাসা : ৫-৬)

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ (স)-কে একশ্রেণির লোকের সাথে ওঠাবসা করতে এবং অন্য একশ্রেণির লোক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আয়াতে বলা হয়েছে,

وَ اِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ.

যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাসী হয়, তারা যখন আপনার কাছে আসে তখন তাদেরকে আপনি বলুন, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। (সূরা আনআম : ৫৪)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

وَ اِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَ اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

আপনি যখন তাদের দেখবেন, যারা আমার আয়াতসমূহ নিয়ে উপহাসমূলক কথাবার্তায় লিপ্ত হয়, তখন আপনি তাদের থেকে সরে পড়বেন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি আপনাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পরে জালেম সম্প্রদায়ের সাথে বসবেন না। (সূরা আনআম : ৬৮)

আরও ইরশাদ হয়েছে,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ.

আপনি নিজেকে ধৈর্য সহকারে রাখবেন তাদেরই সংসর্গে, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। (সূরা কাহাফ : ২৮)

এমনিভাবে কোনো কোনো বান্দার পক্ষ থেকে মহব্বতের প্রফুল্লতা ও দুঃসাহস মেনে নেওয়া হয় এবং কোনো কোনো বান্দার তরফ থেকে মেনে নেওয়া হয় না।

উদাহরণত মূসা (আ) নৈকট্যের আনন্দের ছলে আরয করেছিলেন,

اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ، تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِىْ مَنْ تَشَآءُ.

তা তো শুধু আপনার পরীক্ষা, যা দিয়ে আপনি যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। (সূরা আরাফ : ১৫৫)

যখন হযরত মূসা (আ)-কে ফেরাউনের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় তখন তিনি ওযর স্বরূপ বললেন,

وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ. 'আমার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ আছে। (সূরা শুআরা : ১৪)

قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ. وَ يَضِيْقُ صَدْرِىْ وَ لَا يَنْطَلِقُ لِسَانِىْ.

তখন সে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আশঙ্কা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে 'এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ে, আর আমার জিহ্বা অচল হয়ে যায়। (সূরা শুআরা : ১২-১৩)

এধরনের জবাব মূসা (আ) ছাড়া অন্যের মুখ দিয়ে বের হলে তা বে-আদবি বলে গণ্য হবে। তবে নৈকট্যের স্তরে অবস্থানকারীর প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা হয়।

অপরদিকে ইউনুস (আ) এমন স্তরে ছিলেন না। তিনি ছিলেন পাকড়াও ও ভয়ের স্তরে। তাই তাঁর তরফ থেকে এর চেয়ে কম অভিমানকেও বরদাশত করা হয়নি এবং তাঁকে শাস্তিস্বরূপ মাছের পেটে বন্দি করা হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর জন্য এই ঘোষণা হয়ে যায়—

لَوْ لَا اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَ هُوَ مَذْمُوْمٌ.

যদি তাঁর প্রতিপালকের অনুগ্রহ তাঁর কাছে না পৌঁছতো তবে তিনি লাঞ্ছিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হতেন উন্মুক্ত প্রান্তরে। (সূরা কলাম : ৪৯)

হাসান বসরী (র) বলেন– এখানে 'উন্মুক্ত প্রান্তর' হলো কিয়ামত। আমাদের রাসূলুল্লাহ (স)-কে তার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَ هُوَ مَكْظُوْمٌ.

সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন আপনার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতীক্ষায়, আর আপনি মাছ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় অধৈর্য হবেন না, যখন তিনি বিষণ্ন অবস্থায় প্রার্থনা করেছিলেন। (সূরা কলাম : ৪৮)

এ ভিন্নতার এক কারণ হলো, অবস্থান ও মর্তবার ভিন্নতা। আর আরেক কারণ হলো, বান্দার তাকদীরে একে অপরের ওপর ফজিলত দান করা হয়েছে এবং বান্দার ভাগ্যেও ভিন্নতা দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ.

আর আমি কোনো নবীকে কোনো নবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (বনি ইসরাঈল : ৫৫)

আরও বলেছেন, مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ.

তাদের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। (সূরা বাকারা : ২৫৩)

হযরত ঈসা (আ) শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত নবীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। একারণে তারা নিজেদের প্রতি সালাম নিবেদন করেছেন। বিষয়টি কুরআনে উল্লেখ রয়েছে,

وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَ يَوْمَ اَمُوْتُ وَ يَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا.

এবং (আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে) আমার প্রতি সালাম, যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমি পুনরায় জীবিত হয়ে উত্থিত হবো। (সূরা মারইয়াম : ৩৩)

এ বাণী তাঁর মুখ থেকে ওই আনন্দের পরই বের হয়েছে, যা নৈকট্যের স্তরে পৌঁছে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের দ্বারা হাসিল হয়েছে। অন্য দিকে হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ) ভয় ও লজ্জাশীলতার স্তরে ছিলেন। এ কারণে তাঁর জবান চুপ থাকত। এমনকি আল্লাহ নিজেই তার গুণ বর্ণনা করে বলেছেন, سَلَامٌ عَلَيْهِ তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। (সূরা মারইয়াম : ১৫)

এ বিষয়টিও ভেবে দেখো যে, আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের ভুল এবং তাঁর নবীর সাথে ভাইদের আচরণ কীভাবে সহ্য করেছেন। কোনো কোনো আলেম সূরা ইউসুফের ৮ থেকে ২০ নং আয়াতের মধ্যে ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের ৪০টি ভুল গণ্য করেছেন। যে ভুলগুলোর একটি অপরটির চেয়ে বড় ছিল এবং একটি বাক্যে তিন থেকে চারটি ভুল ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের সকল ভুল মাফ করে দিয়েছেন। হযরত উযায়ের (আ) তাকদীরের ব্যাপারে মাত্র একটি প্রশ্ন করেছিলেন, একারণে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হয়েছে। এমনকি বলা হয়েছে, তার নাম নবীদের তালিকা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে।

এমনিভাবে বালআম ইবনে বা'উরা অনেক বড় আলেম ছিলেন। কিন্তু তার কর্ম মেনে নেওয়া হয়নি। সে দীনের বিনিময়ে দুনিয়া উপার্জন করতো।

হযরত সোলায়মান (আ)-এর উজির আসেফ অপচয়কারী ছিল। সে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গুনাহে লিপ্ত ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা সোলায়মান (আ)-এর কাছে ওহি পাঠালেন, হে আবেদদের সরদার! হে যাহেদদের পথ-প্রদর্শনকারীর সন্তান! কত দিন পর্যন্ত তোমার খালাত ভাই আসেফ আমার অবাধ্য থাকবে আর আমি একের পর এক তা সহ্য করতে থাকব? আমার ইজ্জত ও বড়ত্বের শপথ! তাকে যদি আমার কোনো তুফানের শাস্তি আক্রমণ করে তাহলে আমি তাকে তার সঙ্গীদের জন্য শিক্ষা আর পরবর্তীদের জন্য শাস্তি বানিয়ে ছাড়ব। পরবর্তীতে আসেফ সোলায়মান (আ)-এর কাছে এলে তিনি তাকে আল্লাহর ওহি সম্পর্কে জানালেন। ঘটনা শুনে সে সেখান থেকে বেরিয়ে এক বালির টিলার উপর অবস্থান নেয়। চেহারা ও হাত আসমানের দিকে তুলে বলে, হে আল্লাহ! আপনি তো আপনি। আর আমি তো আমি।

আপনি যদি আমাকে তওবার তাওফিক না দেন তাহলে আমি তওবা করব কীভাবে? আপনি যদি আমাকে গুনাহ থেকে রক্ষা না করেন তাহলে আমি গুনাহ থেকে বাঁচব কীভাবে? আল্লাহ তাআলা ওহি পাঠালেন, আসেফ! তুমি সত্য বলেছ। তুমি তুমি আর আমি আমি। তুমি তওবা করো, আমি তওবা কবুল করব। আমি তওবা কবুলকারী ও দয়ালু। (কূতুল কুলূব : ২ : ৬৫)

এক হাদিসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে বাঁচানোর জন্য ওহি পাঠালেন, সে গুনাহর কারণে ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাকে বললেন, তুমি আমার সামনে এমন অনেক গুনাহ করেছ, যা আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। অথচ এর চেয়েও কম গুনাহর কারণে আমি কিছু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। (কূতুল কুলূব : ২ : ৬৬)

মোটকথা, বান্দার শ্রেষ্ঠত্ব, অগ্রপশ্চাত ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ হলো আল্লাহর রীতি। কুরআনে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনার কারণ হলো, মানুষ যেন এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী উম্মতের ব্যাপারে আল্লাহর রীতি ও আচরণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। কুরআনের প্রত্যেক আয়াতেই রয়েছে হেদায়াত, নূর ও আল্লাহর পরিচয়। কখনো আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে নিজ সত্তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ. اَللّٰهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ. وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

(হে নবী!) বলুন, তিনিই একক আল্লাহ। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি; এবং তাঁর সমতুল্যও কেউ নেই। (সূরা ইখলাস : ১-৪)

কখনো নিজ সিফাতে জালালের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ.

তিনিই অধিপতি, পবিত্র, শান্তি, নিরাপত্তাবিধায়ক, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। (সূরা হাশর : ২৩)

কখনো নিজের ওই সকল কাজের বর্ণনা দিয়েছেন, যা ভয় ও আশা বহন করে এবং মানুষকে এর মাধ্যমে তাঁর নবীগণ ও শত্রুর সাথে আচরণের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ.

আপনি কি দেখেননি, আপনার প্রতিপালক কী আচরণ করেছিলেন আদ সম্প্রদায়ের প্রতি, ইরাম গোত্রের প্রতি—যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের? (সূরা ফাজর : ৬-৭)

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ.

আপনি কি দেখেননি, আপনার প্রতিপালক হস্তীবাহিনীর সাথে কী আরচণ করেছেন? (সূরা ফিল : ১)

পবিত্র কুরআনে এ তিন প্রকার বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা, তাঁর সত্তার পবিত্রতা, গুণাবলি ও পবিত্র নামসমূহের পরিচয় অথবা বান্দার সাথে তাঁর আচরণরীতির বর্ণনা।

সূরা ইখলাসে এ তিন প্রকারের একটি অন্তর্ভুক্ত। আর তা হলো তাকদীস তথা পবিত্রতা। একারণেই রাসূলুল্লাহ (স) সূরা ইখলাসকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ বলেছেন। হাদিসে আছে,

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْإِخْلَاصِ فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ.

যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস পাঠ করল, সে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করল। (জামে তিরমিযি : ২৮৯৬)

সূরা ইখলাস আল্লাহ তাআলার পবিত্রতার পরিপূর্ণ পরিচায়ক। কারণ, পরিপূর্ণ পবিত্রতা হলো তিনটি বিষয়ে একক হওয়া। এক. তাঁর কোনো সদৃশ না হওয়া। لَمْ يَلِدْ (তিনি কাউকে জন্ম দেননি) আয়াতটি একথা প্রমাণ করে। দুই. তিনি নিজে তাঁর সদৃশ থেকে সৃষ্টি না হওয়া।

وَلَمْ يُوْلَدْ (তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি) আয়াতটি একথা প্রমাণ করে এবং তিন. কেউ তাঁর স্তরের না হওয়া।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ (তাঁর সমতুল্যও কেউ নেই।) আয়াতটি একথাই প্রমাণ করে। আর এ তিনটি বিষয় قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ একক) এ আয়াতে রয়েছে। মূলত সূরা ইখলাস কালেমা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর ব্যাখ্যা।

এটাই কুরআনের রহস্যাবলি। এধরনের অগণিত উদাহরণ কুরআনে রয়েছে।

وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ.

রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে (লাওহে মাহফুজে) নেই। (সূরা আনআম : ৫৯)

একারণেই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, তোমরা কুরআন নিয়ে গবেষণা করো, এর বিস্ময়কর বিষয়সমূহ অনুসন্ধান করো। কারণ, এতে রয়েছে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ইলম। (আল মুজামুল কাবীর, তাবারানী : ৯ : ১৩৫)

তাঁর বক্তব্য যথার্থ। যে ব্যক্তি কুরআনের এক একটি কালেমা গভীর চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে পড়বে এবং তা বোঝার চেষ্টা করবে, আর তার বোধশক্তি স্বচ্ছ হবে তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, কুরআনের প্রত্যেকটি বাক্য মহা প্রতাপশালী ও মহা শক্তিধর আল্লাহরই কালাম এবং তা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে।

কুরআনের অধিকাংশ রহস্য ঘটনা ও বর্ণনার মাঝে লুক্কায়িত। তোমার তা অনুসন্ধানে আগ্রহী হওয়া উচিত। যাতে করে তোমার কাছে ওই সকল বিস্ময়কর বিষয় প্রকাশ পায়, যার সামনে দুনিয়ার সকল জ্ঞান তুচ্ছ মনে হয়।

রিযার স্বরূপ

রিযা তথা আল্লাহর সফয়সালার ওপর সন্তুষ্টি মহব্বতের অন্যতম ফল এবং নৈকট্যশীলদের একটি উচ্চতম মকাম। এর স্বরূপ অনেকেরই অজানা। আল্লাহ তাআলা যাদের যথার্থ জ্ঞান ও বোধশক্তি দান করেছেন, তারাই এর সামঞ্জস্য ও অস্পষ্টতার সমাধান ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম।

কিছু লোক রিযাকে অস্বীকার করে। কারণ, প্রবৃত্তির বিপরীত বিষয়ের ওপর সন্তুষ্ট থাকাকে তারা মেনে নিতে পারে না। তারা বলে, যদি সব বিষয়ে আমরা সন্তুষ্ট থাকি তাহলে তো কুফর ও গুনাহর ওপরও সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কারণ, সবই তো আল্লাহর ক্রিয়া।

কিছু নির্বোধ লোক এ কথায় ধোঁকা খেয়ে যায়। তারা মনে করে, পাপাচারে সন্তুষ্ট থাকা এবং কুফর ও গুনাহ থেকে বিরত না থাকাও রিযা।

এটা মূলত আল্লাহর রহস্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। যদি এ রহস্য বাহ্যিক আহকাম শ্রবণের মাধ্যমে মানুষের কাছে উন্মোচিত হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ (স) ইবনে আব্বাস (রা)-এর জন্য নিম্নোক্ত দুআ করতেন না।

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ.

হে আল্লাহ! আপনি তাকে দীনের জ্ঞান ও কুরআনের ব্যাখ্যার জ্ঞান দান করুন। (মুসনাদে আহমদ : ২৩৯৭)

রিযার ফযিলত

রিযার ফযিলত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত :

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ.

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। (সূরা মায়েদা : ১১৯)

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ.

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কী হতে পারে? (সূরা আর রহমান : ৬০)

চূড়ান্ত অনুগ্রহ হচ্ছে বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। এটা তখনই হয়, যখন বান্দা আল্লাহ তাআলার প্রতি সন্তুষ্ট হয়।

وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ.

তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন চিরস্থায়ী জান্নাতের উৎকৃষ্ট বাসস্থানের। (সবকিছুর চেয়ে) আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ। (সূরা তাওবা : ৭২)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজের সন্তুষ্টিকে বসবাসের জান্নাত থেকে বৃহৎ বলেছেন। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিই জান্নাতবাসীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে মুমিনদের জন্য জ্যোতি বিকিরণ করবেন এবং বলবেন, আমার কাছে প্রার্থনা করো। মুমিনরা আরয করবে, আমরা আপনার রিযা চাই। (মুজামে আওসাত, তাবারানী : ২১০৫) দীদারের পর এই রিযা প্রার্থনা করা থেকে রিযার অসাধারণ ফযিলত জানা যায়।

আল্লাহ তাআলার প্রতি বান্দার সন্তুষ্টির ব্যাখ্যা পরে উল্লিখিত হবে। এখানে বান্দার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এর অর্থ বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বতের অর্থের কাছাকাছি, যা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এর স্বরূপ সম্পূর্ণ উন্মোচিত করা জায়েয নয়। কারণ, এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি অপারগ। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করতে সক্ষম, তাকে অন্যের বলে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। সে নিজে নিজেই এর স্বরূপ জেনে নেয়।

সারকথা : আল্লাহ তাআলার দীদারের চেয়ে বড় কোনো মর্তবা নেই। দীদার লাভের পর জান্নাতীরা যে রিযা প্রার্থনা করেছে, তার কারণ রিযা হলো স্থায়ী দীদারের উপায়। তাই তারা রিযা প্রার্থনা করে যেন এটাই প্রার্থনা করেছে যে, আমাদের দীদার স্থায়ী হোক।

وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ.

আমার নিকট রয়েছে আরও অধিক। (সূরা ক্বফ : ৩৫)

আল্লাহ তাআলার এই উক্তির তাফসীর প্রসঙ্গে জনৈক তাফসীরকার লিখেন, জান্নাতীদের কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তিনটি উপঢৌকন আসবে। ১. আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে এমন একটি হাদিয়া, যার তুলনা জান্নাতীদের কাছে থাকবে না। এই হাদিয়ার কথা নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে–

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ.

অতএব, কোনো মানুষ জানে না, এমন লোকদের জন্য তাদের কর্মফলস্বরূপ চক্ষু শীতলকারী কত কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে। (সূরা সিজদা : ১৭)

২. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের সালাম। এ হবে প্রথম হাদিয়া থেকে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

سَلٰمٌ ۖ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ.

পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে সম্ভাষণ হবে 'সালাম'। (সূরা ইয়াসিন : ৫৮)

৩. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন– আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটা হাদিয়া ও সালাম উভয়টি থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ اَكْبَرُ.

আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ। (সূরা তাওবা : ৭২)

এ থেকে খোদায়ী সন্তুষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব জানা গেল।

রিযা সম্পর্কে হাদিসের বাণী : বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) একদল সাহাবিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী? তারা বললেন, আমরা ঈমানদার। তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমাদের ঈমানের লক্ষণ কী? তারা বললেন, আমরা বিপদাপদে সবর করি, স্বাচ্ছন্দ্যে শোকর করি, আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকি। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, কাবার পালনকর্তার কসম, তোমরা ঈমানদার। (মুজামে আওসাত, তাবারানী : ৯৪২৩)

অন্য এক হাদিসে আছে–

طُوبٰى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ.

অর্থাৎ, মুবারকবাদ সে ব্যক্তিকে, যাকে ইসলামের পথপ্রদর্শন করা হয়, যার রুজি হয় প্রয়োজন পরিমাণে এবং সে তাতে তুষ্ট থাকে। (সহিহ মুসলিম : ১০৫৪; জামে তিরমিযি : ২৩৪৯)

আরও ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ رَضِيَ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللهُ مِنْهُ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الْعَمَلِ.

অর্থাৎ, যে অল্প রিযিকে (আল্লাহর প্রতি) সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ অল্প আমলে তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৯৫৩১)

আরও বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের একদল লোকের প্রতি কৃপা করবেন। তারা তাদের কবর থেকে উড়ে জান্নাতের দিকে যাবে এবং যেভাবে ইচ্ছা সেখানে আনন্দ-উল্লাস করবে। ফেরেশতারা তাদের জিজ্ঞেস করবে, তোমরা কি পুলসিরাত পার হয়ে এসেছ? তারা বলবে, আমরা তো পুলসিরাত দেখিনি। আবার প্রশ্ন করা হবে, তোমরা কি দোযখ দেখেছ? তারা বলবে, আমরা তো কিছুই দেখিনি। ফেরেশতারা বলবে, তাহলে তোমরা কোন নবীর উম্মত? তারা বলবে, আমরা মুহাম্মদ (স)-এর উম্মত। তারা বলবে, আমরা কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, সত্য বলো, দুনিয়াতে তোমাদের আমল কী ছিল? তারা

জবাব দিবে, দুনিয়াতে আমাদের মধ্যে দুটি চরিত্র বিদ্যমান ছিল, যে কারণে আল্লাহ তাআলার কৃপায় আমরা এ মর্তবায় পৌঁছেছি। প্রথমত আমরা যখন একাকী থাকতাম, তখন আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করতে লজ্জাবোধ করতাম। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যা নির্দিষ্ট করতেন, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকতাম। ফেরেশতারা বলবে, তাহলে তো তোমাদের এ অবস্থা হওয়াই উচিত। (কূতুল কুলূব : ২ : ৫৩)

অন্য এক হাদিসে আছে–

يَامَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ اَعْطُوا اللهَ الرِّضَا مِنْ قُلُوْبِكُمْ تَظْفَرُوْا بِثَوَابِ فَقْرِكُمْ وَاِلَّا فَلَا.

অর্থাৎ, হে দরিদ্রশ্রেণি! তোমরা অন্তরের অন্তস্থল থেকে আল্লাহকে সন্তুষ্টি নিবেদন করো। তবেই তোমরা দারিদ্র্যের সওয়াব লাভে সফল হবে। অন্যথায় নয়। (মুসনাদুল ফেরদাউস : ৮২১৬)

একবার বনি ইসরাঈল মূসা (আ)-এর খেদমতে আরয করল– আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের জন্য এমন কোনো কাজের কথা জিজ্ঞেস করুন, যা করলে তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। মূসা (আ) আল্লাহর দরবারে আরয করলেন– ইলাহী! তারা যা বলে তা আপনি শুনেছেন। আদেশ হলো, হে মূসা! তাদের বলে দাও, তারা যেন আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, যাতে আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকি। (কূতুল কুলূব : ২ : ৩৯)

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-ও ইরশাদ করেন–

مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَ اللهِ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنْزِلَةُ اللهِ عِنْدَهُ، فَإِنَّ اللهَ يُنْزِلُ الْعَبْدَ مِنْهُ حَيْثُ أَنْزَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ.

অর্থাৎ, যে পছন্দ করে যে, আল্লাহ তাআলার কাছে তার যে অবস্থান আছে, তা জেনে নেবে, সে যেন দেখে, তার কাছে আল্লাহ তাআলার জন্য কী অবস্থান রয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বান্দাকে নিজের কাছে সে স্তরে রাখেন, যে স্তরে বান্দা নিজের কাছে আল্লাহ তাআলাকে রাখে। (মুসতাদরাকে হাকেম : ১৮২০)

হযরত দাউদ (আ)-এর ঘটনায় বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার অলীদের দুনিয়ার চিন্তা হয় না। কারণ, দুনিয়ার চিন্তা তাদের অন্তর থেকে আমার মুনাজাতের মিষ্টতা নষ্ট করে দেয়। হে দাউদ! আমার অলীগণ আধ্যাত্মিক হবে এটাই আমি পছন্দ করি। আর তারা দুনিয়ার চিন্তায় বিষণ্ন হবে না। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪০)

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আ) আরয করলেন, হে আল্লাহ! আমাকে এমন কর্ম বলে দিন, যার মধ্যে আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে, যেন আমি সে কাজ করে আপনার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। তখন আল্লাহ তাআলা ওহি পাঠিয়ে বললেন, আমার সন্তুষ্টি তোমার অপছন্দের মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার মন উদ্বুদ্ধ হয় না তাতে তুমি ধৈর্য ধরতে পারো না। মূসা (আ) আরয করলেন, হে আল্লাহ! সেটা কোন বিষয়? আমাকে বলুন। আল্লাহ তাআলা বললেন, আমার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকার মধ্যেই আমার সন্তুষ্টি রয়েছে।

মূসা (আ) তাঁর মুনাজাতে আরয করলেন– ইলাহী! আপনার সৃষ্টির মধ্যে কে আপনার কাছে সর্বাধিক প্রিয়? ইরশাদ হলো, যার কাছ থেকে আমি তার প্রিয়বস্তু নিয়ে নিলে সে আমার সাথে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ রাখে। মূসা (আ) আরয করলেন– সে ব্যক্তি কে, যার প্রতি আপনি অসন্তুষ্ট হন? ইরশাদ হলো, যে কোনো কাজে আমার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করে, এরপর যখন আমি আদেশ দিয়ে দেই, তখন সে নাখোশ হয়। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪১)

অন্য এক রেওয়ায়াতে আরও কঠোরতা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন– আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। যে ব্যক্তি আমার দেওয়া মুসিবতে সবর করে না, আমার নেয়ামতের শোকর করে না এবং আমার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকে না, তার উচিত আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বানিয়ে নেওয়া। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪১)

এরই অনুরূপ একটি হাদিসে কুদসী রাসূলুল্লাহ (স) থেকেও বর্ণিত আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তাকদীর নির্ধারণ করেছি এবং কাজকর্ম সংহত করেছি। এখন যে সন্তুষ্ট হবে, তার প্রতি আমি সন্তুষ্ট আমার সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত, আর যে অসন্তুষ্ট হবে, তার জন্য আমার অসন্তুষ্টি আমার কাছে আসা পর্যন্ত। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪১)

অন্য এক হাদিসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে, আমি কল্যাণ ও অকল্যাণ সৃষ্টি করেছি। সুসংবাদ সে ব্যক্তির জন্য, যাকে আমি কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং কল্যাণের পথে পরিচালিত করি। আর সে ব্যক্তি মন্দ, যাকে আমি অমঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং অমঙ্গলের পথে পরিচালিত করি। সে ব্যক্তির জন্য ধ্বংসই ধ্বংস, যে বলে, কেন? কীভাবে? অর্থাৎ বিতর্ক ও প্রশ্ন করে। (শরহুস সুন্নাহ, ইবনে শাহীন)

পূর্ববর্তী উম্মতের ঘটনায় বর্ণিত আছে, এক নবী দশ বছর পর্যন্ত ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও উকুনের অভিযোগ করে আসছিলেন, কিন্তু এতে কোনো কাজ হয়নি। এরপর আল্লাহ ওহি পাঠালেন, তুমি কত দিন এভাবে অভিযোগ করবে? আসমান-জমিন সৃষ্টির পূর্বে লওহে মাহফুজে তোমার বিষয়টি এভাবেই রয়েছে। আমি দুনিয়া সৃষ্টির পূর্বে তোমার বিষয়ে এভাবেই ফয়সালা করেছি। এখন কি তুমি চাচ্ছ যে, তোমার জন্য দুনিয়া পুনরায় সৃষ্টি করব অথবা তোমার ভাগ্যে আমি যা কিছু নির্ধারণ করেছি তা পরিবর্তন করব? আর তোমার পছন্দ আমার পছন্দের চেয়ে উত্তম হবে? এবং তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছার চেয়ে বড় হবে? আমার ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম! যদি তোমার অন্তরে এমন ধারণা আসে তাহলে আমি তোমার নাম নবীদের তালিকা থেকে মুছে দিব। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪১)

বর্ণিত আছে, হযরত আদম (আ)-এর এক ছোটো ছেলে তাঁর শরীর নিয়ে খেলা করতো। অর্থাৎ, তাঁর পাজরের উপর সিড়ির মতো পা রেখে মাথা পর্যন্ত যেত আবার পিছনে ফিরে আসতো। আর তিনি মাথা নিচু করে বসে থাকতেন, কিছু বলতেন না। তখন তাঁর অন্য ছেলে বলল, বাবা! ওর এমন কাজে আপনি নিষেধ করছেন না কেন? আদম (আ) বললেন, আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না। আর আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। আমার কেবল একটি কর্মের কারণে আমাকে সম্মান ও সৌভগ্যের স্থান থেকে লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্যের স্থানে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমার ভয় হলো, এমন কোনো কাজ করে ফেলি যার পরিণামে কোনো অজানা মুসিবতে পতিত হই। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪১)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি দশ বছর রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমত করেছি। এ সময়ের মধ্যে আমি কোনো কাজ করলে তিনি কখনো বলেননি, কেন করেছ। আমি কোনো কাজ না করলে তিনি

বলেননি, কেন করোনি। কোনো কিছু হয়ে গেলে তিনি বলেননি, যদি এটা না হতো। আর কোনো কিছু না হলেও তিনি বলেননি, যদি এটা হতো। তাঁর পরিবারের কেউ আমার সাথে ঝগড়া করলে বলতেন, তার সাথে ঝগড়া করো না। কোনো কিছুর ফয়সালা হয়ে গেলে তা হবেই। (সহিহ বুখারী : ৬০৩৮; সহিহ মুসলিম : ২৩০৯)

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (আ)-এর কাছে ওহি পাঠালেন, হে দাউদ! তুমি বাসনা করো, আমিও বাসনা করি; কিন্তু হবে তা-ই, যা আমি বাসনা করি। যদি তুমি আমার বাসনায় সন্তুষ্ট থাকো, তবে তোমার বাসনার জন্য আমি যথেষ্ট হব। পক্ষান্তরে যদি তুমি আমার বাসনা অমান্য করো, তবে তোমার বাসনায় আমি তোমাকে পরিশ্রমে ফেলে দেব, এরপর হবে তা-ই যা আমি চাইব। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৯ : ৬৫৩)

রিযা সম্পর্কে মনীষীদের বাণী : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, প্রথম যাদের জান্নাতে ডাকা হবে, তারা হবে এমন লোক, যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে। (মুসতাদরাকে হাকেম : ১ : ৫০২) অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে।

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র) বলেন, আল্লাহ তাআলার হুকুম ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে আমার আনন্দ লাভ হয় না। কেউ তাকে প্রশ্ন করল, আপনি কীসের প্রতি আগ্রহী? তিনি বললেন, আল্লাহর হুকুমের প্রতি।

মায়মূন ইবনে মিহরান (র) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট হয় না, তার নির্বুদ্ধিতার কোনো প্রতিকার নেই। (তাহযীবুল আসরার : ২০৯)

আবদুল আযিয ইবনে আবু রোয়াদ (র) বলেন, সিরকা দিয়ে যবের রুটি খাওয়া ও পশমী পোশাক পরার মধ্যে জাঁকজমক নেই; বরং জাঁকজমক হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকার মধ্যে। (তারিখে দিমাশক : ২৩ : ১৩৬)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, কোনো ঘটে যাওয়া বিষয়ে আমার একথা বলা যে, যদি তা না হতো অথবা ঘটেনি এমন বিষয়ে বলা যে, যদি

তা ঘটতো-এর চেয়ে আমার মুখে জ্বলন্ত অঙ্গার রেখে দেওয়া আমার কাছে উত্তম। চাই তা আমার মুখের কিছু অংশ পুড়িয়ে দিক অথবা কিছু অংশ ছেড়ে দিক। (যুহদ, ইবনুল মুবারক : ১২২)

এক ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসের পায়ে যখম দেখে বলল, এই যখমের কারণে আপনার প্রতি আমার করুণা হয়। তিনি বললেন, এই যখম হওয়ার পর থেকে আমি আল্লাহ তাআলার শোকর করছি যে, এটা আমার চোখে হয়নি। (হিলইয়াতুল আউলিয়া : ২ : ৩৫২)

বনি ইসরাঈলের কাহিনিতে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি দীর্ঘদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে। তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয় যে, অমুক মহিলা– যে ছাগল চরায়, সে জান্নাতে তোমার সঙ্গিনী হবে। আবেদ পর দিন সেই মহিলার খোঁজে বের হলো এবং লোকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার সন্ধান পেল। সে মহিলার আমল দেখার উদ্দেশ্যে তিন দিন তার বাড়িতে অবস্থান করল। এ সময় আবেদ নিজে সারারাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করতো; কিন্তু মহিলা আরামে ঘুমিয়ে থাকত। দিনের বেলায় আবেদ রোযা রাখত, আর মহিলা পানাহার করতো। একদিন আবেদ তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার এ ছাড়া আরও কোনো আমল আছে কি? মহিলা বলল, আর কিছু নেই। আপনি যা দেখেছেন, তাই। আমি নিজের মধ্যে অন্য কোনো আমল জানি না। আবেদ বলল, ভালো করে স্মরণ করে বলো, আরও কোনো আমল আছে কি-না? মহিলা বলল, হ্যাঁ, আমার মধ্যে আর একটি ছোটোখাটো অভ্যাস আছে। তা এই যে, আমি সংকটে পড়ে কোনো সময় বাসনা করি না যে, আমার অবস্থা আরও ভালো হোক। রুগ্ন হয়ে আশা করি না যে, সুস্বাস্থ্য ফিরে আসুক। যদি রোদে থাকি, তবে ছায়ার প্রত্যাশী হই না। এ কথা শুনে আবেদ নিজের মাথায় হাত রেখে বলল, এটা ছোটোখাটো অভ্যাস নয়; বরং এতই বড়, যা অর্জন করতে আবেদ অক্ষম। (কূতুল কুলূব : ২ : ৩৯)

এক সাধক বলেন, যখন আল্লাহ তাআলা আসমানে কোনো ফয়সালা করেন তখন তিনি চান, দুনিয়াবাসী যেন তার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকে।

আবুদ দারদা (রা) বলেন, ঈমানের চূড়ান্ত পর্যায় হলো, আল্লাহর ফয়সালায় সবর করা ও তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকা।

হযরত ওমর (রা) বলেন, আমি রাতদিন কষ্টে কাটাই না স্বাচ্ছন্দ্যে, সে বিষয়ে আমার কোনো খেয়াল নেই। (রিআয়া : ২৬৯)

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, একদিন আমি রাবেয়া বসরী (র)-এর সামনে দুআ করলাম, হে আল্লাহ! আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। তখন রাবেয়া বসরী বললেন, আল্লাহর কাছে সন্তুষ্টি চাইতে তোমার লজ্জা করে না, যখন তুমি নিজেই সন্তুষ্ট নও? তখন সুফিয়ান সাওরী (র) বললেন, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

জাফর ইবনে সুলায়মান রাবেয়া বসরীকে প্রশ্ন করলেন : বান্দা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট- একথা কখন বলা যায়? তিনি বললেন, যখন বিপদেও ততটুকু খুশি হয়, যতটুকু নেয়ামত পেয়ে হয়। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪০)

ফুযায়ল ইবনে আয়ায (র) বলতেন– আল্লাহ তাআলার দেওয়া না দেওয়া উভয়ই যখন বান্দার কাছে সমান হয়ে যায়, তখন সে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪০)

আহমদ ইবনে আবুল হাওয়ারী (র) বলেন, আবু সুলায়মান দারানী (র) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগ্রহে নিজ বান্দার প্রতি ওই কারণে সন্তুষ্ট হন, যে কারণে গোলাম তার মনিবের প্রতি সন্তুষ্ট হয়। আহমদ ইবনে আবুল হাওয়ারী জিজ্ঞেস করলেন, এটা কীভাবে সম্ভব? তিনি বললেন, দুনিয়াতে গোলাম কি চায় না যে, মনিব তার প্রতি খুশি থাকুক? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলাও চান, তাঁর বান্দারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুক। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪০)

হযরত সাহল তস্তরী (র) বলেন, বান্দার ওই পরিমাণ একীন অর্জন হয়, যে পরিমাণ সে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪১)

নবী কারীম (স) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالٰى بِقِسْطِهٖ وَعَدْلِهٖ جَعَلَ الرَّوْحَ وَالْفَرْحَ فِى الرِّضَا وَ الْيَقِيْنِ وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِى السَّخْطِ.

আল্লাহ তাআলা তাঁর ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে শান্তি ও আনন্দকে রিযা ও একীনের মাঝে রেখেছেন আর দুঃখ ও বিষণ্নতাকে রেখেছেন অসন্তুষ্টির মধ্যে। (মুজামে কাবীর, তাবারানী : ১০৫১৪)

রিযার হাকীকত

যে ব্যক্তি বলে, প্রবৃত্তির বিপরীত বিষয় ও বিপদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে শুধু সবর করাই সম্ভব; রিযা সম্ভব নয়। সে মূলত মহব্বতকে অস্বীকার করে। সুতরাং যখন আল্লাহর মহব্বত সাব্যস্ত হলো এবং এ বিষয়টি স্পষ্ট হলো যে, মানুষ তার পূর্ণ আগ্রহের সাথে আল্লাহর মহব্বতে নিমগ্ন হতে পারে তখন এ বিষয়টিও স্পষ্ট যে, মহব্বতকারী তার মাহবুবের প্রত্যেক কাজ ও কথার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য। আর এ রিযা বা সন্তুষ্টি দুভাবে হতে পারে।

১. ব্যথা অনুভব না হওয়া। এমনকি যদি কোনো আঘাত পায় তাহলে সে একেবারেই কষ্ট ও ব্যথা অনুভব করবে না। এর উদাহরণ হলো, কোনো যোদ্ধা যখন ক্রোধ অথবা ভয়ের অবস্থায় লড়াই করে আর তার দেহ আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখন সে ওই আঘাত একটুও অনুভব করে না। বরং আঘাতের বিষয়টি তার খেয়াল থাকে না। পরবর্তীতে যখন সে আঘাতের রক্ত দেখে তখন আঘাতের বিষয়টি বুঝতে পারে। তাছাড়া যে ব্যক্তি কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে আর তার পায়ে কাঁটা ইত্যাদি বিঁধে যায় তখন সে ব্যস্ততার কারণে এর ব্যথা অনুভব করতে পারে না। এমনিভাবে শিঙ্গা লাগানো ও চুল উপড়ানোর সময় প্রচণ্ড ব্যথা হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকে আর সে সময় এ কাজ করা হয় তখন অন্তর ব্যস্ত থাকায় এর ব্যথা অনুভব হয় না। এর কারণ হলো, মানুষের মন যখন কোনো কাজে পরিপূর্ণভাবে লিপ্ত হয়ে যায় তখন সে কাজ ব্যতীত অন্য কিছু তার অনুভব হয় না। এমনই অবস্থা ওই আশেকের, যে তার মাহবুবের মহব্বত অথবা তার মুশাহাদায় পরিপূর্ণভাবে লিপ্ত থাকে। সে যদি ওই মহব্বতে নিমগ্ন না হতো তাহলে তাকে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হতো। যদি অন্তরে মহব্বতের তীব্রতা থাকে তাহলে কোনো দুঃখ-ব্যথা অনুভব হয় না। যখন মাহবুব ব্যতীত অন্য কারও দুঃখ অনুভব হয় না তখন মাহবুবের দেওয়া ব্যথা কীভাবে অনুভব হতে পারে?

মহব্বতের ব্যস্ততা অনেক বড় ব্যস্ততা। যখন সাধারণ মহব্বতে সাধারণ ব্যথা অনুভব হয় না তখন বড় মহব্বতে বড় ব্যথাও অনুভব হবে না। যেভাবে ব্যথা বেশি হওয়া সম্ভব, মহব্বতও বেশি হওয়া সম্ভব। যেভাবে

চর্মচক্ষুর মাধ্যমে দেখা সুন্দর বস্তুর প্রতি মহব্বত বেশি হয়ে থাকে তেমনি ওই মহব্বতও প্রবল হয়ে থাকে, যা অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে অভ্যন্তরের সৌন্দর্য দেখার ফলে সৃষ্টি হয়। আল্লাহর সৌন্দর্য ও বড়ত্বের সাথে অন্য সৌন্দর্য ও বড়ত্বের তুলনা করা চলে না। আল্লাহর সৌন্দর্য ও বড়ত্বের সামান্য পরিমাণ যদি কারও কাছে প্রকাশ পায় তাহলে সে হতবুদ্ধি ও দিশেহারা হয়ে যায়। ফলে তার সাথে ঘটে যাওয়া কোনো কিছুই সে অনুভব করতে পারে না।

বর্ণিত আছে, ফাতাহ মুসেলির স্ত্রী একবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে তার পায়ের নখ উপড়ে যায়; কিন্তু তিনি হাসলেন। তাকে একজন জিজ্ঞেস করল, তুমি কি ব্যথা পাওনি? তিনি বললেন, এর সওয়াবের আনন্দ ব্যথার অনুভূতিকে দূর করে দিয়েছে। (আল মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম : ৫১৯)

সাহল তস্তরী (র)-এর এক ব্যাধি ছিল। তিনি অন্যের চিকিৎসা করতেন; কিন্তু নিজের চিকিৎসা করতেন না। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, বন্ধু! মাহবুবের আঘাতে ব্যথা অনুভব হয় না। (কূতুল কুলূব : ২ : ৬৭)

২. কষ্ট-ব্যথা অনুভব হওয়া; কিন্তু ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট থাকে। বরং এর প্রতি আগ্রহী থাকে। আর এ আগ্রহ তার আকলের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যদিও তার মন তা পছন্দ না করে। বিষয়টি এমন যে, কোনো ব্যক্তি নষ্ট রক্ত বের করার জন্য শিঙ্গা লাগাতে চায় আর এ কাজে ব্যথা পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সে এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট ও আগ্রহী থাকে এবং যে শিঙ্গা লাগিয়ে দেয় তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে।

এমন অবস্থা ওই ব্যক্তিরও হয়ে থাকে, যে কষ্টের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকে। উপকার লাভের জন্য সফরকারী সফরের কষ্টও সহ্য করে। সফরের কষ্ট তার অনুভব না হওয়ার কারণ হলো, সফরের মাধ্যমে অর্জিত ফল তার কাছে অধিক প্রিয়। তাই সে সকল কষ্টের ব্যাপারে সন্তুষ্ট। এমনই অবস্থা ওই বান্দার, যার ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো বিপদ আসলে সে এ বিশ্বাস করে যে, এর বিনিময়ে তাকে যে সওয়াব দান করা হবে তা অনেক বেশি হবে। একারণে এ বিপদে সন্তুষ্ট থাকে। এর প্রতি আগ্রহী থাকে, বরং এ বিপদকে পছন্দ করে এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করে। এটা ওই ক্ষেত্রে হবে যখন বান্দা বিপদের বিনিময়ে প্রাপ্ত সওয়াবের প্রতি আগ্রহী হবে।

মহব্বত এ পরিমাণ প্রবল হতে পারে যে, মাহবুবের রিযা হাসিল করাই মহব্বতকারীর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অন্য কিছু হাসিলের উদ্দেশ্য থাকে না। তখন মাহবুবের রিযাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। মাখলুকের মহব্বতে এ সকল বিষয় বিদ্যমান। গুণবর্ণনাকারীগণ তাদের কবিতায় এ সব বিষয় উল্লেখ করেছেন। যা চর্মচক্ষুর মাধ্যমে দেখা বাহ্যিক সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছু নয়।

এ সৌন্দর্য বিশেষ কিছু নয়; বরং তা রক্ত, মাংসের ওপর বিছানো এক চামড়া। যাতে নাপাকিও রয়েছে। যার সূচনা এক বিন্দু নাপাক বীর্যের মাধ্যমে হয়েছে। আর এর সমাপ্তি হবে ময়লা মৃতদেহের আকৃতিতে।

আর এ ব্যক্তি যাকে সৌন্দর্যের অধিকারী বলা হচ্ছে, সে তার পেটে মলমূত্র বহন করে চলেছে।

যদি সৌন্দর্যের অনুভবশক্তি চোখের প্রতি তাকাও তাহলে চোখ এক নিকৃষ্ট বস্তু। যা দেখার ক্ষেত্রে অনেক ভুল করে থাকে। ছোটোকে বড় আর বড়কে ছোটো দেখে। দূরের বস্তুকে কাছে আর কাছের বস্তুকে দূরে দেখে এবং কুৎসিতকে সুন্দর আর সুন্দরকে কুৎসিত দেখে।

যখন দুনিয়ার ধ্বংসশীল সৌন্দর্যে মহব্বতের এমন প্রবলতা হতে পারে তখন চিরন্তন ও চিরস্থায়ী সৌন্দর্যের মহব্বতে এমন অবস্থা কেন হবে না? যার পূর্ণতার কোনো শেষ নেই। যা উপলব্ধি করা যায় অন্তর্চক্ষুর মাধ্যমে। যার কোনো ভুল হয় না। মৃত্যুর কারণেও যা মরে না; বরং মৃত্যুর পরও তা আল্লাহর নিকট জীবিত থাকে। আল্লাহর রিজিকে তা প্রাঞ্জল থাকে এবং মৃত্যুর মাধ্যমে তার অধিক সতর্কতা ও অনুসন্ধানী আগ্রহ অর্জন হয়।

এবিষয়টি যদি চোখের দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহলে তা স্পষ্ট। মহব্বতকারীদের বাণী, অবস্থা ও ঘটনা এর প্রমাণ।

যেমন হযরত শাকীক বলখী (র) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিপদে সওয়াব মনে করে, সে তা থেকে পরিত্রাণ চায় না।

জুনাইদ বাগদাদী (র) বলেন, আমি সিররী সিকতীকে জিজ্ঞেস করলাম, মহব্বতকারী কি বিপদে কষ্ট পায়? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, যদি তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করা হয় তবুও? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যদিও তাকে সত্তরবার তরবারি দ্বারা আঘাত করা হয় এবং আঘাতের পর আঘাত করা হয় তবুও।

এক বুযুর্গ বলেন, মাহবুবের যা পছন্দ, আমারও তাই পছন্দ। সে যদি আগুন পছন্দ করে তাহলে আমিও আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

বিশর ইবনে হারিস (র) বলেন, একদিন পূর্ব বাগদাদের এক এলাকায় এক ব্যক্তিকে এক হাজার বেত্রাঘাত করতে দেখলাম। কিন্তু সে কোনো আওয়াজও করল না। এরপর তাকে জেলে পাঠানো হলো। আমি তার পিছু নিলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে মারা হলো কেন? সে বলল, আমি একজন আশেক। আমি বললাম, তুমি চুপ থাকলে কেন? সে বলল, আমার মাশুক আমার চোখের সামনে ছিল। সে আমাকে দেখছিল। আমি বললাম, তুমি যদি সর্বোত্তম মাশুককে দেখতে তাহলে কত ভালো হতো! একথা শুনে সে এক চিৎকার দিয়ে মারা গেল।

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায রাযি (র) বলেন, যখন জান্নাতবাসী আল্লাহর দীদার লাভ করবে তখন দীদাদের আনন্দের কারণে তাদের চোখ তাদের অন্তরে চলে যাবে। আটশ বছর পর্যন্ত তা আর ফিরে আসবে না। যে হৃদয় আল্লাহর সৌন্দর্য ও বড়ত্বের মাঝে ব্যস্ত, তার সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? যখন সে আল্লাহর বড়ত্ব দেখে তখন তার ভয় বেড়ে যায় আর যখন তাঁর সৌন্দর্য দেখে, দিশেহারা হয়ে যায়।

বিশর (র) বলেন, আমি সুলুকের শুরুলগ্নে (ইরানের) আব্বাদান শহরে গেলাম। সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। যে ছিল অন্ধ, কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ও পাগল। মাটিতে পড়ে ছিল আর পিঁপড়া তার গোশত খাচ্ছিল। আমি তার মাথা উঠিয়ে আমার কোলে রাখলাম এবং তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। যখন তার হুঁশ ফিরে এল সে বলল, এ অনর্থক বকবককারী ব্যক্তিটি কে? যে আমার ও আমার রবের মাঝে সমস্যা সৃষ্টি করেছে? যদি আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয় আমার মহব্বত শেষ হবে না; বরং বৃদ্ধি পাবে। বিশর (র) বলেন, এরপর থেকে যখন আমি

কোনো বান্দা ও তার রবের মাঝে এমন নেয়ামতপূর্ণ অবস্থা দেখতাম তাকে খারাপ মনে করতাম না। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪৩)

আবু আমর মুহাম্মদ ইবনুল আশআস (র) বলেন, মিসরবাসী চার মাস পর্যন্ত হযরত ইউসুফ (আ)-এর চেহারার প্রতি তাকিয়ে থাকত। যেন ইউসুফ (আ)-এর সৌন্দর্য তাদের ক্ষুধার যন্ত্রণা দূর করে দিয়েছিল। কুরআন এর চেয়েও বড় ব্যাখ্যা দিয়েছে যে, নারীরা তাঁর সৌন্দর্য দেখে মনের অজান্তে নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল। অথচ তারা তা অনুভবও করেনি।

সাঈদ ইবনে ইয়াহইয়া (র) বলেন, আমি বসরায় অবস্থিত আতা ইবনে মুসলিমের খানকায় এক যুবককে দেখলাম, তার হাতে একটি বড় ছুরি ছিল। লোকেরা তার আশেপাশে ভিড় করেছিল আর সে চিৎকার করে বলছিল,

يَوْمَ الْفِرَاقِ مِنَ الْقِيَامَةِ أَطْوَلُ - وَالْمَوْتُ مِنْ أَلَمِ التَّفَرُّقِ أَجْمَلُ.

قَالُوْا الرَّحِيْلُ فَقُلْتُ لَسْتُ بِرَاحِلٍ - لٰكِنَّ مُهْجَتِيَ الَّتِيْ تَتَرَحَّلُ.

বিচ্ছেদের দিন কেয়ামতের চেয়ে দীর্ঘ। আর মৃত্যু বিচ্ছেদের যন্ত্রণার চেয়ে উত্তম। লোকে বলে মৃত্যু আর আমি বলি মৃত্যু নয়; বরং আমার আত্মা ভ্রমণ করে। (তাযয়ীনুল আসওয়াক : ১৩৮)

অতঃপর ওই যুবক ছুরিটি তার পেটে ঢুকিয়ে দিল এবং মারা গেল। আমি উপস্থিত লোকদেরকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, এ ব্যক্তি অমুক বাদশাহর এক গোলামের আশেক ছিল। একদিন সে চলে গেল এরপর থেকে তার এ অবস্থা। (যামমুল হাওয়া, ইবনুল জাওযী : ১১২৫)

বর্ণিত আছে, হযরত ইউনুস (আ) একবার জিবরাঈল (আ)-কে বললেন, আমাকে এমন ব্যক্তির ঠিকানা বলুন, যে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি ইবাদতগুজার। তখন জিবরাঈল (আ) এমন এক ব্যক্তির কথা বললেন, যার উভয় হাত-পা কুষ্ঠরোগে ছেঁয়ে গেছে এবং চোখও নষ্ট হয়ে গেছে।

ইউনুস (আ) ওই ব্যক্তির কাছে পৌঁছলে তাকে বলতে শুনলেন, হে আল্লাহ! আপনি যা চেয়েছেন আমাকে দিয়েছেন এবং যা চেয়েছেন ছিনিয়ে নিয়েছেন আর আমার জন্য আপনার আশা অবশিষ্ট রেখেছেন। হে পরম দানশীল! হে পরম দাতা! (আর রিযা আনিল্লাহ বিকাযায়িহি : ২৫)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর এক ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ল। এতে তিনি খুব ভেঙে পড়লেন। তাঁর অবস্থা দেখে লোকেরা তাঁর ব্যাপারে বিপদের আশঙ্কা করল। এক পর্যায়ে ছেলেটি মারা গেল। ইবনে ওমর (রা) তাঁর ছেলের জানাযার জন্য যাচ্ছিলেন, তখন তাকে উপস্থিত সকলের চেয়ে আনন্দিত দেখাচ্ছিল। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তার অসুস্থতায় তার প্রতি আমার দয়া হচ্ছিল, তাই আমি বিষণ্ন ছিলাম আর যখন আল্লাহর আদেশ চলে এল তখন আমি এর প্রতি সন্তুষ্ট হলাম। (আর রিযা আনিল্লাহ বিকাযায়িহি : ৯৮)

মাসরূক (র) বলেন, এক জঙ্গলে এক লোক বসবাস করতো। তার ছিল একটি মোরগ, গাধা ও একটি কুকুর। মোরগ তাকে নামাযের জন্য ঘুম থেকে জাগাত। গাধা পানি ও সরঞ্জাম বহন করতো আর কুকুর তার পাহারার কাজ করতো। একদিন এক শিয়াল এসে তার মোরগটিকে ধরে নিয়ে গেল। এতে তার পরিবারের লোকজন কষ্ট পেল। কিন্তু লোকটি ছিল নেক বান্দা। সে বলল, মনে হয় এতে কোনো কল্যাণ রয়েছে। এরপর একদিন একটি নেকড়ে এসে গাধাটিকে মেরে ফেলল। এতে লোকটির পরিবার খুব কষ্ট পেল; কিন্তু লোকটি ওই একই কথা বলল। কিছুদিন পর কুকুরটিও মারা গেল। এতেও তার পরিবার কষ্ট পেল। কিন্তু লোকটি একই কথা বলল, মনে হয় এতে কোনো কল্যাণ রয়েছে। একদিনের ঘটনা, সকালবেলা সে ও তার পরিবার দেখল, তাদের আশপাশে বসবাসরত পরিবারগুলোকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাদের গৃহপালিত পশুর আওয়াজের কারণে তাদের খোঁজ পাওয়া গেছে। কিন্তু এ ব্যক্তির সব পশুই তো শেষ হয়ে গেছে ফলে কোনো আওয়াজ না হওয়ায় তাদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। (আর রিযা আনিল্লাহ বিকাযয়িহি : ২৮)

এর দ্বারা বোঝা গেল, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার গোপন অনুগ্রহ সম্পর্কে জানে, সে সর্বাবস্থায় তাঁর কাজে সন্তুষ্ট থাকে।

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আ) এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, লোকটি ছিল অন্ধ, কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত এবং তীরের আঘাতে তার উভয় পার্শ্ব অকেজো। কুষ্ঠরোগের কারণে তার দেহের গোশত খসে পড়ছিল। এত কিছুর পরও লোকটি বলছিল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে এমন

অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন, যে বিপদে তাঁর বহু বান্দা নিপতিত। ঈসা (আ) তাকে বললেন, এমন কোন বিপদ তোমার নেই, বলো তো? লোকটি বলল, হে আল্লাহর রুহ (ঈসা)! আমি ওই লোকদের চেয়ে উত্তম, যাদের অন্তরে আল্লাহ তাঁর মারেফাত দান করেননি; কিন্তু তিনি আমাকে দান করেছেন। নবী বললেন, তুমি ঠিক বলেছ। এখন তোমার হাতটি দাও। লোকটি তার হাত নবীর হাতে রাখলেন তখন তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে সে খুব সুন্দর আকৃতির মানুষে পরিণত হয়ে গেল।

আর আল্লাহ তার সকল অসুস্থতাও দূর করে দিলেন। এরপর থেকে ওই ব্যক্তি ঈসা (আ)-এর সাথে থেকে আল্লাহর ইবাদত করতে লাগল।

ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রা) তার একটি পা রান থেকে কেটে ফেলেন। যা ক্ষতের কারণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এর পরও তিনি বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার একটি পা নিয়ে গেছেন। আপনার পবিত্র সত্তার কসম! যদি আপনি নিয়ে নেন তাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, আপনিই তো দিয়েছিলেন। আপনি যদি অসুস্থ করেন, কোনো সমস্যা নেই। কারণ, আপনিই তো সুস্থতা দিয়েছিলেন। সারা রাত তিনি এ দুআই করতে থাকেন। (আল মারাযু ওয়াল কাফফারাত : ১৩৮-১৩৯)

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, স্বচ্ছলতা ও দারিদ্র্য দুটি বাহনের মতো। আমি এ দুটির কোনো একটিতে আরোহন করার ব্যাপারে পরোয়া করি না। যদি দারিদ্র্যের বাহনে আরোহন করি তাহলে ধৈর্য ধরব আর যদি স্বচ্ছলতার বাহনে আরোহন করি তাহলে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করব। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪০)

আবু সোলায়মান দারানী (র) বলেন, আমি প্রত্যেক স্তর থেকে একটি অবস্থা অর্জন করেছি; কিন্তু রিযার স্তর ব্যতীত। সেখানে শুধু বাতাসে ছড়ানো ঘ্রাণ পেয়েছি। এখন যদি আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলুককে জান্নাতে আর আমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান তাহলেও আমি এর প্রতি সন্তুষ্ট। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪২)

এক আরেফকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি রিযার চূড়ান্ত স্তর অর্জন করেছেন? তিনি বললেন, রিযার চূড়ান্ত স্তর অর্জন করিনি তবে রিযার একটি স্তর অর্জিত হয়েছে। এখন যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে

জাহান্নামের পুল বানান আর লোকেরা আমার ওপর দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে, অতঃপর তাঁর কসম পূরণ করার জন্য সমস্ত মাখলুকের বিনিময়ে শুধু আমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান তাহলে আমি তাঁর এ ফয়সালা পছন্দ করব এবং এতে সন্তুষ্ট থাকব। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪২)

এটা ওই ব্যক্তির কথা, যে পরিপূর্ণ আগ্রহ অনুরাগ নিয়ে আল্লাহর মহব্বতে নিমগ্ন হয়। এমনকি তার জাহান্নামের আগুনেও কোনো কষ্ট হয় না। যদি কষ্ট অনুবভও হয় তাহলে মাহবুবের সন্তুষ্টি অর্জনের আনন্দের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে যায়। আর এ অবস্থা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। যদিও আমাদের মতো দুর্বল বান্দাদের এর ওপর বিশ্বাস থাকে না। যে ব্যক্তি দুর্বল হৃদয়ের অধিকারী এবং এ ধরনের অবস্থা অর্জনে অক্ষম, তাদের উচিত নয় যারা এক্ষেত্রে সবল ও সক্ষম তাদের অবস্থাকে অস্বীকার করা এবং এ ধারণা করা যে, যে অবস্থা অর্জনে আমরা অক্ষম, আল্লাহর নেক বান্দারাও সেক্ষেত্রে অক্ষম।

রুযবারী (র) বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ ইবনে জালা দামেশকীকে বললাম, এক ব্যক্তি বলেছে, আমি চাই আমার শরীর কাঁচি দিয়ে টুকরো টুকরো করা হোক আর লোকেরা এর আনুগত্য করুক। একথার অর্থ কী? তিনি বললেন, একথা যদি মানুষের উপদেশের উদ্দেশ্যে বলে থাকে তাহলে এর ব্যাখ্যা আমি জানি আর যদি বড়ত্ব ও সম্মানের উদ্দেশ্যে বলে তাহলে এর মর্ম আমার জানা নেই। একথা বলে তিনি বেঁহুশ হয়ে গেলেন। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪২)

ইমরান ইবনে হোসাইন (র) শ্বেত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, ত্রিশ বছর পর্যন্ত শয্যাশায়ী ছিলেন। উঠতে বা বসতে পারতেন না। মলমূত্র ত্যাগের জন্য খাটের পায়া কেটে দেওয়া হয়েছিল। একবার তার কাছে মুতাররিফ ও তার ভাই আবুল আলা এসে তার অবস্থা দেখে কাঁদতে শুরু করলেন। ইমরান ইবনে হোসাইন (র) বললেন, কাঁদছ কেন? তারা বললেন, আপনাকে এমন খারাপ অবস্থায় দেখে কাঁদছি। তিনি বললেন, কেঁদো না। কারণ, আল্লাহ যা পছন্দ করেন, আমিও তা পছন্দ করি। তারপর বললেন, তোমাকে একটা কথা বলি, তোমার উপকারে আসতে পারে। কিন্তু আমার মৃত্যু পর্যন্ত এ কথা কারও কাছে বলবে না। কথাটি হলো, ফেরেশতারা

আমার যিয়ারত করে। আমি তাদের নৈকট্য লাভ করি। তারা আমাকে সালাম দেয়। আমি তাদের সালামের আওয়াজ শুনতে পাই। এর দ্বারা আমি বুঝতে পারি, আমার এ বিপদ শাস্তিস্বরূপ নয়; বরং ওই মহা নেয়ামতের কারণে, যা আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি মুসিবতে এ অবস্থা অবলোকন করে, সে তাতে সন্তুষ্ট হবে না কেন?

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা সুয়াইদ ইবনে মাতআবাকে দেখতে গেলাম। দেখলাম একটি জায়গায় একটি কাপড় পড়ে আছে। আমাদের ধারণা হলো ওই কাপড়ের নিচে কিছু নেই। এক পর্যায়ে ওই কাপড়টি সুওয়াইদ-এর ওপর থেকে সরানো হলো। তার স্ত্রী তাকে বলল, আপনাকে কী খাওয়াব? কী পান করাবো? সুওয়াইদ বললেন, শুয়ে শুয়ে কোমর ব্যথা হয়ে গেছে। নিতম্ব ছুলে গেছে। কয়েক দিন যাবত না খেয়ে খুব দুর্বল হয়ে গেছি। কিন্তু এ অবস্থায় আমি সামান্য পরিমাণ ত্রুটি করাকে পছন্দ করি না। (যুহদ, ইবনুল মুবারক : ৪৬৩)

হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) যখন মদিনায় আগমন করেন তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিল না। দূরদূরান্ত থেকে লোকেরা তার কাছে আসত এবং দুআ চাইত। তিনি দুআ করে দিতেন। কারণ, তার দুআ কবুল হতো। আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব বলেন, আমি তখন এক নব যুবক। আমিও তার কাছে এলাম এবং নিজের পরিচয় দিলাম। তিনি আমাকে চিনতে পারলেন এবং বললেন, তুমি কি মক্কাবাসীর কারী? আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর আরও কথাবার্তা হলো, শেষ পর্যায়ে আমি বললাম, চাচা! আপনি সবার জন্য দুআ করেন। যদি নিজের জন্যও দুআ করতেন তাহলে আল্লাহ আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতেন। একথা শুনে তিনি মুচকি হেসে বললেন, বৎস! আমার কাছে দৃষ্টিশক্তির চেয়ে আল্লাহর ফয়সালা অধিক পছন্দনীয়। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪৩)

এক সাধকের এক ছোটো ছেলে হারিয়ে গেল। তিন দিন পর্যন্ত তার কোনো খবর পাওয়া গেল না। তাকে বলা হলো, আপনি আপনার সন্তানকে ফিরে পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। তিনি বললেন, আল্লাহর ফয়সালার প্রতি বিমুখ হওয়া আমার কাছে সন্তান হারিয়ে যাওয়ার চেয়েও অধিক কষ্টকর। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪৩)

এক আবেদ বলেন, আমি এক বড় পাপ করেছি, যার কারণে আমি ষাট বছর পর্যন্ত ক্রন্দন করেছি। এ ব্যক্তি খুব ইবাদতগুজার ছিলেন এবং ওই পাপের কারণে অব্যাহত তওবা ও ইসতিগফার করতেন। এক ব্যক্তি তাকে বলল, ওই পাপটি কী? তিনি বললেন, আমি একবার বলে ফেলেছিলাম, যদি এ কাজটি না হতো। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪৩)

এক বুযুর্গ বলেন, আল্লাহর ফয়সালার ক্ষেত্রে 'যদি এ কাজটি না হতো' বলা আমার সমস্ত শরীর কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলার চেয়েও উত্তম মনে করি। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪৩)

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ (র)-কে বলা হলো, অমুক স্থানে এক লোক পঞ্চাশ বছর যাবত ইবাদত করছে। একথা শুনে তিনি তার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে বলুন, আপনি কি নিজের ইবাদতকে যথেষ্ট মনে করেন? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, এ ইবাদতের মাধ্যমে আপনি কি নৈকট্য লাভ করেছেন? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, আপনি কি এতে সন্তুষ্ট? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, আপনার ইবাদত কি স্বাভাবিক নামায, রোযার চেয়ে বেশি কিছু? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, আপনার ব্যাপারে যদি আমার লজ্জা না হতো তাহলে আমি বলতাম, আপনার পঞ্চাশ বছরের এ ইবাদত বেকার।

এর মানে হলো, এত দিন ইবাদত করার পরও আপনার মনের দরজা খুলেনি। আপনি অন্তরের আমলকে উন্নতির মাধ্যম বানাননি। আপনি এখনও আসহাবে ইয়ামিনের স্তরে রয়েছেন। আর আপনাকে বাহ্যিক আমলের কারণে ওই পরিমাণই প্রতিদান দেওয়া হবে, যা সাধারণ মানুষকে দেওয়া হবে।

একদল লোক হযরত শিবলী (র)-এর সাথে দেখা করতে গেল। তিনি তখন এক মানসিক হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। লোকেরা গিয়ে দেখল, তিনি পাথর জমা করছেন। তিনি তাদেরকে দেখে বললেন, তোমরা কারা? কেন এসেছ? তারা বলল, আমরা আপনাকে মহব্বত করি। একথা শুনে তিনি তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। লোকেরা তখন এদিক-ওদিক ছোটোছুটি করতে লাগলো। তিনি বললেন, তোমরা তো আমার মহব্বতের দাবি করছিলে। এখন কী হলো? যদি

তোমরা সত্যি আমাকে মহব্বত করো তাহলে পালাও কেন? ধৈর্য ধরো না কেন? (আর রিসালাতুল কুশায়রিয়্যা : ৫২৫)

শিবলী (র)-এর একটি পঙ্‌ক্তি,

إِنَّ الْمَحَبَّةَ لِلرَّحْمٰنِ أَسْكَرَنِيْ - وَهَلْ رَأَيْتَ مُحِبًّا غَيْرَ سَكْرَانٍ.

রহমানের মহব্বত আমাকে পাগল বানিয়ে ফেলেছে। তুমি কি এমন কোনো আশেক দেখেছ, যে পাগল নয়?

শামের প্রখ্যাত এক আবেদ বলেন, তোমরা আল্লাহর সাথে মিলিত হবে তাঁকে সত্যায়ন করে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হবে এভাবে যে, তোমাদের কারও হাতের আঙুলে যদি স্বর্ণ থাকে, এর মাধ্যমে তোমরা ইশারা করে থাকো। আর যদি ওই আঙুলে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে তা লুকানোর চেষ্টা করো। এ কথার উদ্দেশ্য হলো, স্বর্ণ আল্লাহর অপছন্দনীয়। অথচ মানুষ তা দ্বারা পরস্পর গর্ব করে। দুনিয়ার বিপদাপদ আখেরাতবাসীর জন্য অলংকারস্বরূপ। অথচ তারা একে অপছন্দ করে।

বর্ণিত আছে, একবার এক বাজারে আগুন লাগলো। তখন সিররী সিকতি (র)-কে বলা হলো, বাজারের সব দোকান পুড়ে গেছে; কিন্তু আপনার দোকান পুড়েনি। তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। তাকে বলা হলো, আপনি আপনার দোকান নিরাপদ থাকায় 'আলহামদুলিল্লাহ' বললেন, অথচ সব মুসলমানের দোকান পুড়ে গেছে! একথা শুনে তিনি ব্যবসা থেকে তওবা করলেন। দোকান ছেড়ে দিলেন এবং সে অবস্থায় আলহামদুলিল্লাহ বলার কারণে সারা জীবন তওবা ও ইসতিগফার করলেন। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪৬)

যদি তুমি উপরোল্লিখিত ঘটনাসমূহ নিয়ে চিন্তা করো তাহলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মনের বিপরীত কোনো কাজে সন্তুষ্ট হওয়া অসম্ভব কিছু নয়; বরং এটা দীনদারদের একটি বড় স্তর। সুতরাং এটা যেভাবে মাখলুকের মহব্বত ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে সম্ভব তাহলে আল্লাহর মহব্বত ও আখেরাতের ক্ষেত্রেও সম্ভব। দুটি কারণে এটা সম্ভব হতে পারে।

১. কষ্টের ব্যাপারে মানুষ এ আশায় সন্তুষ্ট থাকবে যে, এর কারণে সে প্রতিদান ও সওয়াব পাবে। যেমন, মানুষ আরোগ্যের জন্য ওষুধ খায়। শিঙ্গা লাগায় ইত্যাদি।

২. কোনো প্রতিদান লাভের আশায় কষ্টের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকে না; বরং এ কারণে সন্তুষ্ট হয় যে, এ কষ্টই মাহবুবের সন্তুষ্টি ও উদ্দিষ্ট বিষয়। অনেক সময় মহব্বত এতটাই প্রবল হয় যে, মাহবুবের ইচ্ছাই মহব্বতকারীর ইচ্ছায় পরিণত হয়। এমনকি তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল এটা হয় যে, সে মাহবুবের মনকে সন্তুষ্ট করবে, তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়ন করবে। যদিও এতে তার প্রাণ চলে যায়। কবি বলেন,

فَمَا لِجُرْحٍ إِذَا أَرْضَاكُمْ أَلَمُ

যদি আঘাতের কারণে তুমি খুশি হও তাহলে এতে কষ্ট কীসের?

যদি আঘাতের কারণে কষ্টও হয় তবু এটা সম্ভব।

কখনো মহব্বত এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, কষ্ট অনুভবই হয় না। যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও মুশাহাদা এর প্রমাণ। যে ব্যক্তি এ স্তরে পৌঁছেনি তার জন্য সে স্তরকে অস্বীকার করা উচিত নয়। কারণ, তার মধ্যে এ স্তরে পৌঁছার সবব তথা মহব্বতের আধিক্য বিদ্যমান নেই। যে ব্যক্তি মহব্বতের স্বাদ আস্বাদন করে না, সে মহব্বতের আশ্চর্য বিষয়াবলি সম্পর্কে অবগত হবে না। ওমর ইবনুল হারেস রাফেকী (র) বলেন, আমি রাককা নগরীতে আমার এক বন্ধুর কাছে বসা ছিলাম। আমাদের মজলিসে এক যুবকও ছিল, যে এক দাসী গায়িকার প্রতি আসক্ত ছিল। ঘটনাক্রমে সেও ওই মজলিসে উপস্থিত ছিল। সে বাদ্য বাজিয়ে গান গাইল,

عَلَامَةُ ذُلِّ الْهَوٰى - عَلَى الْعَاشِقِيْنَ الْبُكٰى.

وَلَا سِيَّمَا عَاشِقٍ - إِذَا لَمْ يَجِدْ مُشْتَكٰى.

আশেকদের জন্য মহব্বতের লাঞ্ছনা হলো কান্না। বিশেষত ওই আশেকের জন্য, যে তার দুঃখ প্রকাশের জন্য কাউকে খুঁজে পায় না।

যুবকটি দাসীকে বলল, তুমি খুব সুন্দর গান গেয়েছ। এখন কি তুমি আমাকে মৃত্যুবরণের অনুমতি দিচ্ছ? দাসী বলল, তুমি যদি মহব্বতে সত্য হও তাহলে মরে যাও। তখন যুবক তার মাথা বালিশে রেখে তার মুখ ও চোখ বন্ধ করে দিল। কিছুক্ষণ পর আমরা তাকে নাড়া দিয়ে দেখি সে মারা গেছে। (আল মুওয়াশশা, ইবনুল ওশা : ৭৮)

জুনাইদ বাগদাদী (র) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে একটি ছেলের জামার হাতা ধরে খুব আকুতি জানাচ্ছে। নিজেকে তার আশেক দাবি করছে। ছেলেটি তাকে বলল, তোমার এ মিথ্যা কতদিন চলবে? লোকটি বলল, আল্লাহ জানেন, আমি যা বলছি, সত্য বলছি। এমনকি তুমি যদি আমাকে মারা যেতে বলো তাহলে অবশ্যই আমি মারা যাব। ছেলেটি বলল, তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে মারা যাও। লোকটি তখন দূরে কোথাও চলে গেল এবং চোখ বন্ধ করল। পরবর্তীতে তাকে মৃত পাওয়া যায়। (আল মুকাদ্দিমা ফিত তাসাউফ, সুলামি : ২৭)

সামনুন (র) বলেন, আমাদের এক প্রতিবেশি ছিল। তার এক দাসী ছিল, যাকে সে খুব মহব্বত করতো। একদিন ওই দাসী অসুস্থ হয়ে গেল। লোকটি তার জন্য হালুয়া বানাচ্ছিল। হঠাৎ দাসীর মুখ থেকে আহ শব্দ বেরিয়ে এল। এমন শব্দ শুনে লোকটি দিশেহারা হয়ে গেল। তার হাত থেকে চামচ পড়ে গেল। চামচের পরিবর্তে সে তার আঙুল দিয়ে হালুয়া নাড়তে লাগলো। ফলে তার আঙুল খসে পড়ল। দাসী জিজ্ঞেস করল, এটা কী হলো? লোকটি বলল, এটা তোমার আহ বলার ফলাফল। (আল মুকাদ্দিমা ফিত তাসাউফ : ২৪)

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ বাগদাদী (র) বলেন, আমি বসরায় এক যুবককে দেখেছি, সে উঁচু এক ছাদে দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশ্য করে নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করল,

مَنْ مَاتَ عِشْقًا فَلْيَمُتْ هٰكَذَا - لَا خَيْرَ فِيْ عِشْقٍ بِلَا مَوْتٍ.

'যে মহব্বতে মরতে চায়, তার এভাবে মরা উচিত। মহব্বতে মৃত্যু ব্যতীত কোনো কল্যাণ নেই।' এরপর সে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল এবং মারা গেল। (আল মুকাদ্দিমা ফিত তাসাউফ : ২৫)

এ ধরনের বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা জানা যায়, মাখলুকের মধ্যে এমন মহব্বত বিদ্যমান। যখন মাখলুকের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব তাহলে স্রষ্টার ক্ষেত্রেও সম্ভব। অন্তর্দৃষ্টি বাহ্যিক দৃষ্টির চেয়ে অধিক সঠিক। আর আল্লাহর সৌন্দর্য সকল সৌন্দর্যের চেয়ে পরিপূর্ণ; বরং পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য তাঁর সৌন্দর্যের একটি অংশ মাত্র।

যে ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি নেই, সে সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে। যার শ্রবণশক্তি নেই, সে সুন্দর কণ্ঠকে অস্বীকার করে। তেমনি যে ব্যক্তির অন্তর নেই, সে অন্তরের মাধ্যমে অনুভূত আনন্দকে অস্বীকার করে।

দুআ রিযার পরিপন্থি নয়

যে দুআ করে, দুআর কারণে সে রিযার মকাম থেকে খারিজ হয় না। এমনিভাবে গুনাহকে খারাপ মনে করা, অপরাধীদের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া, গুনাহের কারণসমূহকে ঘৃণা করা এবং সেগুলো দূর করার জন্য সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার কর্তব্য পালন করাও রিযার পরিপন্থি নয়। এ ক্ষেত্রে কিছু লোকের বিভ্রান্তি আছে। তারা বলে, গুনাহ নির্লজ্জ কাজ ও কুফর আল্লাহ তাআলার ফয়সালা ও তাকদীর বৈ কিছু নয়। অতএব এগুলোতেও রিযা ও সন্তুষ্টি দরকার। এসব লোক শরিয়তের রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ। দুআকে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য ইবাদতই সাব্যস্ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) ও অন্যান্য নবীর অধিক পরিমাণে দুআ করা এ বিষয়ের প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ (স) রিযার উচ্চতম মাকামে ছিলেন। দুআ রিযার পরিপন্থি হলে তিনি অধিক পরিমাণে দুআ কেন করতেন? আল্লাহ তাআলা কোনো কোনো বান্দার প্রশংসায় বলেন—

يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا.

তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে। (সূরা আম্বিয়া : ৯০)

গুনাহকে অপছন্দ করা, খারাপ মনে করা এবং এতে সম্মত না হওয়াকেও আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য ইবাদত সাব্যস্ত করেছেন। তিনি গুনাহে সন্তুষ্ট থাকার নিন্দা করেছেন। বলা হয়েছে—

وَ رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ اطْمَاَنُّوْا بِهَا.

তারা পার্থিবজীবনেই সন্তুষ্ট এবং তাতেই পরিতৃপ্ত থাকে। (সূরা ইউনুস : ৭)

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ لا وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ.

যারা পেছনে অবস্থানকারী নারীদের সঙ্গে থাকতে খুশি। আল্লাহ তাদের অন্তর মোহর করে দিয়েছেন। (সূরা তাওবা : ৯৩)

এক মশহুর হাদিসে আছে–

مَنْ شَهِدَ مُنْكَرًا فَرَضِيَ بِهٖ كَانَهٗ قَدْ فَعَلَهٗ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোনো অসৎকাজে উপস্থিত থাকে, অতঃপর তাতে রাজি থাকে, সে যেন নিজেই সে অসৎ কাজ করে। (মুসনাদে আবী ইয়ালা : ৬৭৮৫)

অন্য এক হাদিসে আছে–

اَلدَّالُّ عَلَى الشَّرِّ كَفَاعِلِهٖ.

অর্থাৎ, যে খারাপ কাজের রাস্তা দেখিয়ে দেয়, সে ওই ব্যক্তির ন্যায়, যে নিজে সেই কাজ করে। (মুসনাদে ফেরদাউস : ৩১২১)

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, স্বভাবত মানুষ খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু ততটুকু গুনাহই তার হয় যতটুকু অপরাধীর হয়ে থাকে। শ্রোতারা বলল, তা কীভাবে? তিনি বললেন, তা এভাবে যে, সে যখন খারাপ কাজের সংবাদ পায়, তাতে সম্মত থাকে। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪৬)

এক হাদিসে আছে, যদি পূর্ব প্রান্তে কোনো লোক নিহত হয় এবং অপর এক লোক পশ্চিম প্রান্তে বসে সেই হত্যাকাণ্ডে সম্মত থাকে, তাহলে সে-ও এই হত্যাকাণ্ডে শরীক হবে। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪৬)

আল্লাহ তাআলা নেক কাজ করা ও মন্দ কর্ম থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতার আদেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ.

প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। (সূরা মুতাফফিফিন : ২৬)

নবী কারীম (স) বলেছেন,

لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রে হিংসা করা যেতে পারে। এক. এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দান করেছেন এবং সে সম্পদ সঠিক পথে ব্যয় করার কর্তৃত্ব

দান করেছেন। দুই. এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা হেকমত (প্রজ্ঞা) দান করেছেন। অতঃপর সে এর মাধ্যমে ফয়সালা করে এবং (মানুষকে) তা শিক্ষা দেয়। (সহিহ বুখারী : ৭৩; সহিহ মুসলিম : ৮১৬)

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে,

رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

আর এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআন দান করেছেন, আর সে দিনরাত তা তেলাওয়াত করে। এ হাদিস শোনার সাহাবি বললেন, যদি এ ব্যক্তির মতো আমাকেও দান করা হয় তাহলে আমিও এমন কাজ করব। (সহিহ বুখারী : ৭২৩২)

কুরআন ও হাদিসে কাফের ও পাপাচারীদের সাথে শত্রুতা রাখা ও তাদের প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ছাড়া কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। (সূরা আলে ইমরান : ২৮)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَآءَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (সূরা মায়েদা : ৫১)

وَ كَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا.

এমনিভাবে আমি জালেমদের একদলকে অন্যদলের সাথে যুক্ত করে দেব। (সূরা আনআম : ১২৯)

হাদিস শরিফে আছে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুমিনের নিকট থেকে প্রত্যেক মুনাফিকের সাথে বৈরিতা পোষণের অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং প্রত্যেক মুনাফিকের কাছ থেকে মুমিনের সাথে বৈরিতা পোষণের অঙ্গীকার নিয়েছেন। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪৭)

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেছেন–

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

মানুষ (কেয়ামতের দিন) তার পছন্দের মানুষের সাথে থাকবে। (সহিহ বুখারী : ৬১৬৯)

مَنْ اَحَبَّ قَوْمًا حَشَرَهُ اللهُ فِيْ زُمْرَتِهِمْ.

যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসে, কিয়ামতের দিন তাকে তাদের সাথেই উঠানো হবে। (মুজামে কাবীর, তাবারানি : ২৫১৯)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الْإِيْمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللهِ، وَتُبْغِضَ فِي اللهِ.

ঈমানের মজবুত রশি হলো, আল্লাহর জন্য কাউকে মহব্বত করা এবং আল্লাহর জন্য কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। (মুসনাদে আহমদ : ১৮৫২৪)

যদি প্রশ্ন হয়, কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে— আল্লাহ তাআলার যাবতীয় ফয়সালায় সম্মত থাকতে হবে। আর আল্লাহর ফয়সালা ছাড়া পাপ হয় না। সুতরাং পাপকে খারাপ মনে করা আল্লাহর ফয়সালাকে খারাপ মনে করা নয় কি? এই পরস্পরবিরোধী উক্তির মাঝে সমন্বয়ের উপায় কী? একই বিষয়ে সম্মতি ও ঘৃণা কী করে একত্র হতে পারে?

জবাব হলো, এ বিষয়ে যাদের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, অসৎকাজে চুপ থাকাকে তারা সম্মত মনে করেছে এবং তারা এর নাম রেখেছে সচ্চরিত্রতা। এটা আসলে নিছক অজ্ঞতা।

আসলে রিযা ও ঘৃণা যখন একই বস্তুতে একই দিক দিয়ে এবং একইভাবে থাকে, তখন অবশ্য একটি অপরটির বিপরীত হয়। কিন্তু যদি এক বস্তুতে এক দিক দিয়ে সম্মতি এবং অন্য দিক দিয়ে ঘৃণা হয়, তবে নিশ্চয়ই একটি অপরটির বিপরীত হবে না এবং সেটা হওয়া সম্ভব। যেমন, তোমার কোনো দুশমন মারা গেল। সে ছিল তোমার অন্য এক দুশমনের দুশমন এবং সে তোমার দুশমনকে দমন করতে সচেষ্ট থাকত। বলা বাহুল্য, তোমার কাছে এমন দুশমনের মৃত্যু এ দিক দিয়ে খারাপ লাগবে

যে, তোমার শত্রু দমনে সে সচেষ্ট থাকত। আর ভালো মনে হবে এ দিক দিয়ে যে, তোমার এক দুশমন শেষ হয়ে গেছে। এখানে একদিক দিয়ে একই শত্রুর মৃত্যু খারাপ হয় এবং অন্যদিক দিয়ে ভালো হয়। সুতরাং এখানে কোনোরকম পরস্পর বৈপরীত্য হতে পারে না।

এভাবে পাপেরও দিক দুটি। ১. আল্লাহ তাআলার ক্ষমতায় ও ইচ্ছায় গুনাহ হয়। এদিক দিয়ে এতে রিযা থাকা প্রয়োজন যে, যার বস্তু, তাতে তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করবেন। ২. গুনাহ অর্জিত হয় বান্দার উপার্জন দ্বারা এবং সে হিসাবে তার বিশেষণ হয়। আল্লাহর নিকট তা ক্রোধে পতিত হওয়ার কারণ। এই দৃষ্টিতে গুনাহ মন্দ ও নিন্দনীয়, সুতরাং ঘৃণার উপযুক্ত।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

মনে করো, এক মাশুকের অনেক আশেক রয়েছে। সে সবার সামনে ঘোষণা দিল, আমি আমার আশেক ও দুশমনের মাঝে পার্থক্য করার উদ্দেশ্যে এক মানদণ্ড নির্ধারণ করেছি। তা হলো, প্রথমে আমি অমুকের কাছে যাব। তাকে কষ্ট দেব। এতটাই প্রহার করব যে, সে আমাকে গালি দিতে বাধ্য হবে। তখন আমি তাকে ঘৃণা করব এবং দুশমন গণ্য করব। সে যাকে মহব্বত করবে, আমি তাকেও দুশমন মনে করব। আর যাকে সে ঘৃণা করবে, আমি তাকে পছন্দ করব এবং বন্ধু বানাবো।

অতঃপর সে তার ঘোষণা অনুযায়ী কাজ শুরু করল এবং তার উদ্দেশ্যও পূরণ হলো। তার এক আশেক কষ্টে ধৈর্য ধারণ করতে পারল না। কষ্টের এক পর্যায়ে সে গালি দিতে শুরু করল। তার গালির কারণে মাশুকের মনে ঘৃণা জন্মালো আর এ ঘৃণা থেকেই সৃষ্টি হলো শত্রুতা। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি মহব্বতের দাবিদার এবং মহব্বতের শর্ত সম্পর্কে অবগত তার উচিত একথা বলা যে, অমুক আশেককে যে কষ্ট তুমি দিয়েছ, তাকে দূর করার জন্য যে পদ্ধতি তুমি গ্রহণ করেছ, আমি তা পছন্দ করি এবং এ ব্যাপারে আমি সন্তুষ্ট আছি। কারণ, এটা তোমার মতামত ও ইচ্ছা। তোমাকে যে ব্যক্তি গালি দিয়েছে তা তো বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু নয়। তার উচিত ছিল সব কষ্ট সহ্য করা এবং গালি থেকে বিরত থাকা। কিন্তু তোমার ইচ্ছা এমন ছিল। তুমি এটাই চেয়েছিলে যে,

তোমার কষ্ট প্রদানের কারণে সে গালি দিবে। আর তোমার অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে। সুতরাং সে তোমার ইচ্ছা মোতাবেক কাজ করেছে। আর আমি এতে সন্তুষ্ট আছি। যদি এমনটা না হতো তাহলে তোমার এ পদক্ষেপ ত্রুটিপূর্ণ হতো। তোমার ইচ্ছাও পূরণ হতো না। আর তোমার ইচ্ছা পূরণ না হওয়া আমার কাছে অপছন্দনীয়। তাছাড়া এ ব্যক্তি তোমাকে গালি দিয়ে বড় ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে। তোমার মতো এত সুন্দর মানুষ তাকে মেরেছে। এটাকে সৌভাগ্য মনে করা উচিত ছিল। গালি দেওয়া মোটেই উচিত হয়নি।

সুতরাং তার এ কর্ম আমার কাছে অপছন্দনীয়। গালি দেওয়ার কারণে তুমি তাকে দুশমন মনে করো, এটা আমি পছন্দ করি। কারণ, তোমার ইচ্ছা এটাই। আর তোমার কারণে আমিও তাকে দুশমন মনে করি। কেননা, মহব্বতের শর্ত হলো, মাহবুবের বন্ধুকে বন্ধু আর শত্রুকে শত্রু মনে করা। এ ব্যক্তি যেন একই কাজকে মাশুকের সাথে সম্পৃক্ত করে ভালো বলছে আবার আশেকের দিকে সম্পৃক্ত করে মন্দ বলছে। তবে এতে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ, কোনো বস্তুকে এক কারণে মন্দ মনে করা আবার অন্য কারণে ভালো মনে করা সম্ভব। এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা যখন বান্দার ওপর অব্যাহতভাবে প্রবৃত্তির উপলক্ষ্য দান করেন আর সে গুনাহকে পছন্দ করে তাতে জড়িয়ে পড়ে, এ বিষয়টি উল্লিখিত উদাহরণের মতো যে, মাশুক তার আশেককে এত নির্যাতন করে যার ফলে সে রাগান্বিত হয়ে যায় এবং গালি দিয়ে ফেলে। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নাফরমানকারীকে দূরে সরিয়ে দেন। যদিও এ নাফরমানি আল্লাহর তদবীর ও তাকদীরের কারণে হয়। কিন্তু তার নাফরমানির কারণে অসন্তুষ্ট হওয়ার বিষয়টি মাশুক তার আশেকের গালির কারণে বিদ্বেষ পোষণ করার মতো। অথচ গালি তার তদবীরের ফল। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে গুনাহ করার উপলক্ষ্য দান করেন তখন এর দ্বারা বোঝা যায়, তিনি তাকে দূরে সরিয়ে দিতে চান। সুতরাং যে বান্দা আল্লাহকে মহব্বত করে, তার উচিত হলো, আল্লাহ তাআলা যাকে অপছন্দ করেন, তাকে তারও অপছন্দ করা। আল্লাহ যাকে ঘৃণা

করেন, তাকে ঘৃণা করা। আল্লাহ যাকে তাঁর দরবার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। যদিও সে আল্লাহর কুদরত ও বাধ্যতায় এ স্তরে পৌঁছেছে; কিন্তু এরপরও সে অভিশপ্ত, বিতাড়িত।

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহকে মহব্বত করে, তার উচিত, ওই ব্যক্তিকে অপছন্দ করা, যে নৈকট্যের স্তর থেকে দূরে। যাতে করে মাহবুবের কাজের সাথে সামঞ্জস্যতা পাওয়া যায়। অর্থাৎ, যার ওপর মাশুক অসন্তুষ্ট তার ওপর অন্য আশেকেরও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা উচিত।

উপরিউক্ত বর্ণনাসমূহতে আল্লাহর জন্য মহব্বত ও আল্লাহর জন্যই বিদ্বেষ পোষণের প্রতি তাকিদ রয়েছে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোরতা ও তাদের প্রতি বিমুখতার প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকার কথাও বর্ণিত হয়েছে। এ হিসেবে যে, এটা আল্লাহর ফয়সালা।

আর এসবকিছু তাকদীরের সাথে সম্পর্কিত এবং তা এক রহস্য। যা প্রকাশ করা জায়েয নয়। এটুকু বলা যায় যে, কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়টি মাশিয়াত ও ইরাদার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অকল্যাণ অপছন্দনীয়। আর কল্যাণ পছন্দনীয়। কেউ যদি বলে, অকল্যাণ আল্লাহর পক্ষ থেকে নয় তাহলে সে অজ্ঞ। আর যে বলে, শুধু কল্যাণ ও অকল্যাণ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। এ ক্ষেত্রে পছন্দ ও অপছন্দের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সেও অজ্ঞ। কিন্তু এর বিস্তারিত বর্ণনার অনুমতি নেই। এ জন্য চুপ থাকাই উত্তম আর শরিয়তের দাবিও এটাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

اَلْقَدْرُ سِرُّ اللهِ فَلَا تُفْشُوْهُ. তাকদীর আল্লাহর ভেদ, একে প্রকাশ করো না। (আল কামেল, ইবনে আদী : ৭ : ১০২)

তাকদীর ইলমে মুকাশাফার সাথে সম্পৃক্ত। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হলো এ কথা বলা যে, আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হওয়া এবং গুনাহকে মন্দ মনে করা সম্ভব, যদিও গুনাহ আল্লাহর ফয়সালা। সুতরাং তাকদীরের রহস্য উন্মোচন করা ব্যতীতই সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি একত্রিত হওয়া সম্ভব।

আলোচ্য বর্ণনা দ্বারা এটাও জানা গেল যে, গুনাহে লিপ্ত হওয়া ও তা মাফের জন্য দুআ করা এবং কল্যাণের পথে স্থির থাকা আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকার পরিপন্থি নয়। আল্লাহ তাআলা দুআকে ইবাদত সাব্যস্ত

করেছেন এ কারণে যে, বান্দা স্বচ্ছ যিকির, অন্তরের একাগ্রতা, বিনয় ও অপারগতার সাথে দুআ করবে, আর এ দুআ তার অন্তরের জন্য উজ্জ্বলতা ও কাশফের চাবি হবে এবং এর কারণে আল্লাহর অগণিত দয়া লাভ করবে। যেমনিভাবে পিপাসা দূর করার জন্য গ্লাস হাতে নেওয়া এবং পানি পান করা আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টির পরিপন্থি নয়, তেমনিভাবে দুআও একটি মাধ্যম। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে, আল্লাহর রীতি অনুযায়ী মাধ্যম গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়, তেমনি দুআও রিযার পরিপন্থি নয়। কেননা, রিযা স্তরের দিক দিয়ে তাওয়াক্কুলের খুব নিকটবর্তী।

তবে অভিযোগের মনোভাব নিয়ে বিপদাপদ প্রকাশ করা এবং অন্তরে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মন্দ মনে করা রিযার পরিপন্থি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বিপদাপদ প্রকাশ করা এবং আল্লাহর কুদরত ও বড়ত্ব বর্ণনার উদ্দেশ্যে নিজের পেরেশানি নিয়ে আলোচনা করা রিযার পরিপন্থি নয়।

এক বুযুর্গ বলেন, আল্লাহর ফয়সালায় উত্তম রিযা হলো, গরমের দিনে অভিযোগের উদ্দেশ্যে একথা না বলা যে, আজ গরমের দিন। তবে শীতকালে এমনটা বললে তাকে শোকর গণ্য করা হবে।

অভিযোগ প্রকাশ সর্বাবস্থায় রিযার পরিপন্থি। এমনিভাবে খাবারের দোষ ধরা, তাকে মন্দ বলাও রিযার পরিপন্থি। কারণ, সৃষ্টির নিন্দা মূলত স্রষ্টারই নিন্দা। আর সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি। কেউ যদি বলে, দারিদ্র্য মুসিবত ও বিপদ, সন্তানসন্ততি হলো দুশ্চিন্তা। আর পেশা হলো শ্রম ও কষ্ট। তার একথাকেও রিযার পরিপন্থি গণ্য করা হবে; বরং যে কোনো পদক্ষেপকে ব্যবস্থাপকের কাছে সোপর্দ করা উচিত। আর রাজত্বকে রাজার নিকট সোপর্দ করাই রিযা; বরং হযরত ওমর (রা)-এর মতো বলা উচিত।

لَا أُبَالِيْ مَا أَصْبَحْتُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَإِنِّيْ لَا أَدْرِيْ أَيُّهُمَا خَيْرٌ لِيْ.

আমি ধনী হই বা গরিব, এ দিকে আমার কোনো পরোয়া নেই। আমি এটাও জানি না যে, এ দুটির কোনটি আমার জন্য উত্তম। (রিয়ায়াহ : ২৬১)

গুনাহের কেন্দ্র থেকে পলায়ন

স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন লোক মনে করে, মহামারী আক্রান্ত অঞ্চল থেকে রাসূলুল্লাহ (স) পালাতে নিষেধ করেছেন। এতে বোঝা যায়, গুনাহ যে অঞ্চলে মহামারী হিসেবে দেখা দেয় সেখান থেকেও না পালানো উচিত। কারণ, উভয় অবস্থায়ই আল্লাহর ফায়সালা থেকে পলায়ন হবে। এরকম ভাবা ঠিক নয়। বরং মহামারী দেখা দিলে সেখান থেকে পলায়ন নিষেধ করার কারণ হলো, এর অনুমতি দেওয়া হলে সুস্থ লোকজন সকলেই এলাকা ত্যাগ করবে এবং কেবল রোগীরা সেখানে অবস্থান করবে। ফলে কোনো পরিচর্যাকারী না থাকার কারণে তারা সবাই ধ্বংসের মধ্যে পতিত হবে। যদি এই নিষেধাজ্ঞা আল্লাহর ফয়সালা থেকে পলায়নের কারণে হতো, তাহলে যে ব্যক্তি আক্রান্ত এলাকার নিকট চলে যায়, তাকে সে স্থান থেকে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হতো না। কারণ, এও আল্লাহর ফয়সালা থেকে পলায়নের মধ্যে গণ্য।

নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিষয়ে অবগত হওয়ার পর বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যে এলাকায় পাপাচার প্রকাশ্যে শুরু হয়ে পড়ে, সে স্থান থেকে পালিয়ে যাওয়া আল্লাহর ফায়সালা থেকে পলায়নের মধ্যে গণ্য নয়। এভাবে গুনাহে উত্তেজিত করে এমন স্থানের নিন্দা আলোচনা করা মানুষকে দূরে রাখার জন্য; ঘৃণা নয়। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ অনেক সময় জায়গা বিশেষের নিন্দা করেছেন। বাগদাদ শহরের নিন্দায় মুখর ছিলেন এমন একদল বুযুর্গ। তারা যথাসম্ভব এই শহর থেকে পলায়নের চেষ্টা করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) বলতেন, পূর্ব ও পশ্চিমের অনেক দেশ আমি ভ্রমণ করেছি; কিন্তু বাগদাদের মতো নিকৃষ্ট শহর কোথাও দেখিনি। লোকেরা প্রশ্ন করল, সে শহরটি কেমন? তিনি বললেন, এই শহরে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং তাঁর নাফরমানিকে তুচ্ছ মনে করা হয়। তিনি যখন খোরাসানে পৌঁছেন, তখন মানুষ তাঁকে বাগদাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এতে আমি শুধু তিন রকমের লোক দেখেছি— ক্ষুব্ধ সিপাহি, বেদনাক্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও দুনিয়ামুগ্ধ আলেম। (কূতুলু কুলূব : ২ : ৪৯)

তাঁর এই উক্তি কোনো গীবত ছিল না। কারণ, এ উক্তিতে তিনি কোনো ব্যক্তি বিশেষের নাম উচ্চারণ করেননি এবং কোনো বাগদাদীকে লক্ষ্যে পরিণত করেননি। বরং এতে তার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সাবধান করা।

তিনি মক্কা শরীফে যাওয়ার পথে ষোলো দিনের বেশি বাগদাদে অবস্থান করতেন না। এরই মাঝে তাঁর কাফেলা এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত। এই ষোলো দিনের বিনিময়ে তিনি ষোলো দিনার সদকা করতেন।

ইরাককে কোনো কোনো বুযুর্গ খারাপ বলতেন। এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন উমর ইবনে আবদুল আযীয ও কাব আহবার (রা)। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাঁর এক গোলামকে প্রশ্ন করলেন, তুমি থাকো কোথায়? সে বলল, ইরাকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাজ কী সেখানে? আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি ইরাকে থাকে, আল্লাহ তাআলা তার পশ্চাতে কোনো মুসিবত লাগিয়ে দেন।

কাব আহবার (রা) একদিন ইরাকের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, এর দশ ভাগের নয় ভাগে পাপাচার রয়েছে, যার কোনো প্রতিকার নেই। এক বুযুর্গ আরও বলেন, কল্যাণকে ভাগ করা হয়েছে দশ ভাগে। এর নয় ভাগ সিরিয়াতে এবং এক ভাগ ইরাকে। আর ক্ষতির দশ ভাগের নয় ভাগ ইরাকে আর একভাগ জায়গা পেয়েছে সিরিয়ায়।

জনৈক মুহাদ্দিস বলেন, আমি একদিন ফুযাইল ইবনে আয়াযের দরবারে ছিলাম। এমন সময় এক সুফী ভদ্রলোক এলেন। তাকে তিনি নিজের কাছে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাড়ি কোথায়? সুফী লোকটি বলল, বাগদাদে। এরপর তার দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, মানুষ আমাদের নিকট দরবেশের বেশ ধরে আসে; কিন্তু কোথায় থাকে প্রশ্ন করা হলে বলে, অত্যাচারীদের বাসায় থাকি। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৯ : ৬৭১)

বিশর ইবনুল হারেস (র) বলতেন, বাগদাদের আবেদদের উদাহরণ হলো, টয়লেটে বসে আবেদ হওয়ার মতো।

তিনি আরও বলতেন, এখানে থেকে আমার অনুসরণ করো না। যার ইচ্ছা চলে যেতে পার। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৯ : ৬৭১)

আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলতেন, আমার সঙ্গে যদি সন্তানসন্ততির সম্পর্ক না থাকত, এ শহরে আমি থাকতাম না। লোকেরা প্রশ্ন করল, তবে কোথায় থাকতেন? তিনি বলেন, পাহাড়ের উপরে। (ইতহাফুস সদাতিল মুত্তাকিন : ৯ : ৬৭১)

বাগদাদের অবস্থা সম্পর্কে এক বুযুর্গকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, সেখানকার দরবেশ শ্রেষ্ঠ দরবেশ আর সেখানকার দুষ্ট শ্রেষ্ঠ দুষ্ট।

এসব বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যে শহরে পাপের আধিক্য ও পুণ্যের স্বল্পতা বিরাজমান, সেখানে কেউ বন্দি হয়ে পড়লে তার উচিত হিজরত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন–

اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا.

'আল্লাহর জমিন কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করতে?' (সূরা নিসা : ৯৭)

কেউ যদি পরিবার-পরিজনের বাধার মুখে হিজরত করতে না পারে, তবে উদাস মনেই থাকা উচিত এবং সব সময় এ দুআ করা উচিত–

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا.

হে আমাদের প্রতিপালক! এ জনপদ থেকে আমাদের অন্যত্র সরিয়ে নিন, যার অধিবাসীরা জালেম। (সূরা নিসা : ৭৫)

এর কারণ হচ্ছে, পাপীর সংখ্যা যেখানে বেশি হয়– সেখানে বিপদাপদ বেশি আসে, যে বিপদ ভালো-মন্দ সকলকেই ধ্বংস করে দেয়। এতে আল্লাহর অনুগত বান্দারাও রক্ষা পায় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً.

তোমরা এমন ফিতনাকে ভয় করো, যা তোমাদের মধ্যে বিশেষ করে যারা জালেম শুধু তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না। (সূরা আনফাল : ২৫)

মোটকথা, সর্বাবস্থায় পাপকাজে রিযা (সন্তুষ্টি) কাম্য নয়; বরং শুধু এ দিক দিয়ে যে, এটা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অন্যথায় স্বয়ং পাপকাজে সম্মত থাকার কোনো কারণ নেই।

তিন লোক তিন জায়গায় অবস্থান করে। তাদের মাঝে একজন দীদারের আশায় মৃত্যুকে পছন্দ করে। দ্বিতীয়জন মনে করে, মুনিবের খেদমতের জন্য জীবিত থাকা ভালো। তৃতীয়জন বলে, আমি শুধু সেটাই পছন্দ করি, আমার জন্য যা আল্লাহ পছন্দ করেন। তা মৃত্যু হোক অথবা জীবন। এই তিন লোকের মধ্যে কে উত্তম, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কোনো এক আল্লাহর অলীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রিযাবিশিষ্ট লোক শ্রেষ্ঠ। কারণ, তাদের মাঝে তার অনধিকারচর্চা অনেক কম।

একদিন উহাইব ইবনে ওয়ারদ, সুফিয়ান সাওরী ও ইউসুফ ইবনে আসবাত (র) এক স্থানে একত্র হন। সুফিয়ান (র) বললেন, আজকের পূর্বে হঠাৎ মৃত্যু আমার নিকট ভীষণ খারাপ মনে হতো; কিন্তু আজ আমি মরতে চাই। ইউসুফ ইবনে আসবাত কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, এ জন্য যে, আমি ফিতনাকে ভয় পাই। ইউসুফ ইবনে আসবাত (র) বললেন, আমার নিকট দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা খারাপ মনে হয় না। আমি মনে করি, সম্ভবত এমন একদিন পাওয়া যাবে, যাতে তাওবা নসিব হয়ে যাবে এবং কোনো নেক আমল করতে পারব। তারপর তাঁরা উহাইবের নিকট জানতে চাইলেন, এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি বললেন, আমি কিছুই পছন্দ করি না। আল্লাহ তাআলার যা কিছু প্রিয়, তাই আমার প্রিয়। তিনি বাঁচিয়ে রাখুন অথবা মৃত্যু দান করুন। সুফিয়ান সাওরী (র) উঠে তাঁর কপালে চুমু খেলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ! এই লোক মারেফাতপন্থি। (কূতুল কুলূব : ২ : ৪৪)

মুহিব্বীনের কাহিনি

জনৈক আরেফ (আল্লাহভক্ত লোক)-কে কেউ দেখে ফেললে তিনি বলতেন, যখন তুমি আমাকে দেখে ফেলেছ, তা চল্লিশজনকে দেখার সমান হয়ে গেছে। কেননা, আমি চল্লিশজন আবদালকে দেখেছি এবং তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে একটা না একটা চরিত্র আহরণ করেছি। এই বুযুর্গকে কেউ প্রশ্ন করল, আমরা শুনেছি, আপনি খিযির (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি হেসে বললেন, যে খিযিরকে দেখে, তার কোনো

কৃতিত্ব নেই; বরং কৃতিত্ব সেই ব্যক্তির, যাকে খিযির দেখতে চায়; কিন্তু সে আত্মগোপন করে। (কূতুল কুলূব : ২ : ৬৯)

আবু ইয়াযীদ বুস্তামী (র)-এর খেদমতে একবার আরয করা হলো— আপনি আল্লাহ তাআলাকে যে প্রত্যক্ষ করেন তার কিছু অবস্থা বর্ণনা করুন। তিনি সজোরে চিৎকার দিয়ে বললেন, এটা জানা তোমাদের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। লোকেরা বলল, আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে আপনি নিজের নফসের বিরুদ্ধে যে কঠোরতর মুজাহাদা করেছেন, তা আমাদের বলে দিন। তিনি বললেন, তোমাদের এ সম্পর্কে জানানোও বৈধ নয়। তারা বলল, তা হলে সাধনার শুরুতে আপনি যা যা করতেন, তাই বলুন। তিনি বললেন, প্রথমে আমি আমার নফসকে আল্লাহ তাআলার দিকে আহবান করলাম। সে অবাধ্যতা করল। আমি তাকে কসম দিলাম যে, এক বছর পানি পান করব না এবং ঘুমের স্বাদ আস্বাদন করব না। অতঃপর নফস তা পূর্ণ করেছে। (কূতুল কুলূব : ২ : ৭০)

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায (র) বর্ণনা করেন, আমি আবু ইয়াযিদকে ইশার নামাযের পর সুবহে সাদেক পর্যন্ত এভাবে বসে থাকতে দেখেছি— হাঁটু মাটিতে রাখা, আবার উপরে পায়ের পাতা ও গোড়ালি মাটি থেকে উত্তোলিত। চিবুক বুকের সাথে সংযুক্ত এবং উভয় চক্ষু অনিমেষ উন্মীলিত। যখন সকাল নিকটবর্তী হলো, তিনি একটি সেজদা করে আবার বসলেন এবং আল্লাহর দরবারে আরয করলেন— ইলাহী! কিছু লোক আপনার কাছে প্রার্থনা করেছে এবং আপনি তাদের পানিতে ও বায়ুতে চলার ক্ষমতা দান করেছেন। তারা এতেই সন্তুষ্ট হয়েছে। আমি আপনার কাছে এসব বিষয় থেকে আশ্রয় চাই। আরও কিছু লোক আপনার কাছে আবেদন করেছে। আপনি তাদেরকে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব অতিক্রম করার ক্ষমতা দান করেছেন। তারা এতেই সন্তুষ্ট হয়েছে। আমি এ থেকেও আপনার কাছে আশ্রয় চাই। এক সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনার কাছে চাইলে আপনি তাদেরকে ভূপৃষ্ঠের ধনভান্ডার দিয়ে দিয়েছেন। তারা এ নিয়েই খুশি হয়েছে। কিন্তু আমি আপনার কাছে এ থেকেও আশ্রয় চাই।

এভাবে তিনি অলীদের বিশটিরও বেশি কারামতের কথা দুআর মধ্যে উল্লেখ করলেন। এরপর চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাতেই আমাকে

দেখে বললেন, ইয়াহইয়া! আমি আরয করলাম, খাদেম হাযির। তিনি বললেন, তুমি কখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে? আমি আরয করলাম, অনেকক্ষণ ধরে। অতঃপর তিনি চুপ করে রইলেন, আমি আরয করলাম, আমাকে আপনার কিছু হাল বলুন। তিনি বললেন, তোমার জন্য যা উপযুক্ত তাই বলছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে নিচের আকাশে দাখিল করলেন এবং নিম্নজগত ভ্রমণ করালেন। জান্নাত থেকে আরশ পর্যন্ত যা কিছু আকাশসমূহে ছিল, সবই আমাকে দেখিয়েছেন। এরপর আমাকে সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, তুমি যা যা দেখেছ, এগুলোর মধ্যে যা চাইবে, আমি তা-ই তোমাকে দিয়ে দেব। আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমি এমন কোনো বস্তু দেখিনি, যা ভালো মনে করে আপনার কাছে চাইতে পারি। আল্লাহ বললেন, তুমি আমার সাচ্চা বান্দা। তুমি ঠিক আমারই জন্য আমার ইবাদত করো। এছাড়া আরও অনেক কথা বললেন।

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায (র) বলেন, একথা শুনে আমি ভীত হয়ে পড়লাম এবং বললাম, হুযুর! আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর মারেফত প্রার্থনা করেননি কেন? আপনাকে তো এই শাহানশাহের পক্ষ থেকে বলাই হয়েছিল, যা চাইবে, তাই পাবে। আবু ইয়াযীদ একটি চিৎকার দিলেন, অতঃপর বললেন, চুপ করো। আল্লাহ তাআলার প্রতি আমার আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয়ে গেল, আমাকে ছাড়া কেউ যেন তাঁকে না চিনে! তাঁর মারেফাত অন্যরা পাবে, এটা আমার কাছে ভালো মনে হয়নি। (কূতুল কুলূব : ২ : ৭০)

বর্ণিত আছে, আবু তোরাব নাখশাবী (র) জনৈক মুরীদকে নিয়ে গর্ব করতেন। তাকে কাছে জায়গা দিতেন এবং তার মঙ্গল কামনা করতেন। মুরীদ ইবাদতে মশগুল থাকত। একদিন আবু তোরাব (র) তাকে বললেন, আবু ইয়াযীদ বোস্তামীর সংসর্গ অবলম্বন করো। মুরীদ বলল, আমার তার প্রয়োজন নেই। আবু তোরাব অধিক পীড়াপীড়ি করলে মুরীদ জোশের মুখে বলে ফেলল, আমি আবু ইয়াযীদকে দিয়ে কী করব? আমি আল্লাহ তাআলাকে দেখেছি। তিনি আমাকে আবু ইয়াযীদকে দেখার মুখাপেক্ষী রাখেননি। আবু তোরাব বলেন, এ কথা শুনে আমারও মন অস্থির হয়ে গেল। আমি বেসামাল হয়ে বলে উঠলাম, আল্লাহকে দেখে অহংকারী হয়ে যাও? যদি আবু ইয়াযীদকে একবার দেখো, তবে আল্লাহ তাআলাকে

সত্তরবার দেখার চেয়ে অধিক উপকারী হবে। মুরীদ অত্যন্ত হয়রান হয়ে বলল, তা কেমন করে হতে পারে? আবু তোরাব বললেন, তুমি আল্লাহ তাআলাকে নিজের কাছে দেখলে তিনি তোমার সহনশক্তির পরিমাণ আত্মপ্রকাশ করেন, আর আবু ইয়াযীদকে আল্লাহ তাআলার কাছে দেখলে আল্লাহ তাআলা আবু ইয়াযীদের সহনশক্তির পরিমাণ অনুযায়ী আত্মপ্রকাশ করবেন। মুরীদ একথার তত্ত্ব উপলব্ধি করার পর বলল, আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন।

আবু তোরাব বললেন, আমরা গিয়ে একটি টিলার ওপর দাঁড়ালাম এই অপেক্ষায় যে, আবু ইয়াযীদ জঙ্গল থেকে বের হবেন। কেননা, তিনি তখন হিংস্রপ্রাণীদের জঙ্গলে বসবাস করতেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবু ইয়াযীদ একটি পালকযুক্ত পরিধেয় কোমরে বেঁধে বের হলেন। আমি মুরীদকে বললাম, ইনি আবু ইয়াযীদ। তাঁকে দেখা মাত্রই সে চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এরপর আমরা তাকে নাড়া দিয়ে মৃত পেলাম। আমরা সকলে মিলে তাকে দাফন করলাম। আমি আবু ইয়াযীদের খেদমতে আরয করলাম, হুযুর! আপনার দিকে দেখার কারণে লোকটি মরে গেল। তিনি বললেন, তা নয়; বরং তোমার মুরীদ ছিল সাচ্চা। তার অন্তরে একটি রহস্য লুকিয়ে ছিল। আমাকে দেখা মাত্রই তার মনের সব রহস্য খুলে গেল। দুর্বল মুরীদের মকামে ছিল বলে সে তা সহ্য করতে পারল না। তাই সে মারা গেল। (কূতুল কুলূব : ২ : ৭০)

যখন হাবশী সৈন্যরা বসরায় প্রবেশ করে হত্যাযজ্ঞ চালায় এবং ধন-সম্পত্তি লুটপাট করে, তখন সাহল তস্তরী (র)-এর মুরীদরা তাঁর কাছে সমবেত হয়ে বলল, আপনি এদের হটিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করুন। সাহল (র) কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এ শহরে আল্লাহ তাআলার কিছু বান্দা আছেন, যারা জালেমের বিরুদ্ধে বদদুআ করলে সকাল পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে কোনো জালিমের অস্তিত্ব থাকবে না। এক রাতেই সব খতম হয়ে যাবে। কিন্তু তারা বদদুআ করেন না। সকলেই সমস্বরে প্রশ্ন করল– কেন? তিনি বললেন, কারণ, যে বিষয়কে আল্লাহ তাআলা ভালো মনে করেন না, সেটি তাদের কাছেও ভালো লাগে না।

এরপর তারা দুআ কবুল সম্পর্কে কিছু আলোচনা করলেন, যা এখানে বর্ণনা করার সুযোগ নেই। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, যদি এ লোকেরা

আল্লাহর কাছে কেয়ামত সংঘটিত না হওয়ার দুআ করতো তাহলে তাদের দুআ কবুল হতো। (কূতুল কুলূব : ২ : ৭১)

এটা বাস্তবসম্মত বিষয়। যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। যে ব্যক্তির এ বিষয়ে কোনো জ্ঞান না থাকে তার উচিত, অন্তত একে সত্যায়ন ও বিশ্বাস করা। কারণ, আল্লাহর কুদরত বিস্তৃত। তাঁর অনুগ্রহ ব্যাপক। তাঁর কর্তৃত্ব ও রাজত্বের আশ্চর্যজনক বিষয়াবলি অসংখ্য। বান্দার প্রতি আল্লাহর কুদরত ও অনুগ্রহের কোনো সীমা নেই।

একারণেই আবু ইয়াযিদ (র) বলেছেন, যদি তোমাকে মূসা (আ)-এর মুনাজাত, ঈসা (আ)-এর আধ্যাত্মিকতা ও ইবরাহিম (আ)-এর বন্ধুত্ব দান করা হয় তবু এর চেয়ে বেশি কিছুর দুআ করো। কারণ, তাঁদের কাছে এর চেয়েও বড় মর্তবার স্তর রয়েছে। যদি তুমি কোনো এক স্তরে গিয়ে থেমে যাও তাহলে অন্য স্তরসমূহ তোমার থেকে দূরে চলে যাবে। কিন্তু এ দূরে সরে যাওয়া ওই ব্যক্তিদের জন্য, যাদের অবস্থা এ বুযুর্গদের মতো। কারণ, তাঁরা উচ্চস্তরের বুযুর্গ। (কূতুল কুলূব : ২ : ৭২)

এক আরেফ বলেন, কাশফের মাধ্যমে আমার মনে হলো, আমি চল্লিশ জন হুরকে দেখলাম। যারা বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। তাদের শরীরে সোনা-রূপা ও অলংকার জড়ানো। যার ফলে ঝনঝন আওয়াজ হচ্ছিল। আমি তাদের দিকে মাত্র একবার তাকালাম। যার কারণে আমাকে চল্লিশদিন পর্যন্ত শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

কিছু দিন পর আমি আশিজন হুরকে দেখলাম। যারা পূর্ববর্তী হুরদের চেয়ে সুন্দর ও উত্তম ছিল। আমাকে বলা হলো, তাদের দিকে তাকাও। তখন আমি সেজদায় চলে গেলাম ও চোখ বন্ধ করে রাখলাম। যেন তাদেরকে না দেখি। আর দুআ করলাম, হে আল্লাহ! আমি আপনি ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে পানাহ চাই, এর কোনো প্রয়োজন আমার নেই। এভাবে আমি কাকুতি-মিনতি করতে থাকলাম। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সরিয়ে দিলেন। (কূতুলু কুলূব : ২ : ৭২)

কোনো মুমিনের জন্য এ সকল মুকাশাফা অস্বীকার করা উচিত নয়। এটা ভাবাও উচিত নয় যে, যে বিষয় তার সামনে উন্মোচিত হয়নি তার অস্তিত্বই নেই। অবস্থা যদি এমন হয় যে, মুশাহাদা বা অবলোকন ব্যতীত কেউ কোনো বিষয় বিশ্বাস করবে না তাহলে ঈমানের পথ সংকীর্ণ হয়ে যাবে।

এসকল অবস্থা দ্রুত প্রকাশ পায় না; বরং বহু কঠিন পথ অতিক্রম ও বিভিন্ন স্তর অর্জনের পর এ অবস্থা প্রকাশ পায়। এ স্তরসমূহের প্রথম ও নিম্নস্তর হলো, বান্দার মুখলিস তথা আন্তরিক হওয়া। প্রবৃত্তি ও মাখলুকের সাথে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং নিজের এ অবস্থা মানুষের কাছে গোপন রাখা।

এটা সুলুকের প্রথম পদক্ষেপ। যা বড় বড় বুযুর্গদের মধ্যেও কম পাওয়া যায়।

যখন বান্দার অন্তর মাখলুকের প্রতি দৃষ্টিপাতের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হয় তখন একীনের নূর তার ওপর ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রাথমিক কাশফ অর্জিত হয়। অভিজ্ঞতা ও সুলুকের পথে চলা ব্যতীত একে অস্বীকার করার বিষয়টি ওই ব্যক্তির ধারণার মতো, যে জং ধরা লোহায় নিজের চেহারা না দেখে মনে করে, যদি একে পরিষ্কার করা হয় তবুও চেহারা দেখা যাবে না। কারণ, তার হাতে যে লোহা ছিল তা জং ও ময়লায় পূর্ণ ছিল। এমতাবস্থায় চেহারা দেখা অসম্ভব। সুতরাং তার অস্বীকার করা চূড়ান্ত পর্যায়ের অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা ছাড়া কিছু নয়।

একই অবস্থা ওই সকল লোকের, যারা আল্লাহর অলীদের কারামত অস্বীকার করে। এরা তো মুশাহাদার ক্ষেত্রে অক্ষম। যেমন জংযুক্ত লোহায় চেহারা দেখতে অক্ষম। আল্লাহর কুদরত অস্বীকারের এটা সবচেয়ে খারাপ ভিত্তি।

মুকাশাফার ঘ্রাণ তো ওই ব্যক্তিও পায়, যে সুলুকের পথে কিছু দিন চলা-ফেরা করেছে।

কেউ বিশর (র)-কে প্রশ্ন করল, আপনি এই মর্যাদায় পৌছলেন কীভাবে? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার নিকট আমি দুআ করতাম, তিনি যাতে আমার অবস্থা গোপন রাখেন এবং কারও নিকট প্রকাশ না করেন। বর্ণিত আছে, তিনি খিযির (আ)-কে দেখেছেন এবং তাঁকে বলেছেন, আপনি আমার জন্য দুআ করুন। খিযির (আ) বললেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর আনুগত্য তোমার জন্য সহজ করুন। তিনি বললেন, আরও কিছু দুআ করুন। খিযির (আ) বললেন, আল্লাহ তাআলা এই আনুগত্যকে মানুষের নিকট থেকে গোপন রাখুন।

এক বুযুর্গ বলেন, আমার মনে খুব আগ্রহ জাগল হযরত খিযির (আ)-কে দেখার। এ কারণে একবার আমি আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করলাম।

আমার দুআ আল্লাহ তাআলা কবুল করলেন এবং খিযির (আ)-এর সাক্ষাৎ আমার নসিব হলো। তখন আমি অন্য সব কথা ভুলে গিয়ে শুধু একথাই বললাম, হে আবুল আব্বাস! আপনি আমাকে এমন দুআ শিখিয়ে দিন, যা পাঠ করলে আমি মানুষের অন্তর থেকে উধাও হয়ে যাব। তাদের অন্তরে আমার জন্য কোনো জায়গা না থাকে এবং আমার দীনদারি যেন কেউ জানতে না পারে। তিনি এই দুআ পাঠ করতে বললেন,

اَللّٰهُمَّ اَسْبِلْ عَلَيَّ كَثِيْفَ سَتْرِكَ وَحُطَّ عَلَيَّ سُرَادِقَاتِ حُجُبِكَ وَاجْعَلْنِيْ فِي مَكْنُوْنِ غَيْبِكَ وَاحْجُبْنِيْ مِنْ قُلُوْبِ خَلْقِكَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমার ওপর আপনার সম্পূর্ণ আবরণ ফেলে দিন। আমার ওপর আপনার পর্দা নামিয়ে দিন। আমাকে লুক্কায়িত রাখুন এবং মানুষের অন্তর থেকে আমাকে আড়ালে রাখুন।

এরপর খিযির (আ) অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পুনরায় আমি তাঁকে কখনো দেখিনি এবং মনে দেখার আগ্রহও কখনো সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু আমি তাঁর শেখানো দুআ সব সময় পাঠ করতে থাকলাম।

সেই বুযুর্গের বর্ণনা মতে, এই দুআর এমন প্রভাব পড়ল যে, তাঁর অপমান, লাঞ্ছনা ও মূল্যহীনতা মানুষের মাঝে সীমাতিক্রম করে। অমুসলিম আশ্রিতরাও তাঁকে নিয়ে বিদ্রূপ করতো এবং জোর করে বিনা পারিশ্রমিকে নিজেদের বোঝা তার মাথায় চাপিয়ে দিত। বাচ্চারা তাকে নিয়ে খেলা করতো। এসব আচরণ তিনি নীরবে সহ্য করতেন। (কূতুল কুলূব : ২ : ৭৩)

মোটকথা, তাঁর অন্তরে সুখ ও সংশোধন লাঞ্ছিত ও অজ্ঞাত থাকার মধ্যে নিহিত ছিল। আল্লাহ তাআলার অলীদের এই ছিল দশা। এমন প্রকৃতির লোকদের মধ্যেই তাদের তালাশ করা উচিত। কিন্তু পথভ্রষ্ট মানুষ এমন লোকদের মধ্যে তাদের অন্বেষণ করে, যারা পরে নানারকম বস্ত্রে তালি দেওয়া পোশাক, কিন্তু জ্ঞান-গরিমা, আল্লাহভীরুতা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক দিয়ে মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ। অথচ তাঁর অলীদেরকে আল্লাহ তাআলা গোপন রাখাই পছন্দ করেন। হাদিসে কুদসীতে বলা হয়েছে, আমার অলীরা আমার কাবার নীচে বাস করে। তাদেরকে কেউ চিনতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِيْ طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ.

অনেক লোক এমন রয়েছে, যারা এলোমলো চুল, ধুলিমলিন দেহ ও দুটি চাদরের মালিক। কেউ তাদের দিকে তাকায় না। কিন্তু তারা যদি আল্লাহর নামে শপথ করে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাদের শপথ পূরণ করেন। (জামে তিরমিযি : ৩৮৫৪)

প্রকৃতপক্ষে যারা অহংকার করে, তাদের অন্তর অলীত্বের সুঘ্রাণ থেকে বেশ দূরে থাকে। আর তাদের অন্তর অধিকতর নিকটবর্তী, যারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েও বুঝে না যে, অপমান ও লাঞ্ছনা কী? যেমন, গোলাম কখনো অপমান বোধ করে না তার প্রভু যখন তার উপরের আসনে বসে। কাজেই আমাদের মধ্যে তাদের অন্তর যদি এমন না থাকে এবং এমন আত্মা থেকে যদি আমরা মাহরূম হই, তবে যারা এর যোগ্য, তাদের এসব কারামাতের সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস না রাখা অনুচিত। কারণ, যদি কারও পক্ষে আল্লাহ তাআলার অলী হওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত অলীদের প্রতি মহব্বত ও ঈমান রাখা তো তার জন্য সম্ভব। হয়তো বা এর বদৌলতেই কিয়ামাতের দিন অলীদের সঙ্গে তার হাশর হয়ে যাবে। প্রসিদ্ধ হাদিসে আছে– اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ তার সাথেই মানুষ থাকে, যাকে সে ভালোবাসে। অধিকতর উপকারী অনুনয় ও বিনয়। হযরত ঈসা (আ)-এর বাণী তার প্রমাণ। বনি ইসরাঈলকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, শস্যদানা কোথায় গজায়? তারা বলল, মাটির মধ্যে। তিনি বললেন, আমি সত্য বলছি, হিকমত ও প্রজ্ঞাও সে অন্তরেই গজিয়ে উঠে, যা মাটির মতো হয়। (কূতুল কুলূব : ২ : ৭৪)

আল্লাহ তাআলার বন্ধুত্ব অনুসন্ধানকারী মনীষীরা নিজের নফসকে লাঞ্ছনার চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়েই এই মর্যাদা অর্জন করেছেন।

বর্ণিত আছে, জুনাইদ বাগদাদী (র)-এর ওস্তাদ ইবনে কুরায়বীকে এক লোক দাওয়াত দিল। সে লোকের ঘরের দরজায় তিনি পৌঁছলে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি কিছুদূর চলে গেলে লোকটি তাঁকে পুনরায় ডাক দেয়। তিনি কাছে এলে আবার তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এভাবে

তিনবার ডাকা হয় এবং তাড়িয়ে চতুর্থবার ডাকার পর যখন তিনি আসলেন, তখন তাঁকে ঘরে নিয়ে যান এবং বলেন, ক্ষমা করবেন, আমি আপনার বিনয় পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই আপনাকে বারবার তাড়িয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, আমি আমার নফসকে বিশ বছর যাবৎ লাঞ্ছনায় অভ্যস্ত করেছি। ফলে সে এখন কুকুরের মতো হয়ে গেছে। তাড়িয়ে দিলে চলে যায়। হাড্ডি দিলে আবার ফিরে আসে। আমাকে যদি তুমি পঞ্চাশবারও তাড়িয়ে দিয়ে ডাকতে, তবুও আমি ফিরে আসতাম। (আর রিসালাতুল কুশায়রিয়্যা : ৪১৪)

ইবনে কুরায়বী (র) এক বর্ণনায় বলেন, আমি এক এলাকায় বসবাস করতাম। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সাধুতায় প্রসিদ্ধ হয়ে গেলাম। এতে আমার মন অস্থির হয়ে উঠল। একদিন আমি এক হাম্মামে (গোসল খানায়) গেলে সেখান থেকে ইচ্ছা করেই এক লোকের দামি কাপড় নিয়ে এলাম। এরপর সে কাপড়টি পরে তার ওপর আমার তালিযুক্ত রংবেরঙের ছেঁড়া কাপড় পরে নিলাম। রাস্তায় বের হতেই লোকেরা আমাকে ধরে ফেলে এবং আমার ছেঁড়াবস্ত্র খুলে সেই দামী কাপড়টি নিয়ে নেয়। শুধু তাই নয়, তারা আমাকে প্রচুর মারধরও করে। এরপর থেকে আমি হাম্মাম চোর বলে খ্যাত হয়ে গেলাম এবং আমার অশান্ত মনে প্রশান্তি ফিরে এলো। (কূতুল কুলূব : ২ : ৭৪)

এখন ভেবে দেখা কর্তব্য, নেককার লোকেরা কেমন সাধনার স্তর অতিক্রম করতেন, যার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের মনোযোগ মানুষের নিকট থেকে এমনকি নিজের নফস তথা সত্তার নিকট থেকেও ফিরিয়ে নেন। কারণ, যে লোক নিজের নফসের দিকে লক্ষ রাখে, সে আল্লাহ থেকে আড়ালে থাকে এবং প্রবৃত্তির দিকে এই দৃষ্টিই তার জন্য আড়াল হয়ে যায়। সবচেয়ে বেশি আড়াল হচ্ছে নিজের নফসকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা।

বুস্তামের এক প্রভাবশালী লোক আবু ইয়াযীদ বুস্তামীর দরবারে সবসময় হাজির থাকত। একদিন সে নিবেদন করল, আমি ত্রিশ বছর যাবৎ এক টানা রোযা রাখছি এবং রাত জেগে নফল ইবাদত করছি। অথচ এত সাধনা করেও যে জ্ঞান আপনি বর্ণনা করেন, তা আমার অন্তরে বিদ্যমান পাচ্ছি না। অথচ এই জ্ঞানকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং ভালোবাসি। আবু ইয়াযীদ (র) বললেন, ত্রিশ বছর কেন, তুমি যদি তিনশ' বছরও রোযা রাখো

এবং রাত্রি জাগরণ করে নফল ইবাদত করো, এরপরও এই জ্ঞানের বিন্দু পরিমাণও পাবে না। লোকটি এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, কারণ হচ্ছে, তুমি আল্লাহ তাআলা থেকে আড়ালে আছো নিজের প্রবৃত্তির কারণে। লোকটি নিবেদন করল, তাহলে এর প্রতিকার কী? তিনি তখন বললেন, প্রতিকার আছে; কিন্তু তুমি তা মানবে না। সে বলল, আপনি বলুন, যাতে আমি তা পালন করতে পারি। তিনি বললেন, নাপিতের নিকট গিয়ে এখনি মাথা ও দাড়ি মুন্ডন করো। এই পোশাক ফেলে দিয়ে তালিযুক্ত পোশাক পরো। মাথায় বেতের একটি ঝুড়ি তুলে নাও। রাস্তায় গিয়ে তোমার চারপাশে লোকজন জড়ো করো। এরপর তাদের বলো, যে আমাকে একটি থাপ্পড় মারবে, আমি তাকে একটি আখরোট দেব। এভাবে সব বাজারে যাও এবং তোমার যারা পরিচিত, তাদের নিকটও যাও এবং থাপ্পড় খেয়ে খেয়ে আখরোট বিলি করো। লোকটি বললো, সুবহানাল্লাহ! আমাকে আপনি এরকম কথা বললেন! তিনি বললেন, তোমার "সুবহানাল্লাহ" বলা শিরক। কারণ, তোমার প্রবৃত্তিকে তুমি বড় জ্ঞান করে "সুবহানাল্লাহ" বলেছ। আল্লাহ তাআলার তাযীমের জন্য বলোনি। লোকটি বলল, আমি তা করব না। অন্য কিছু বলুন। তিনি বললেন, সর্বাগ্রে এটাই করা প্রয়োজন। সে বললো, এটা করার সাধ্য আমার নেই। আবু ইয়াযীদ (র) বললেন, আমি তো আগেই বলেছিলাম, তুমি প্রতিকার মানতে পারবে না। (কূতুল কুলূব : ২ : ৭৪)

আবু ইয়াযীদ (র)-এর বর্ণিত এই প্রতিকারটি এমন ব্যক্তির জন্য, যে নিজের প্রবৃত্তির দিকে লক্ষ রাখে এবং মানুষের দৃষ্টি নিজের দিকে আশা করে। এই চিকিৎসা ব্যতীত এ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্য কোনো উপায় নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি এই চিকিৎসা করার শক্তি রাখে না, তার অন্তত এর কার্যকারিতায় বিশ্বাস রাখা উচিত। এই বিশ্বাসটুকুও যার মধ্যে নেই, তার দুর্ভোগ অনিবার্য। হাদিস শরীফে আছে–

لَايَسْتَكْمِلُ اِيْمَانُ الْعَبْدِ حَتّٰى تَكُوْنَ قِلَّةُ الشَّيْئِ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ كَثْرَتِهٖ وَحَتّٰى يَكُوْنَ اَنْ لَايُعْرَفَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يُّعْرَفَ.

অর্থাৎ, বান্দার ঈমান পরিপূর্ণ হয় না, যে পর্যন্ত তার নিকট কোনো জিনিসের কম বেশির অনুপাতে খুব প্রিয় না হয় এবং যে পর্যন্ত প্রসিদ্ধ না হওয়া তার নিকট প্রসিদ্ধ হওয়ার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় না হয়।

আরও বর্ণিত আছে–

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانُهُ لَايَخَافُ فِى اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَلَايَرَى الشَّيْئَ مِنْ عَمَلِهِ وَ اِذَا عُرِضَ اَمْرَانِ اَحَدُهُمَا لِلدُّنْيَا وَالثَّانِىْ لِلْاٰخِرَةِ اٰثَرَ اَمْرُ الْاٰخِرَةِ عَلٰى اَمْرِ الدُّنْيَا.

অর্থাৎ, যার মধ্যে তিনটি বিষয় পাওয়া যায়, তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। এক, আল্লাহ তাআলার কাজে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করা। দুই, লৌকিকতার জন্য কোনো আমল না করা। তিন, সামনে দু'টি বিষয় উপস্থিত হলে, একটি দুনিয়ার ও অপরটি পরকালের, পরকালের বিষয়টিকে বেছে নেওয়া। (মুসনাদে ফেরদাউস : ২৪৫৫)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, বান্দার মধ্যে তিনটি স্বভাব যে পর্যন্ত না পাওয়া যায় তার ঈমান পূর্ণ হয় না। ১. যখন সে রাগান্বিত হয়, তখন তার রাগ তাকে হক থেকে সরিয়ে দেয় না। ২. যখন সে খুশি হয়, তখন খুশি তাকে অসত্যের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেয় না। ৩. যখন সে শক্তিশালী হয়, তখন যা তার নয়, সে তা গ্রহণ করে না। (মুজামে সগীর, তাবারানি : ১ : ৬১)

অন্য হাদিসে রয়েছে,

ثَلَاثٌ مَنْ أُوْتِيَهُنَّ فَقَدْ أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ دَاوُدَ فَقِيْلَ لَهُ مَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَلْعَدْلُ فِي الرِّضٰى وَالْغَضَبِ وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَخَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ.

তিনটি বিষয় এমন রয়েছে, যাকে তা দেওয়া হয় সে দাউদ (আ)-এর সমপরিমাণ পাবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সে তিনটি বিষয় কী? তিনি বললেন, ক্রোধ, আনন্দ এবং দারিদ্র্য ও স্বচ্ছলতার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা। (নাওয়াদিরুল উসুল ফি আহাদিসির রাসূল, তিরমিযি (র) : ২:৭)

এই তিনটি হচ্ছে ঈমানদার হওয়ার শর্ত, যা রাসূলুল্লাহ (স) বর্ণনা করেছেন। সুতরাং সে লোকের জন্য বিস্মিত হই, যে নিজেকে ধার্মিক বলে অথচ এর সামান্য পরিমাণও নিজের মধ্যে ধারণ করে না। এগুলো ছাড়া ঈমানের পরে যে স্তরগুলো লাভ হয়, সে সেগুলোও অস্বীকার করে।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর এক নবীর নিকট ওহি পাঠালেন, আমি ওই ব্যক্তিকে আমার বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করি, যে আমার যিকিরে অলসতা করে না। আমাকে ছাড়া অন্য কিছু ভাবে না এবং আমার ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেয় না। যদি তাকে আগুনে পোড়ানো হয়, সে পোড়ার কষ্ট পায় না এবং যদি তাকে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়, সে চেরার কষ্ট অনুভব করে না। (কূতুল কুলূব : ২ : ৭৭)

যে ব্যক্তি মহব্বতের এমন স্তরে পৌঁছে না, সে কারামত ও মুকাশাফার স্তরে পৌঁছবে কীভাবে? এ স্তর অর্জিত হয় পরিপূর্ণ মহব্বতের পর আর মহব্বতের পূর্ণতা আসে ঈমানের পূর্ণতার মাধ্যমে। ঈমানের স্তরে কমবেশি অসংখ্য পার্থক্য রয়েছে।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (স) আবু বকর (রা)-কে বলেছেন, আমার উম্মতের সকল ঈমানদারের সমপরিমাণ ঈমান আল্লাহ তোমাকে দান করেছেন। আর আমাকে দান করা হয়েছে আদম (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে তাদের সমপরিমাণ ঈমান। (মুসনাদুল ফেরদাউস : ৮২৭০)

অন্য হাদিসে রয়েছে, আল্লাহ তাআলার তিনশটি গুণ রয়েছে। যে ব্যক্তি তাওহীদের সাথে একটি গুণ নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মধ্যে কি এর একটি গুণও রয়েছে? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আবু বকর! তোমার মধ্যে এর সবগুলোই রয়েছে। আর এসব গুণের মধ্যে দানশীলতা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। (তারীখে দিমাশক : ৩০ : ১০৪)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আসমানে একটি দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হয়েছে। যার এক পাল্লায় আমাকে আর অপর পাল্লায় আমার উম্মতকে রাখা হয়েছে। তখন আমার পাল্লা ভারি হয়ে গেল। এরপর এক পাল্লায় আবু বকরকে আর অপর পাল্লায় আমার উম্মতকে রাখা হলো তখন আবু বকরের পাল্লা ভারি হয়ে গেল। (মুসনাদে আহমদ : ৫ : ২৫৯)

এসকল বর্ণনা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার সাথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর এমন অন্তরঙ্গতা ছিল যে, এ ক্ষেত্রে অন্য কারও কোনো সুযোগ ছিল না। রাসূলূল্লাহ (স) বলেছেন, আমি যদি কাউকে বন্ধু বানাতাম তাহলে আবু বকরকে বানাতাম। কিন্তু তোমাদের এ সঙ্গী (অর্থাৎ, মুহাম্মদ স.) তো আল্লাহর বন্ধু। (সহিহ বুখারী : ৪৬৬; সহিহ মুসলিম : ২৩৮২)

মহব্বত সম্পর্কিত কিছু কথা

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, মহব্বত হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করা।

কারও মতে, ধারাবাহিক যিকিরকে মহব্বত বলে। কেউ বলেন, মাহবুবকে প্রাধান্য দেওয়াই হলো মহব্বত। অপরের মতে, পৃথিবীতে বেঁচে থাকাকে অপছন্দ করাই হলো মহব্বত। (তাহযীবুল আসরার : ৮৯-৯০)

এখানে প্রত্যেকেই মহব্বতের ফলাফলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন; মূল মহব্বতের প্রতি নয়।

এক বুযুর্গ বলেন, মহব্বত হলো মাহবুবের এমন কথা, যা অন্তরকে প্রভাবিত করে। অন্তর তা বুঝতে এবং জবান তা বর্ণনা করতে অক্ষম। জুনাইদ বাগদাদী (র) বলেন, আল্লাহ তাআলা সম্পর্ক স্থাপনকারীর ওপর মহব্বত হারাম করেছেন।

তিনি আরও বলেন, যে মহব্বত কোনো উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তা দীর্ঘ হয় না। উদ্দেশ্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে মহব্বতও শেষ হয়ে যায়। (তাহযীবুল আসরার : ৯০)

জুন্নুন মিসরী (র) বলেন, আল্লাহর মহব্বত প্রকাশকারীকে বলে দাও, সে যেন গায়রুল্লাহর জন্য অপমানিত না হয়।

শিবলী (র)-কে বলা হলো, আরেফ ও মহব্বতকারী সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন, আরেফ কথা বলার কারণে ধ্বংস হয় আর মহব্বতকারী চুপ থাকার কারণে ধ্বংস হয়। (তাহযীবুল আসরার : ৯১)

শিবলী (র) বলেছেন,

يا أَيُّهَا السَّيِّدُ الْكَرِيْمُ - حُبُّكَ بَيْنَ الْحَشَا مُقِيْمُ.

يَا رَافِعَ النَّوْمِ عَنْ جُفُوْنِيْ - أَنْتَ بِمَا مَرَّبِيْ عَلِيْمُ.

হে আমার মহান প্রভু! আপনার ভালোবাসা আমার অন্তরে বাসা বেঁধেছে। হে আমার চোখের নিদ্রা দূরকারী! আমার মনের অবস্থা আপনিই ভালো জানেন।

এক বুযুর্গ বলেছেন,

عَجِبْتُ لِمَنْ يَقُوْلُ ذَكَرْتُ رَبِّيْ ـ وَهَلْ أَنْسٰى فَأَذْكُرَ مَا نَسِيْتُ.

أَمُوْتُ إِذَا ذَكَرْتُكَ ثُمَّ أَحْيَا ـ وَلَوْلَا حُسْنُ ظَنِّيْ مَا حَيِيْتُ.

فَأَحْيَا بِالْمُنٰى وَأَمُوْتُ شَوْقًا ـ فَكَمْ أَحْيَا عَلَيْكَ وَكَمْ أَمُوْتُ.

شَرِبْتُ الْحُبَّ كَأْسًا بَعْدَ كَأْسٍ ـ فَمَا نَفِدَ الشَّرَابُ وَمَا رَوِيْتُ.

فَلَيْتَ خَيَالَهٗ نَسْبٌ لِعَيْنِيْ ـ فَإِنْ أَقْصَرْتُ فِيْ نَظَرِيْ عَمِيْتُ.

আমি ওই ব্যক্তির ব্যাপারে অবাক হই, যে বলে, আমি রবকে স্মরণ করেছি। আচ্ছা! আমি কি তাঁকে ভুলে যাই যে, স্মরণ করব! তাঁর স্মরণে আমি মৃত্যু বরণ করি আবার জীবিত হই। যদি আমার সুধারণা না থাকত তাহলে আমি জীবিত থাকতাম না। আমি আশায় বেঁচে থাকি আর আগ্রহে মৃত্যু বরণ করি। আমি বারবার আপনার জন্য মরি, বারবার আপনার জন্য বাঁচি। আমি পেয়ালার পর পেয়ালা মহব্বতের শরাব পান করেছি। কিন্তু শরাব শেষ হলো না, আর আমিও তৃপ্ত হলাম না। আহ! তাঁর কল্পনা যদি আমার চোখে ভেসে থাকত। যদি তাঁকে দেখতে আমি অলসতা করি তাহলে অন্ধ হওয়াই আমার জন্য শ্রেয়। (শারহু নাহজিল বালাগাহ : ১১ : ৭৯-২৩৫)

একদিন রাবেয়া বসরী (র) বললেন, কেউ কি আছে, যে আমাকে আমার হাবীবের ঠিকানা বলে দিবে? তখন তার এক সেবিকা বলল, আমাদের হাবীব আমাদের সাথেই রয়েছেন; কিন্তু দুনিয়া আমাদেরকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। (তাহযীবুল আসরার : ৯৩)

ইবনুল জালা (র) বলেন, আল্লাহ তাআলা ঈসা (আ)-এর কাছে ওহি পাঠিয়ে বললেন, আমি যখন কোনো বান্দার গোপন বিষয়ে অবগত হই আর তার মাঝে দুনিয়া ও আখেরাতের মহব্বত না পাই তাহলে তাকে আমার মহব্বতে পরিপূর্ণ করে দেই এবং তাকে আমার রক্ষণাবেক্ষণে নিয়ে নেই। (তাহযীবুল আসরার : ৯৩)

বর্ণিত আছে, সামনুন (র) একবার মহব্বত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, হঠাৎ একটি পাখি এসে সামনে বসল এবং অনবরত ঠোঁট

দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে লাগলো। এক পর্যায়ে ঠোঁট থেকে রক্ত বেরোলে সে মারা গেল।

ইবরাহিম ইবনে আদহাম (র) তার দুআয় বলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে নিজের মহব্বতের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। আপনার যিকিরের মাধ্যমে আমাকে অন্তরঙ্গ করেছেন। আপনার বড়ত্বের ফিকিরের জন্য আমাকে নির্দিষ্ট করেছেন। আপনি জানেন, এসবের তুলনায় জান্নাত আমার কাছে মশার ডানার চেয়েও নগণ্য। (তাহযীবুল আসরার : ৯৪)

সিররী সিকতী (র) বলেন, যে আল্লাহকে ভালোবাসে, সে জীবিত থাকে আর যে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়, সে ধ্বংস হয়। নির্বোধ তো ওই ব্যক্তি, যে সকাল-সন্ধ্যা অনর্থক কাজে লিপ্ত থাকে। আর জ্ঞানী তো সে, যে নিজের দোষত্রুটি তালাশ করে। (তাহযীবুল আসরার : ৯৬)

রাবেয়া বসরী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ (স)-কে আপনি কেমন মহব্বত করেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তাঁকে আমি প্রচণ্ড মহব্বত করি। কিন্তু স্রষ্টার মহব্বত আমাকে মাখলুকের মহব্বত থেকে বিরত রেখেছে। (তাহযীবুল আসরার : ৯৬)

ঈসা (আ)-কে উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং তাঁকে মহব্বত করা। (তাহযীবুল আসরার : ৯৬)

আবু ইয়াযিদ (র) বলেন, মহব্বতকারী দুনিয়া ও আখেরাত কোনোটাকেই মহব্বত করে না। বরং সে তার মনিবের মাধ্যমে মনিবকেই চায়। (তাহযীবুল আসরার : ৯৯)

শিবলী (র) বলেন, মহব্বত হলো আনন্দে ও সম্মান প্রদর্শনে হতবুদ্ধি হওয়া। এক বুযুর্গ বলেন, মহব্বত হলো নিজের নাম ও চিহ্ন মিটিয়ে দেওয়া, যেন তোমার মাঝে এমন কিছু না থাকে, যা তোমার থেকে তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এটাও বলেছেন, মহব্বত হলো খুশি ও আনন্দের সাথে মাহবুবের অন্তরের নৈকট্য। (তাহযীবুল আসরার : ১০০-১০১)

খাওয়াস (র) বলেন, মহব্বত হলো নিজ ইচ্ছাকে মিটিয়ে দেওয়া এবং সকল বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজন দূর করে দেওয়া।

সাহল তস্তরী (র) বলেন, বান্দার উদ্দেশ্য বোঝার পর তার অন্তরকে নিজের মুশাহাদার দিকে ধাবিত করার নাম মহব্বত।

এক বুযুর্গ বলেন, মহব্বতকারী চারটি স্তর অতিক্রম করে। মহব্বত, ভয়, লজ্জা ও সম্মান। এগুলোর মধ্যে মহব্বত ও সম্মান হলো উত্তম। কারণ, এদুটি স্তর জান্নাতে জান্নাতবাসীদের সাথে অবশিষ্ট থাকবে আর বাকি দুই স্তর তুলে নেওয়া হবে।

হারিম ইবনে হাইয়ান (র) বলেন, মুমিন যখন তার রবকে চিনতে পারে তখন তাকে মহব্বত করে। যখন মহব্বত করে তখন তাঁর প্রতি অগ্রসর হয়। যখন অগ্রসর হওয়ার স্বাদ অনুভব করে তখন দুনিয়ার প্রতি প্রবৃত্তির দৃষ্টিতে এবং আখেরাতের প্রতি অলসদৃষ্টিতে তাকায় না। তার দেহ দুনিয়াতে থাকে আর মন থাকে আখেরাতে। (তাহযীবুল আসরার : ১০২)

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (র) বলেন, আমি ইবাদতগুজার এক মহিলাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় বলতে শুনেছি, আল্লাহর শপথ! জীবনের প্রতি আমার বিরক্তি চলে এসেছে। যদি আমি জানতাম, কোথাও মৃত্যু কেনা-বেচা হয় তাহলে আমি আল্লাহর মহব্বতে ও তাঁর সাক্ষাতের আগ্রহে মৃত্যু ক্রয় করতাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নিজের আমলের ওপর নিশ্চিন্ত? তিনি বললেন, নিশ্চিন্ত নই তবে আমি তাঁকে মহব্বত করি এবং তাঁর প্রতি সুধারণা রাখি। আপনার কী মনে হয়, আমি তাঁকে মহব্বত করব আর তিনি আমাকে শাস্তি দিবেন? (তাহযীবুল আসরার : ১০৮)

আল্লাহ তাআলা দাউদ (আ)-এর নিকট ওহি প্রেরণ করলেন, যারা আমার থেকে বিমুখ থাকে তারা যদি জানত, আমি তাদের অপেক্ষায় আছি। তাদের সাথে কেমন কেমন আচরণ করব এবং আমি তাদের গুনাহ ত্যাগের প্রতি কতটা আগ্রহী তাহলে তারা আমার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহে মারা যেত। আমার মহব্বতে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথক হয়ে যেত। দাউদ! আমার থেকে বিমুখতা প্রদর্শনকারীদের ব্যাপারে আমার এমন ইচ্ছা, সুতরাং যারা আমার প্রতি আগ্রহী তাদের ব্যাপারে আমার ইচ্ছা কেমন হতে পারে? দাউদ! বান্দা আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী ওই সময় হয় যখন সে আমার ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে যায়, আর আমার বান্দার প্রতি ওই সময় অধিক দয়া হয় যখন সে আমার প্রতি বিমুখতা প্রকাশ করে। আর সে অধিক সম্মানের অধিকারী হয় ওই সময় যখন সে আমার দিকে ফিরে আসে। (তাহযীবুল আসরার : ১০৮)

আবু খালেদ সফফার (র) বলেন, এক নবীর এক আবেদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। নবী তাকে বললেন, তোমরা যেভাবে আমল করো আমরা সেভাবে আমল করি না। তোমরা আমল করো ভয় ও আশার ভিত্তিতে আর আমরা আমল করি আগ্রহ ও মহব্বতের ভিত্তিতে। (তাহযীবুল আসরার : ১০৯)

শিবলী (র) বলেন, আল্লাহ তাআলা দাউদ (আ)-এর নিকট ওহি পাঠালেন। দাউদ! আমার যিকির যিকিরকারীদের জন্য। আমার জান্নাত আনুগত্যকারীদের জন্য। আমার দীদার আমার প্রতি অনুরাগীদের জন্য আর আমি মহব্বতকারীদের জন্য নির্দিষ্ট। (তাহযীবুল আসরার : ১০৯)

আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-এর কাছে ওহি পাঠালেন, আদম! যে ব্যক্তি তার হাবীবকে মহব্বত করে, সে তার কথা বিশ্বাস করে। যে হাবীবের ঘনিষ্ঠ হয়, সে তার কাজে সন্তুষ্ট থাকে। আর যে হাবীবের প্রতি অনুরাগী, সে তার কাছে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে।

খাওয়াস (র) হাত দিয়ে তার বুকে আঘাত করে বলতেন, হায়! তাঁর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা, যিনি আমাকে দেখেন। কিন্তু আমি তাকে দেখি না। (তাহযীবুল আসরার : ১১০)

জুনাইদ বাগদাদী (র) বলেন, হযরত ইউনুস (আ) এত পরিমাণ কেঁদেছেন যে, এক পর্যায়ে তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন। এ পরিমাণ দাঁড়িয়ে থেকেছেন, তার কোমর ঝুঁকে গেছে। এত পরিমাণ নামায পড়েছেন, তাঁর নড়াচড়ার শক্তি শেষ হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ! আপনার ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম! যদি আমার ও আপনার মাঝে আগুনের সমুদ্র থাকত তাহলে আপনার প্রতি আগ্রহের কারণে আমি তাতেও ঝাঁপ দিতাম। (তাহযীবুল আসরার : ১১১)

হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর তরিকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, মারেফাত আমার মূলধন। আকল আমার দীনের মূল। মহব্বত আমার ভিত্তি। অনুরাগ আমার বাহন। আল্লাহর যিকির আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। ভরসা আমার খাজানা। চিন্তা আমার সাথি। ইলম আমার অস্ত্র। ধৈর্য আমার চাদর। সন্তুষ্টি আমার গনিমত। অপারগতা আমার গর্ব। যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা) আমার পেশা। একীন আমার শক্তি। সততা আমার সুপারিশকারী। আনুগত্য আমার মহব্বত।

জিহাদ আমার স্বভাব। আর আমার চোখের শীতলতা হলো নামায। (তাহযীবুল আসরার : ১১২; আশ শিফা, কাযী ইয়ায : ১৯১)

যুন্নুন মিসরী (র) বলেন, পবিত্র ওই সত্তা, যিনি রূহসমূহকে সৈন্য বানিয়েছেন। আরেফগণের রূহ সম্মানিত ও পবিত্র। তাই তারা আল্লাহর প্রতি অনুরাগী হয়। আর মুমিনদের রূহ হলো আধ্যাত্মিক। এ কারণে তারা জান্নাতের প্রতি আকৃষ্ট। পক্ষান্তরে গাফেলদের রূহ হলো প্রবৃত্তি বিশিষ্ট। ফলে তারা দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী থাকে। (তাহযীবুল আসরার : ১১২)

এক বুযুর্গ বলেন, আমি লিকাম পাহাড়ে এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যার গায়ের রং তাম্র বর্ণের আর দেহ খুব দুর্বল। সে পাহাড়ের এক পাথর থেকে অন্য পাথরে লাফাচ্ছিল। আর বলছিল,

اَلشَّوْقُ وَالْهَوٰى ـ صَيَّرَانِىْ كَمَا تَرٰى.

আগ্রহ ও অনুরাগ আমার এ অবস্থা করেছে। যেমনটি তুমি দেখতে পাচ্ছ। (তাহযীবুল আসরার : ১১২)

বলা হয়ে থাকে, অনুরাগ আল্লাহ তাআলার আগুন, যা তিনি স্বীয় অলীদের অন্তরে প্রজ্বলিত করেন। ফলে তা অন্তরে অবস্থিত কল্পনা, ইচ্ছা ও প্রয়োজন সব জ্বালিয়ে দেয়। (তাহযীবুল আসরার : ১১৩)

মহব্বত, অনুরাগ, নৈকট্য ও সন্তুষ্টির জন্য এটুকু আলোচনাই যথেষ্ট।

চিন্তা-ফিকির

কোনো বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার নাম তাফাক্কুর বা চিন্তা-ফিকির এবং সে চিন্তার আলোকে শিক্ষাগ্রহণ করার নাম হলো ইবরত।

হাদিসে বর্ণিত আছে, ক্ষণিকের চিন্তাভাবনা এক বছরের ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (ইবনে হিব্বান)

পবিত্র কুরআনে শিক্ষা গ্রহণ ও চিন্তাভাবনার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর এটা অস্পষ্ট নয় যে, চিন্তাভাবনাই হলো আলোর চাবিকাঠি, শিক্ষালাভের উৎসমূল এবং জ্ঞান-গরিমা ও মারেফত লাভের উপায় ও মাধ্যম। অনেক মানুষ চিন্তাভাবনার মর্যাদা সম্পর্কে জানে; কিন্তু তারা এর ফলাফল সম্পর্কে অবগত নয়। তারা জানে না, চিন্তাভাবনা কীভাবে করতে হয়, কোন বিষয়ে করতে হয় এবং করার কারণ কী? এসব বিষয় বর্ণনা করা আবশ্যক। সেজন্য আমরা প্রথমে চিন্তা-ফিকিরের ফযিলত, তারপর তার বাস্তব অবস্থা ও ফলাফল আলোচনা করব। এরপর যে ক্ষেত্রে ফিকির করা যাবে, সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

চিন্তা-ফিকিরের ফযিলত

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের অনেক জায়গায় ফিকির তথা চিন্তার বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা করেছেন। একস্থানে ইরশাদ হয়েছে,

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا.

যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করে (ও বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তা নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। (সূরা আলে ইমরান : ১৯১)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কিছু লোক আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করলে রাসূলে কারীম (স) তাদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করো। স্বয়ং তাঁর সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করো না। কারণ, তোমরা কস্মিনকালেও তাঁর মহান মহিমা উদঘাটন করতে পারবে না।

বর্ণিত আছে, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) এক জাতির নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। তারা তখন চিন্তাভাবনায় নিমগ্ন ছিল। তিনি বললেন, কী ব্যাপার, তোমরা কথা বলছ না যে? তারা বলল, আমরা আল্লাহ তাআলার

সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছিলাম। তিনি বললেন, এমনটি হলে তা-ই করো, আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কেই চিন্তা করো। স্বয়ং আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করো না। কেননা, এখান থেকে কাছেই একটি শুভ্র ভূখণ্ড আছে, যার আলো শুভ্র। আর এই শুভ্র আলোর দীর্ঘতা চল্লিশ দিনের পথ। সেখানে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি এমন সব লোক বসবাস করে, যারা আল্লাহ তাআলার নাফরমানী একদম করে না। সাহাবিরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! শয়তান তাদের কোন দিকে থাকে? তিনি বললেন— শয়তান সৃজিত হয়েছে কি না, সে কথাই তারা জানে না। তারা আরয করল, তারা কি হযরত আদম (আ)-এর সন্তান? উত্তর হলো— আদম পয়দা হয়েছে কি না, তারা তাও জানে না। (তাহযিবুল আসরার : ৩৯৩; বর্ণনাটি নিতান্তই যয়ীফ)

আতা (র) বর্ণনা করেন, একদিন আমি ও উবাইদ ইবনে ওমাইর হযরত আয়েশা (রা)-এর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি পর্দার আড়াল থেকে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। জিজ্ঞেস করলেন, উবাইদ! তুমি আজকাল আমার নিকট আসছ না কেন? উবাইদ বললেন, কারণ রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন— زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا—'বিরতি দিয়ে সাক্ষাৎ করো। তাতে মহব্বত বাড়বে।' (মুসতাদরাকে হাকেম : ৩ : ৩৪৭)

এরপর উবাইদ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এমন কোনো আশ্চর্য বিষয় বর্ণনা করুন, যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। একথা শুনে আয়েশা (রা) কেঁদে উঠলেন। তারপর বললেন, তাঁর সকল কিছুই ছিল বিস্ময়কর। এক রাতে তিনি আমার নিকট এলেন এবং আমার গা ঘেঁষে শুয়ে পড়লেন। এরপর বললেন, আমাকে আমার মাবুদের ইবাদত করতে দাও। এরপর তিনি উঠে একটি মশক থেকে পানি নিয়ে অযু করলেন এবং নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযে তিনি এতই ক্রন্দন করলেন যে, তার দাড়ি মোবারক ভিজে গেল। এরপর তিনি শুয়ে পড়লেন। মুয়াযযিন বেলাল ফজরের নামাযের কথা জানাতে এসে তাঁকে জায়নামাযে শায়িত দেখে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা তো আপনার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। এরপরও আপনি ক্রন্দন করেন কেন? তিনি বললেন, হে বেলাল! আমি ক্রন্দন করব না কেন? আজ রাতে আমার ওপর এ আয়াত নাযিল হয়েছে। (তাহযিবুল আসরার : ৬৯৪)

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ.

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে নিদর্শনাবলি রয়েছে বুদ্ধিমান লোকের জন্য। (সূরা আলে ইমরান : ১৯০)

তারপর তিনি ইরশাদ করলেন, সে ব্যক্তির দুর্ভোগ, যে এ আয়াত তিলাওয়াত করে কিন্তু সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে না। (তাহযিবুল আসরার : ৬৯৪)

আওযায়ী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, এই আয়াতে চিন্তাভাবনার সীমা কতটুকু? তিনি বললেন, এই আয়াত পড়ে তা বুঝে নেওয়া। (তাহযিবুল আসরার : ৬৯৪)

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে (র) বর্ণনা করেন, আবু যর (রা)-এর ইন্তেকালের পর এক বসরাবাসী তার মায়ের কাছে তার ইবাদত সম্পর্কে প্রশ্ন করল। আবু যর (রা)-এর মা বললেন, সে পুরো দিন ঘরের কোণে বসে বসে চিন্তাভাবনা করতো। (তাহযিবুল আসরার : ৬৯৫)

হাসান (র) থেকে বর্ণিত, এক মুহূর্তের চিন্তাভাবনা এক রাত্রি নফল ইবাদত থেকে উত্তম। (তাহযিবুল আসরার : ৬৯৫)

ফুযাইল (র) বলেন, চিন্তাভাবনা একটি আয়না। তাতে মানুষের সৎকর্ম ও কুকর্মসমূহের প্রতিফলন ঘটে। (তাহযিবুল আসরার)

ইবরাহীম ইবনে আদহামকে বলা হলো, আপনি অত্যধিক চিন্তাভাবনা করেন কেন? তিনি বললেন, চিন্তাভাবনা জ্ঞান-বুদ্ধির মূল। (তাহযিবুল আসরার : ৬৯৫)

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র) অধিকাংশ সময় এই পঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করতেন,

إِذَا ٱلْمَرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرَةٌ * فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةٌ.

অর্থাৎ, কেউ যখন বেশি বেশি চিন্তাভাবনা করে তখন সে প্রতিটি জিনিস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। (তাহযিবুল আসরার)

তাউস (র) বর্ণনা করেন, ঈসা (আ)-এর হাওয়ারীগণ (সাথীগণ) তাঁকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ জমিনে আপনার সমকক্ষ কেউ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যার কথাবার্তা যিকির হয়, চুপ থাকা চিন্তাভাবনা হয় এবং নজর শিক্ষা হয়, সে আমার সমকক্ষ। (তাহযিবুল আসরার : ৬৯৫)

হাসান বসরী (র) বলেন, যে কথা প্রজ্ঞাপূর্ণ নয় তা অনর্থক, যে নীরবতা চিন্তাভাবনাসম্পন্ন নয় তা ভুল, আর যে চিন্তাভাবনা শিক্ষালাভের জন্য করা হয় না তা অহেতুক কাজ ছাড়া কিছুই নয়। (তাহযিবুল আসরার)

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ.

পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রদর্শন করে, তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হতে ফিরিয়ে রাখি। (সূরা আরাফ : ১৪৬)

এ আয়াতের অর্থ বর্ণনায় হাসান বসরী (র) বলেন, আমি তাদের অন্তরকে আমার সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা থেকে বিরত রাখি। (তাহযিবুল আসরার)

আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা ইবাদতে চোখকে তার অংশ প্রদান করো। লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইবাদতে চোখের অংশ কী? তিনি বললেন, কুরআনুল কারীম দেখা, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং তার দুর্লভ বিষয়াদি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। (তাহযিবুল আসরার)

মক্কার নিকটবর্তী এক জনমানবহীন প্রান্তরে বসবাসকারিণী এক মহিলা বলতেন, যদি ফিকিরকারীদের অন্তর চিন্তাভাবনার বদৌলতে আখেরাতে তাদের জন্য বরাদ্দ কল্যাণসমূহ প্রত্যক্ষ করতে পারতো, তাহলে দুনিয়ার কোনো সুখই তাদের মনঃপূত হতো না এবং দুনিয়ার কোনো নিয়ামতেই তাদের চক্ষু শীতল হতো না। (তাহযীবুল আসরার : ৬৯৬)

লোকমান (আ) দীর্ঘ সময় একাকিত্বে কাটাতেন। একবার তাঁর মুনিব তার পাশ দিয়ে গমনকালে বললেন, হে লোকমান! কেন তুমি সর্বদা একা একা বসে থাকো? সবার সাথে বসলে তোমার ভালো লাগবে। লোকমান (আ) বললেন, এর দ্বারা দীর্ঘসময় চিন্তাভাবনা করা যায়। আর দীর্ঘ চিন্তাভাবনা জান্নাতের পথ দেখায়। (তাহযিবুল আসরার)

ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহ (র) বলেন, যে লোক দীর্ঘসময় চিন্তা-ফিকির করে সে ইলম অর্জন করতে পারে। আর যে ইলম অর্জন করে সে আমল করে। (তাহযিবুল আসরার)

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেন, আল্লাহ তাআলার নিয়ামত সম্পর্কে চিন্তা করা শ্রেষ্ঠতম ইবাদত। (তাহযিবুল আসরার)

একদিন সহল ইবনে আলীকে নিশ্চুপ চিন্তায় বিভোর দেখে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় পৌঁছলেন? তিনি বললেন, পুলসিরাতে। (তাহযিবুল আসরার)

বিশর (র) বলেন, মানুষ যদি আল্লাহর বড়ত্ব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে তাহলে সে আল্লাহর অবাধ্য হবে না। (তাহযিবুল আসরার)

আবু শুরাইহ্ (র) একদিন হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ রাস্তার মধ্যেই বসে পড়লেন এবং চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন, আমি আমার বয়স শেষ হয়ে যাওয়া, আমল স্বল্প হওয়া এবং মৃত্যু কাছাকাছি চলে আসার চিন্তা করছিলাম। (তাহযিবুল আসরার)

আবু সুলায়মান (র) বলেন, তোমরা চোখ দিয়ে ক্রন্দন করো আর অন্তর দিয়ে চিন্তাভাবনাকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করো। (তাহযিবুল আসরার : ৬৯৭)

তিনি আরও বলেন, দুনিয়ার চিন্তাভাবনা আখেরাত প্রাপ্তির পথে অন্তরায় আর শাসকবর্গের জন্য তা শাস্তির কারণ। অপরদিকে আখেরাতের চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রজ্ঞা লাভ হয় এবং অন্তর পুনর্জীবন লাভ করে। (তাহযিবুল আসরার)

হাতেম (র) বলেন, শিক্ষাগ্রহণ দ্বারা জ্ঞান, ফিকির দ্বারা আল্লাহ তাআলার মহব্বত আর চিন্তাভাবনা দ্বারা ভয়ভীতি বৃদ্ধি পায়। (তাহযিবুল আসরার)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ভালোকাজের চিন্তাভাবনা সে কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে আর মন্দ কাজে অনুতপ্ত হওয়া তা বর্জনের প্রতি আহ্বান করে। (তাহযিবুল আসরার)

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা কোনো এক আসমানি কিতাবে বলেছেন, যখন জ্ঞানী ব্যক্তি কোনো কথা বলে তখন তার ইচ্ছা ও বাসনা না দেখা অবধি আমি তার কথাকে কবুল করি না। যদি একমাত্র আমার সন্তুষ্টিই তার বাসনা হয় তাহলে আমি তার নীরবতাকে ফিকির আর তার কথাকে আমার প্রশংসা বানিয়ে দেই। যদিও সে কথা না বলে। (প্রাগুক্ত)

হাসান বসরী (র) বলেন, জ্ঞানীরা যিকিরের মাধ্যমে ফিকিরকে এবং ফিকিরের মাধ্যমে যিকিরকে নিজেদের অভ্যাস বানিয়ে নেয়। একপর্যায়ে তাদের অন্তর প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাবার্তা বলতে থাকে। (প্রাগুক্ত)

ইসহাক ইবনে খলফ (র) বলেন, দাউদ তাঈ (র) একবার জোছনা রাতে এক ছাদের উপর দাঁড়িয়ে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে কেঁদে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সেখান থেকে এক প্রতিবেশীর ঘরের উপর পড়ে গেলেন। ঘরকর্তা চোর মনে করে তরবারি হাতে তাঁর দিকে দৌড়ে এলো। অতঃপর দাউদকে দেখে তরবারি রেখে জিজ্ঞেস করল— আপনাকে ছাদের উপর থেকে কে ফেলে দিল? তিনি বললেন— আমি জানি না। (তাহযিবুল আসরার)

হযরত জুনাইদ (র) বলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ মজলিস হচ্ছে তাওহীদের মাঠে চিন্তাভাবনা সহকারে বসে মারেফাতের বাতাস উপভোগ করা, একত্বের সমুদ্র থেকে মহব্বতের পেয়ালা পান করা এবং আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা। এরপর বলেন, এই মজলিসগুলো খুবই উত্তম এবং এই পানীয়গুলো খুবই মজাদার। সুখী সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা এগুলো দান করেন। (তাহযীবুল আসরার : ৬৯৮)

ইমাম শাফেয়ি (র) বলেন, তোমরা নীরবতা অবলম্বন করে কথার শক্তি অর্জন করো এবং চিন্তাভাবনার মাধ্যমে নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করো।

অন্যত্র তিনি বলেন; যাবতীয় বিষয়ে সঠিক চিন্তাভাবনা ভুল থেকে রক্ষা করে, মতামতের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা বাড়াবাড়ি ও লজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচায়। চিন্তা ও গবেষণা বিচক্ষণতার প্রমাণ বহন করে আর জ্ঞানীদের সাথে পরামর্শ স্বকীয়তা ও বিচক্ষণতায় দৃঢ়তা আনে। কাজেই কোনো সংকল্প করার পূর্বে ভেবে দেখো, কোনো কাজ করার আগে চিন্তাভাবনা করে নাও আর কোনো দিকে অগ্রসর হওয়ার আগে জ্ঞানীদের পরামর্শ গ্রহণ করো। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন : ১০ : ১৬৫)

তিনি আরও বলেন, ফযিলত চারটি জিনিসের মধ্যে রয়েছে, ১. হেকমত। এটা চিন্তাভাবনার মাধ্যমে সুদৃঢ় হয়। ২. চারিত্রিক নিষ্কলুষতা। প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বেঁচে থাকাই এর ভিত্তি। ৩. ক্ষমতা। রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখার মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। ৪. ইনসাফ। তা আত্মিক শক্তির জায়গাগুলোতে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের নাম। (ইতহাফুস যাদাতিল মুত্তাকীন)

চিন্তা ফিকির সম্পর্কে এই হলো ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য। যদিও তাদের কেউই চিন্তা-ফিকিরের হাকিকত ও তার ক্ষেত্রগুলো নিয়ে কোনো বক্তব্য দেননি।

চিন্তাভাবনার স্বরূপ ও ফলাফল

ফিকির অর্থ হচ্ছে অন্তরে দুটি মারেফাত সৃষ্টি করা, যেন এগুলোর দ্বারা তৃতীয় আরেকটি মারেফাত হাসিল হয়। যেমন এক লোক দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়। এরপর সে জানতে পারে যে, দুনিয়ার চেয়ে পরকাল অবলম্বন করা উত্তম। এখন এ জ্ঞান অর্জন করার দুটি পথ আছে। প্রথমত, পরকাল যে উত্তম, একথা অপরের নিকট শোনা এবং শোনা মাত্রই না দেখে তা সত্য বলে মেনে নেওয়া। এ উপায়ের মধ্যে বিষয়ের স্বরূপ সম্পর্কিত জ্ঞান কার্যকর থাকে না। শুধু অপরের কথায় আস্থা স্থাপন করে পরকালকে প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষাবলম্বী হওয়া যায়। এ উপায়কে বলা হয় "তাকলীদ"। অর্থাৎ, অনুসরণ। দ্বিতীয়ত, প্রথমে একথা জানা যে, স্থায়ী ও চিরন্তন বস্তু অবলম্বন করা শ্রেষ্ঠ। এরপর জানা যে, পরকাল চিরন্তন। এ দুটি মারেফাত তথা জানার সাহায্যে একটি তৃতীয় মারেফাত লাভ করা। এই তৃতীয় বিষয়টি অবগত হওয়া প্রথমোক্ত দুটি বিষয়ের জ্ঞান ব্যতীত সম্ভব নয়। সুতরাং তৃতীয় মারেফাত পর্যন্ত পৌঁছার জন্য অন্তরে প্রথমোক্ত দুটি মারেফাত সৃষ্টি করাকে বলা হয় ফিকির, তাফাক্কুর, তাদাব্বুর ও তাআম্মুল। এগুলো সবই সমার্থবোধক।

আর তাযাক্কুর, ইতেবার ও নযর, এগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র এক হলেও অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। যেমন صارم (সারেম), مهند (মুহান্নাদ) এবং سيف (সাইফ। এগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র এক কিন্তু অর্থ ভিন্ন ভিন্ন।

صارم বলা হয় ওই তরবারিকে, যা দ্বারা কোনো কিছু কাটা হয়, مهند হিন্দুস্তানি তরবারিকে বলে আর سيف বলতে কোনো নির্দিষ্ট তরবারি নয় বরং সবধরনের তরবারিকে বোঝায়।

এমনিভাবে দুটি মারেফাত তথা জানার সাহায্যে একটি তৃতীয় মারেফাত লাভ করাকে ইতেবার বলে। আর যদি তৃতীয় মারেফাত লাভ না হয় বরং দুটি মারেফাতের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তাকে বলা হয় তাযাক্কুর।

আর দুটি মারেফাতের সাহায্যে তৃতীয় মারেফাত লাভের তলবকে নযর ও তাফাক্কুর বলে। সুতরাং যে তৃতীয় মারেফাত লাভ করতে চায় না সে ناظر

(নাযের) নয়। বোঝা গেল, সকল متفكر (মুতাফাক্কির) متذكر (মুতাযাক্কির)-ও বটে, কিন্তু সকল متذكر (মুতাযাক্কির) متفكر (মুতাফাক্কির) নয়।

তাযাক্কুরের ফায়েদা হলো, এর দ্বারা অন্তরে মারেফাতের পুনরাবৃত্তি হয়। ফলে তা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং অন্তর থেকে কখনো মুছে যায় না।

চিন্তা-ফিকিরের উপকারিতা

জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া এবং যে মারেফাত ছিল না, তা হাসিল হওয়াই হচ্ছে ফিকিরের উপকারিতা। অন্তরে যখন মারেফাতসমূহ এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় অর্জিত হয়, তখন সেগুলো থেকে আরও মারেফাত বের হয়। অর্থাৎ, নতুন মারেফাতটি প্রথম মারেফাতের ফলাফল। যখন এই নতুন মারেফাতটি অন্য মারেফাতের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন এ থেকে আরও একটি ফল অর্জিত হয়। এমনিভাবে ফল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং জ্ঞানও বাড়তে থাকে। মারেফাতের এই প্রবৃদ্ধি মৃত্যু অথবা অন্য কোনো বাধার কারণেই শুধু বন্ধ হতে পারে।

দ্বিতীয় পন্থাটি সে ব্যক্তিই হাসিল করতে পারে, যে জ্ঞানের মাধ্যমে ফল লাভ করতে সক্ষম এবং চিন্তাভাবনার পন্থা সম্পর্কে অবগত। কিন্তু বেশিরভাগ লোক জ্ঞানবুদ্ধি থেকে মাহরূম। কারণ, তাদের নিকট পুঁজিই নেই। মাঝে মধ্যে মূলধন থাকে, কিন্তু ব্যবসার নিয়মনীতি জানা না থাকার কারণে লাভবান হতে পারে না। একইভাবে কখনো মানুষের নিকট মারেফাত থাকে, কিন্তু সেগুলো এমনভাবে কাজে লাগাতে পারে না, যাতে ফল লাভ হয়।

ব্যবহার পদ্ধতির জ্ঞান কখনো অন্তরে খোদায়ী নূরের বদৌলতে জন্মগতভাবে হাসিল হয়, যেমন নবীগণের ছিল। এটা খুবই বিরল। কখনো শিক্ষা ও দক্ষতা হাসিলের মাধ্যমে এ জ্ঞান হাসিল হয়। এটাই মানুষের মধ্যে অধিক।

ফিকিরকারীদের মধ্যে কখনো মারেফাত আসে এবং ফলও লাভ হয়। কিন্তু লাভ হওয়ার অবস্থা সে জানে না এবং বর্ণনা করতে পারে না। বর্ণনা শাস্ত্রে অদক্ষতাই এর কারণ। যেমন, অনেক মানুষ জানে পরকাল অবলম্বন করা উত্তম। কিন্তু তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তারা কখনো বর্ণনা করতে পারবে না।

মোটকথা, ফিকির হচ্ছে অর্জিত দুটি মারেফাত দ্বারা তৃতীয় মারেফাতটি লাভ করা। যেমন, প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে স্থায়ী বস্তু অগ্রগণ্য। আর আখেরাত দুনিয়ার চেয়ে স্থায়ী।

সুতরাং এখানে তৃতীয় মারেফাত লাভ হলো, তা হচ্ছে, প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে আখেরাত অগ্রগণ্য। ফিকিরের ফল জ্ঞান, হাল, আমল ইত্যাদি সবই হতে পারে। কিন্তু এর বিশেষ ফল হলো জ্ঞান। তবে অন্তরে যখন জ্ঞান হাসিল হয়, তখন অন্তরের হাল পরিবর্তন হয়ে যায়। অন্তরের হাল পরিবর্তন হয়ে গেলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলও পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, আমল হালের অনুসারী, হাল জ্ঞানের এবং জ্ঞান ফিকিরের অনুসারী। এ থেকে বোঝা গেল, ফিকির সকল নেক আমলের মূল উৎস। এ থেকে ফিকিরের ফযিলতও প্রমাণিত হয়। আরও প্রমাণিত হয় যে, ফিকির যিকিরের তুলনায় উৎকৃষ্ট। কারণ, ফিকিরের মধ্যে যিকির তো থাকেই। সাথে আরও কিছু বিষয় অতিরিক্ত থাকে। যিকির বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলের তুলনায় উত্তম। বরং আমলের বিস্তার এ কারণেই সাধিত হয় যে, এতে কিছু যিকিরও থাকে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ফিকির যাবতীয় ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ কারণেই বলা হয়েছে, এক মুহূর্তের ফিকির এক বছরের ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

এক বুযুর্গ বলেন, প্রকৃত মুতাফাক্কির ওই ব্যক্তি, যে নিজেকে মন্দ বিষয়াদি থেকে পছন্দনীয় বিষয়াদির প্রতি এবং লোভ-লালসা থেকে যুহদ ও অল্পে তুষ্টির দিকে ফিরিয়ে আনতে পারে। (কূতুল কুলূব : ১ : ১৪)

অন্য এক বুযুর্গ বলেন, ফিকির পর্যবেক্ষণ ও তাকওয়ার নাম। এজন্যই আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন,

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا.

যাতে তারা মুত্তাকি হয়, অথবা তা তাদের জন্য চিন্তার খোরাক যোগায়। (সূরা ত্বহা : ১১৩)

কেউ যদি ফিকিরের মাধ্যমে অবস্থা পরিবর্তনের স্বরূপ জানতে চায় তাহলে আখেরাত সম্পর্কে পূর্ববর্ণিত উপমাটিই তার জন্য যথেষ্ট। গভীরভাবে চিন্তা ফিকির করার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, আখেরাত দুনিয়ার চেয়ে অগ্রগণ্য। অতঃপর এই বিশ্বাসটি যখন অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়

তখন অন্তর পরিবর্তন হয়ে আখেরাত প্রাপ্তির প্রতিই আগ্রহী হয়। এটাই ফিকিরের মাধ্যমে অবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্য। কারণ ফিকিরের পূর্বে অন্তর দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট ছিল। আখেরাতের প্রতি তার কোনো মহব্বত ছিলো না। এরপর যখন সে ফিকিরের মাধ্যমে অনুধাবন করলো যে, দুনিয়ার তুলনায় আখেরাত অগ্রগণ্য, তখন তার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে আখেরাতের প্রতি ধাবিত হলো। অতঃপর এই পরিবর্তন বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে দুনিয়া বর্জন করে আখেরাতের জন্য আমল করতে বাধ্য করলো।

সারকথা, এখানে পাঁচটি স্তর রয়েছে। এক, তাযাক্কুর তথা অন্তরের দুটি মারেফাত লাভ। দুই, তাফাককুর তথা অর্জিত দুই মারেফাতের সাহায্যে তৃতীয় কাঙ্ক্ষিত মারেফাত তলব। তিন, প্রার্থিত মারেফাত হাসিল হওয়া এবং এর দ্বারা অন্তর নূরান্বিত হওয়া। চার, মারেফাতের নূর হাসিল হওয়ায় অন্তরের হাল পরিবর্তন হওয়া। পাঁচ, অন্তরের হাল পরিবর্তন হওয়ার মতো বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল পরিবর্তন হয়ে যাওয়া এবং অন্তরের খেদমত করা।

পাথর দ্বারা লোহাকে আঘাত করলে আগুন বের হয়। তার ফলে আশপাশ আলোকোজ্জ্বল হয়। চোঁখে দেখা যায় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমল করতে প্রস্তুত হয়। এমনিভাবে মারেফাতের নূর থেকে ফিকির জন্মলাভ করে। এই ফিকির উভয় মারেফাতকে সমন্বিত করে বিশেষভাবে সজ্জিত করে, যার ফলে মারেফাতের নূর ছড়িয়ে পড়ে। এরপর এই নূরের মাধ্যমে অন্তর পরিবর্তন হয় এবং পূর্বে যে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট ছিল না তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। যেমন, আগুনের আলোতে চোঁখের অবস্থা পাল্টে যায় এবং পূর্বে যা দেখা যেতো না, তা দেখা যায়। এরপর অন্তরের অবস্থার দাবি অনুযায়ী আমলের জন্য অঙ্গ গতিশীল হয়। যেমন, অন্ধকারের কারণে যে ব্যক্তি কাজ করতে পারতো না, আলো আসার পর সে কাজে সচেষ্ট হয়। সুতরাং জানা গেল, ফিকিরেরই ফল হচ্ছে জ্ঞান ও হাল। এই জ্ঞান ও হাল অসংখ্য।

ফিকিরের রাস্তাসমূহ

ফিকির কখনো দীন সম্পর্কিত বিষয়াদিতে আবার কখনো দীন সম্পর্কিত নয় এমন বিষয়াদিতে হয়ে থাকে। এখানে ধর্ম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ফিকর বর্ণনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ধর্ম সংশ্লিষ্ট বিষয় বলে আমাদের উদ্দেশ্য এমন বিষয়, যা আল্লাহ তাআলা ও বান্দার মধ্যে পাওয়া যায়। এখন ফিকির বান্দা, তার গুণাবলি ও হাল সম্পর্কিত বিষয়ে হবে, অথবা আল্লাহ তাআলা, তাঁর গুণাবলি ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে হবে।

বান্দা বিষয়ক ফিকির দুপ্রকার। এক, বান্দার এমন অবস্থা নিয়ে ফিকির, যা আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় এবং দুই, বান্দার এমন অবস্থা নিয়ে ফিকির, যা আল্লাহর অপছন্দনীয়। এ দুটি প্রকার ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে ফিকির করার দরকার পরে না।

আল্লাহ তাআলা সম্পর্কিত ফিকিরও দুই প্রকার। এক, আল্লাহ তাআলার সত্তা, গুণাবলি ও আসমাউল হুসনা নিয়ে ফিকির এবং দুই, তাঁর ক্রিয়াকর্ম, সাম্রাজ্য, আসমান, জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু নিয়ে ফিকির। ফিকিরের ক্ষেত্র এই চার প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর স্বরূপ এই উপমা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পথে চলে এবং তাঁর সাক্ষাত কামনা করে তার অবস্থা প্রেমিকের মতো। একজন প্রেমিক হয়তো তার প্রেমাস্পদকে নিয়ে চিন্তা করে অথবা নিজেকে নিয়ে ভাবে। প্রেমাস্পদকে নিয়ে ভাবার সময় হয়তো সে প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য্য নিয়ে চিন্তা করে তৃপ্তি লাভ করে অথবা তার উত্তম চরিত্র ও গুণাবলি নিয়ে চিন্তা করে তার প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি করে। আর যদি সে নিজেকে নিয়ে ভাবে তাহলে হয়তো সে তার ওইসব দোষত্রুটি নিয়ে চিন্তা করবে যেগুলো প্রেমাস্পদের দৃষ্টিতে তাকে খারাপ বানিয়ে দেয় অথবা ওইসব গুণাবলি নিয়ে চিন্তা করবে যেগুলো তাকে প্রেমাস্পদের নিকটবর্তী করে তুলতে পারে। কোনো প্রেমিক যদি এসবের বাইরে অন্যকিছু নিয়ে চিন্তা করে তাহলে সে প্রেমিকের কাতারেই পড়ে না। কারণ প্রকৃত প্রেমিক তো ওই ব্যক্তি, যে প্রেমের সাগরে ডুব দেয় এবং প্রেমাস্পদ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে

ভাবার অবকাশই পায় না। আল্লাহর প্রেমিকের অবস্থাও এমন হওয়া উচিত। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করা তার জন্য সমীচীন নয়।

নিচে আমরা ফিকিরের উপরিউক্ত চারটি প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১. বান্দার গুণাবলি ও কর্ম সম্পর্কে ফিকির করার উদ্দেশ্য হলো, বান্দার কোন কোন গুণ আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং কোনগুলো অপছন্দ করেন তা জানা। এই গুণ ও কর্ম আবার দুই প্রকার। বাহ্যিক, যেমন ইবাদত ও গুনাহ এবং অভ্যন্তরীণ; যেমন উদ্ধারকারী ও ধ্বংসকারী গুণাবলি। দ্বিতীয় প্রকারের পাত্র হচ্ছে বান্দার অন্তর। আর ইবাদত ও গুনাহের কোনোটির সম্পর্ক দেহের সাতটি অঙ্গের সাথে আর কোনোটির সম্পর্ক পূর্ণ দেহের সাথে। যেমন- যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন, পিতামাতার অবাধ্যাচরণ এবং হারাম ঘরে বসবাস ইত্যাদি। যেসব বিষয় আল্লাহ তাআলার নিকট অপছন্দনীয় তাতে তিন ধরনের ফিকির করতে হবে, এক. এই চিন্তা করা যে, কাজটি আল্লাহ তাআলার নিকট অপছন্দনীয় কি না? এমন অনেক কাজ রয়েছে যেগুলোকে বাহ্যত গুনাহর কাজ মনে হয় না; কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায়। দুই. কাজটি আল্লাহ তাআলার নিকট অপছন্দনীয় হলে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নিয়ে চিন্তা করা এবং তিন. ভেবে দেখবে যে, কাজটি সে বর্তমানে করছে নাকি ভবিষ্যতে করার সম্ভবনা আছে নাকি অতীতে করা হয়েছে। বর্তমানের সাথে সম্পৃক্ত হলে তা বর্জন করবে, ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত হলে তা থেকে বিরত থাকবে আর অতীতের সাথে সংশ্লিষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ করবে।

আল্লাহ তাআলার নিকট পছন্দনীয় কাজগুলোর মাঝে এই প্রকার বিন্যাস প্রযোজ্য হবে। যদি এইসব প্রকারগুলোকে একত্র করা হয় তাহলে তার সংখ্যা একশ ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু এই অংশটি চার প্রকারে বিভক্ত। যথা; পাপ, ইবাদত, ধ্বংসকারীগুণ ও উদ্ধারকারীগুণ। এই চার প্রকারের প্রত্যেকটির জন্য উপমা উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে ফিকিরের রাস্তা খুলে যায় ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং এর সাহায্যে আরও উদাহরণ বুঝে নেওয়া যায়।

প্রথম প্রকার : পাপ। মানুষের উচিত পাপ সম্পর্কে প্রতিদিন সকালেই চিন্তা করা যে, সে কোনো পাপ করছে কি না? যদি উপস্থিত ক্ষেত্রে কোনো

পাপে লিপ্ত থাকে, তবে তা ত্যাগ করবে। পূর্বে করে থাকলে তাওবার মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ করে নেবে। আর যদি সেদিন করবে এমন গুনাহ থাকে, তাহলে তা থেকে বিরত থাকার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। যেমন, নিজের জিহ্বা সম্পর্কে চিন্তা করবে, এর মাধ্যমে গীবত, মিথ্যা, আত্মপ্রশংসা, বিদ্রূপ, অনর্থক কথাবার্তা ইত্যাদি পাপ হয়ে থাকে। সুতরাং এসব পাপের কোনো একটিতে লিপ্ত থাকলে তা ত্যাগ করবে এবং অন্তরে একথা বদ্ধমূল করে নেবে যে, এসব বিষয় আল্লাহ তাআলার নিকট ঘৃণিত। কুরআন ও হাদিসে এসবের জন্য শাস্তি বর্ণিত রয়েছে। এরপর চিন্তা করবে যে, এগুলো থেকে কীভাবে বাঁচা যায়। এ প্রসঙ্গে জানা প্রয়োজন যে, একাকীত্ব অবলম্বন করা ব্যতীত জিহ্বার গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয় না। এর আরেকটি পথ, কোনো নেককার ব্যক্তির সংশ্রবে থাকা, যাতে সে কোনো অন্যায় কথা মুখ থেকে বের হলেই বাধা প্রদান করতে পারে। অথবা মানুষের নিকট বসার সময় মুখে পাথর রেখে দেওয়া, যাতে তা সর্বক্ষণ সংযমের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

একইভাবে কান সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, এর দ্বারাই গীবত, মিথ্যা, বাজে কথা, বিদআতী কথাবার্তা শোনা হয়। অতএব, এসব বিষয় শোনা থেকে বেঁচে থাকার উপায় হচ্ছে, একান্তে থাকা অথবা সম্মুখে কেউ এসব কথা বললে তাকে নিষেধ করা।

পেট সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, পেট খাওয়া-দাওয়ায় আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে। হালাল রিযিক প্রয়োজনাতিরিক্ত খেয়ে প্রবৃত্তি বাড়ায়, যা শয়তানের অস্ত্র, অথবা হারাম ও সন্দিগ্ধ খাদ্য খায়। সুতরাং দেখবে, তার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও রুজি কীভাবে আসে। সেই সাথে হালাল রিযিকের ব্যাপারে চিন্তা করবে। এটা বিশ্বাস করবে যে, হারাম খাদ্য খেয়ে যত ইবাদতই করা হোক না কেন, সবই বৃথা শ্রম। হালাল রিযিক ইবাদতের মূল। আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির নামায কবুল করেন না, যার পরিধানের কাপড়ে হারামের এক দিরহামও খরচ হয়েছে। এভাবে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে ফিকির করবে।

দ্বিতীয় প্রকার : ইবাদত। ইবাদতের মধ্যে প্রথমে ফরয ইবাদত সম্পর্কে খেয়াল করবে যে, একে ত্রুটিমুক্ত রাখা হয় কি না এবং এর ত্রুটি-

বিচ্যুতিগুলো নফল ইবাদত দ্বারা পূরণ করা হয় কি না? এরপর প্রতিটি অঙ্গের ইবাদত সম্পর্কে চিন্তা করবে, যে অঙ্গের যে ইবাদত আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয়, তা সেই অঙ্গ দ্বারা করা হচ্ছে কি না? যেমন, দেখার জন্য চোখ সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকার জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রহস্যসমূহ শিক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদিস দেখতে হবে। এগুলো দেখে ইবাদতে চোখকে মগ্ন করতে মানুষ সক্ষম। সুতরাং চিন্তা করবে, চোখ দিয়ে এসব করা হয় না কেন?

এমনিভাবে কান সম্পর্কে চিন্তা করে বলবে— আমি অত্যাচারিতের আর্তনাদ শুনতে পারি, জ্ঞানের কথাবার্তা, কিরাআত এবং যিকির শুনতে পারি। তাহলে কানকে কেন বেকার রাখি? জিহ্বা সম্পর্কে চিন্তা করবে, আমি জিহ্বা দ্বারা শিক্ষাদান ও ওয়াজ নসিহত করে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করতে পারি। সৎ লোকের অন্তরে স্থান গড়তে পারি। সুন্দর সুন্দর কথা বলতে পারি, যার প্রত্যেকটি বাক্যই হবে সদকা। এ নিয়ামত থেকে আমি আমার জিহ্বাকে কেন বঞ্চিত করি? ধনসম্পদ সম্পর্কে চিন্তা করবে, আমি অমুক সম্পদ সদকা করতে পারি। কেননা, আমার এর প্রয়োজন নেই। পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে আল্লাহ তাআলা দান করবেন। কাজেই, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, শরীর, ধনসম্পদ, সন্তানসন্ততি সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, এসব জিনিস মানুষের জন্য উপায়-উপকরণ, যা দিয়ে সে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার ক্ষমতা লাভ করতে পারে।

তৃতীয় প্রকার : ধ্বংসকারী গুণাবলি। সেগুলোর জায়গা হলো অন্তর। ধ্বংসকারী গুণাবলিগুলো হচ্ছে প্রচণ্ড খাহেশ, ক্রোধ, কৃপণতা, অহংকার, আত্মপ্রীতি, লৌকিকতা, হিংসা, কুধারণা, গর্ব ইত্যাদি। যদি ধারণা করা হয় যে, অন্তর এসব মন্দ স্বভাব থেকে পবিত্র, তাহলে এর পরীক্ষা নেবে। কারণ, নফস সর্বদাই সৎকাজের অঙ্গীকার করে বাস্তবক্ষেত্রে তার উল্টো কাজ করে। পরীক্ষা এভাবে করবে যে, নফস যদি অহংকার থেকে পবিত্র হওয়ার দাবি করে, তাহলে একটি খড়ির বোঝা মাথায় চেপে বাজারে চলে যাবে, যাতে দাবির সত্যতা প্রমাণিত হয়। আর যদি নফস জ্ঞান-গরিমার দাবি করে, তাহলে এমন কোনো কাজ করবে, যা অন্যের ওপর

ক্ষোভের সঞ্চার করে, এরপর দেখবে সে ক্রোধ হজম করতে পারে কি না? এমনিভাবে সকল গুণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা হওয়া উচিত যে, এসব গুণ তার মধ্যে বিদ্যমান কি না? যদি কোনো আলামত দ্বারা জানা যায় যে, অমুক গুণ তার মধ্যে রয়েছে, তাহলে এমন উপায় চিন্তা করবে, যাতে সে গুণটি তার দৃষ্টিতে মন্দ প্রতীয়মান হয় এবং তার কারণ যে অজ্ঞতা, তা ফুটে উঠে। যেমন কেউ যদি নিজের আমলের ক্ষেত্রে আত্মপ্রীতিতে ভোগে তাহলে সে মনে মনে বলবে, আমি যেই দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, শক্তি, ইচ্ছা ইত্যাদির বদৌলতে আমল করি এর কোনোটাই আমার নিজের নয়। এগুলোর ওপর আমার কোনো কর্তৃত্বও নেই। এসবই আমার ওপর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তিনিই আমার দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, শক্তি সামর্থ ও ইচ্ছা সৃষ্টি করেছেন। তার ইচ্ছাতেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সঞ্চালন হয়। অতএব, আমার আমলের কারণে আমার আত্মপ্রীতিতে ভোগা কীভাবে শোভা পায়?! তদ্রূপ, যদি নিজের মধ্যে অহংকার অনুভব করে, তাহলে নফসকে এভাবে বলবে যে, তুই নিজেকে কেন বড় মনে করিস? বড় তো সেই, যে আল্লাহ তাআলার নিকট বড়। মৃত্যুর পরই বুঝা যাবে, তাঁর নিকট কে বড়? বাহ্যত এমনও হয় যে, একজন কাফের সারাজীবন কুফরি করে মৃত্যুর সময় আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল বান্দা হয়ে মরতে পারে এবং একজন মুমিন অন্তিম মুহূর্তে বেঈমান হয়ে মরতে পারে। অহংকারের এ বিপর্যয় জানার পর এটা দূর করার প্রতিকার নিয়ে ফিকির করবে। প্রসঙ্গত, এর প্রতিকার হচ্ছে বিনম্র লোকদের অনুরূপ কাজকর্ম অবলম্বন করা।

যদি নিজের মাঝে খাদ্যপ্রীতির গুণটি পায় তাহলে মনে মনে ভাববে, এটা তো নির্বোধ পশুপাখির স্বভাব। যদি এই স্বভাবটি প্রশংসনীয়ই হতো তাহলে এটা নির্বোধ পশুপাখির স্বভাব না হয়ে ইলম ও ক্ষমতার মতো আল্লাহ তাআলা ও ফেরেশতাদের গুণ হতো। সুতরাং যার মধ্যে এই গুণটি যত বেশি পাওয়া যাবে সে তত বেশি পশুপাখির সাদৃশ্যপূর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদের থেকে দূরে সরে যাবে।

চতুর্থ প্রকার : নাজাতদাতা গুণাবলি। এগুলো হচ্ছে তাওবা ও পাপের জন্য অনুশোচনা, বিপদে ধৈর্য, নিয়ামতে শোকর, ভয়, আশা, দুনিয়া বিমুখতা,

ইখলাস, সত্যবাদিতা, আল্লাহর ভালোবাসা, আল্লাহর সম্মান, আল্লাহর কাজে সন্তুষ্টি, নম্রতা, বিনয় ইত্যাদি। অতএব, প্রতিদিন বান্দার চিন্তাভাবনা করা উচিত যে, এগুলোর মধ্য থেকে কোন গুণটি তার আবশ্যক। এরপর যদি তাওবা ও অনুশোচনা অপরিহার্য অনুভূত হয়, তাহলে প্রথমে নিজের গুনাহসমূহ তালাশ করবে। নফসের নিকট সবগুলোকে জমা করবে। এরপর শরিয়তে বর্ণিত এসব গুনাহের শাস্তির কথা স্মরণ করবে। এরপর মনে মনে বলবে, আমি আল্লাহর গযবের কাজ করছি। এই উপায়ে বান্দার মধ্যে তাওবা ও অনুশোচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে। যদি শোকরের অবস্থা সৃষ্টি করা লক্ষ্য হয়, তাহলে আল্লাহর অনুগ্রহরাজি ও নিয়ামতসমূহের প্রতি লক্ষ করবে। যদি অন্তরে মহব্বত ও আকাঙ্ক্ষার অবস্থা সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে আল্লাহ তাআলার মহিমা, সৌন্দর্য্য ও বড়ত্ব নিয়ে চিন্তা করবে। তাঁর অভূতপূর্ব হেকমত ও অনুপম কারুকার্য নিয়ে গবেষণা করবে।

আর অন্তরে ভয়ের অবস্থা সৃষ্টি করতে চাইলে প্রথমে নিজের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুনাহসমূহের দিকে দৃষ্টি দিবে। এরপর মৃত্যু ও তার কষ্ট, মৃত্যুর পর মুনকির-নাকীরের প্রশ্ন, সাপ, বিচ্ছু ও কীট-পতঙ্গের দংশন, হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা, হিসাব-নিকাশ, পুলসিরাতের তীক্ষ্ণতা ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা করবে। তারপর জাহান্নাম সম্পর্কে কালামে হাকীমে যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে, সবগুলোকে চোখের সম্মুখে উপস্থিত রাখবে। এভাবে বান্দার মধ্যে ভীতির অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে। আশার আলো দেখতে চাইলে জান্নাত, তার আনন্দ, বাগ-বাগিচা, ঝর্ণা, হূর, গেলমান, স্থায়ী নিয়ামত ইত্যাদি সম্পর্কে ফিকির করবে।

এসব গুণের ব্যাপারে আমরা ইতঃপূর্বে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। তাতেও চিন্তাভাবনার প্রসারে সাহায্য হতে পারে। যাবতীয় বিষয়ের বর্ণনা একত্রে পাওয়ার জন্য কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের মতো ফায়দা কোনো কিছুতেই নেই। কারণ, কুরআন মাজীদে সকল মাকাম ও হালের কথা সন্নিবেশিত রয়েছে। এতে এমন বিষয়ও রয়েছে, যা দ্বারা ভয়, আশা, ধৈর্য, শোকর, মহব্বত ও অন্যান্য হাল সৃষ্টি হয়। এগুলোই মানুষকে সকল প্রকার নিন্দনীয় স্বভাব থেকে বিরত রাখে। কাজেই, কুরআন মাজীদ

তিলাওয়াত করা আবশ্যক এবং যে বিষয়ে ফিকির করা উদ্দেশ্য হবে, সে বিষয়ের আয়াত বারবার তেলাওয়াত করতে হবে। প্রয়োজনে একশবার তেলাওয়াত করা উচিত। ফিকির সহকারে একটি কুরআনী আয়াত পাঠ করা, না বুঝে এক খতম কুরআন তেলাওয়াতের চেয়ে অনেক উত্তম। সুতরাং, আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য বিরতি দেবে, যদিও তাতে এক রাত কেটে যায়। কারণ, কুরআন মাজিদের প্রতিটি শব্দের অধীনে অসংখ্য রহস্য নিহিত রয়েছে। পরিষ্কার মন নিয়ে চিন্তা না করা পর্যন্ত এগুলো বুঝে আসবে না। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদিসসমূহ সচেতনভাবে গভীর চিন্তা সহকারে পড়তে হবে। তাঁর বাণীর প্রতিটি শব্দও প্রজ্ঞার এক সীমাহীন সমুদ্র। এসব শব্দ সম্পর্কে জ্ঞানী লোক যথার্থ চিন্তা করলে সমগ্র জীবনেও তার চিন্তা অপূর্ণ থেকে যাবে।

যেমন এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, জিবরাঈল আমার অন্তরে এই কথা ঢেলে দিয়েছেন যে, আপনি যাকে ইচ্ছা পছন্দ করুন। তার থেকে আপনাকে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হতে হবে। যতদিন চান বেঁচে থাকুন। একসময় অবশ্যই মরতে হবে। আর যত খুশি আমল করে নিন, আপনাকে নিশ্চয় এর প্রতিদান দেওয়া হবে। (বায়হাকী, শুআবুল ঈমান : ১০০৫৮)

আলোচ্য হাদিসটি প্রজ্ঞার যাবতীয় দিকগুলোকে একত্রিত করেছে, কেউ ফিকির করতে চাইলে এই একটি হাদিসই তার সারাজীবনের ফিকিরের জন্য যথেষ্ট। কারণ হাদিসটির অর্থ যদি তার বোধগম্য হয়ে যায় এবং তার অন্তরে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় তাহলে সে দুনিয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করবে না।

এটাই মোআমালা সংক্রান্ত ইলম এবং বান্দার ভালো ও মন্দ গুণাবলি নিয়ে ফিকিরের পন্থা। বান্দার উচিত, সর্বদা এসব বিষয় নিয়ে ফিকিরে ডুবে থাকা। তাহলেই সে প্রশংসনীয় গুণাবলি অর্জন করে মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন হতে পারবে এবং নিজেকে যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে পূতপবিত্র রাখতে সক্ষম হবে। এখানে আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, এসব বিষয় নিয়ে ফিকিরে মগ্ন থাকা ইবাদত হলেও তা মূখ্য উদ্দেশ্য নয়; বরং যে ব্যক্তি কেবল এসব বিষয়ের ফিকিরেই মগ্ন থাকে সে সিদ্দিকীনের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত হয়। সিদ্দিকীনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

তো কেবল আল্লাহ তাআলার মহিমা ও সৌন্দর্য্য নিয়ে এমনভাবে ফিকিরে মগ্ন থাকা যে, নিজের অবস্থা ও গুণাবলির কথা বেমালুম ভুলে যাওয়া।

এতক্ষণ যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে হৃদয় জগতকে আবাদ করার চিন্তাভাবনা, যাতে নৈকট্যের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। কাজেই কেউ নফসের সংশোধনেই যদি সারাজীবন কাটিয়ে দেয়, তবে সান্নিধ্যের স্বাদ কখন পাবে? খাওয়াস (র) জনমানবহীন প্রান্তরে ঘোরাফেরা করতেন। একবার হুসাইন ইবনে মানসুর (র) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেমন আছেন? তিনি বললেন, তাওয়াক্কুলে নিজের অবস্থা বিশুদ্ধ করাতে বনে-জঙ্গলে ঘোরাফেরা করছি। হুসাইন (র) বললেন, আপনি তো হৃদয় জগতকে আবাদ করার কাজেই জীবন কাটিয়ে দিলেন। তাওহীদে কখন সফলতা আসবে? (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২৯৭)

এ থেকে জানা গেল যে, এক আল্লাহতে বিলীন হওয়া সাধনাকারীর জন্য পরম আনন্দ।

ধ্বংসকারী গুণাবলি থেকে বেঁচে থাকার দৃষ্টান্ত ওই নারীর মতো, যে বিবাহের ইদ্দত শেষ করে নিজেকে মুক্ত করেছে। আর উদ্ধারকারী গুণাবলিকে নিজের মাঝে ধারণ করা ও ইবাদত করার দৃষ্টান্ত ওই নারীর মতো, যে তার স্বামীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা করে। এমতাবস্থায় ওই নারী যদি সারাজীবন ইদ্দত পালনে ও সাজসজ্জায় কাটিয়ে দেয় তাহলে সে তার স্বামীর সাথে কবে সাক্ষাৎ করবে?!

অতএব, যদি তুমি সহচর হওয়ার যোগ্য হও তাহলে দীনি বিষয়গুলোকে এভাবেই বুঝে নিতে হবে। আর যদি তুমি এমন গোলামের মতো হও যাকে মারধর ও পারিশ্রমিকের লোভ না দেখালে কথা শুনে না তাহলে নিজের ওপর আমলের কষ্টের বোঝা চাপিয়ে নিয়ো না। কারণ তোমার ও অন্তরের মাঝে একটি পর্দা প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। আমল করে তুমি জান্নাত পেতে পারো কিন্তু সহচরদের মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। মুক্তিদাতা ও ধ্বংসকারী গুণসমূহ জেনে নেওয়ার পর এগুলো সকাল-সন্ধ্যার অভ্যাস বানিয়ে নেবে এবং এগুলো থেকে কোনোভাবেই অমনোযোগী থাকবে না। এ ব্যাপারে সাধনাকারী নিজের কাছে একটি

নোটবই রাখবে। এতে সকল উদ্ধারকারী ও ধ্বংসকারী গুণসমূহ এবং যাবতীয় পাপ ও আনুগত্যের কাজগুলো লিখে রাখবে। এরপর দৈনিক নিজের সাথে সেগুলো মিলিয়ে দেখবে, কী কী গুণ তার মধ্যে রয়েছে এবং কী কী নেই। ধ্বংসকারী গুণগুলোর মধ্য থেকে দশটি বিষয়ে খেয়াল করা যথেষ্ট। এগুলো থেকে মুক্ত থাকলে অন্য সবগুলো থেকে মুক্ত থাকা যাবে। এর মধ্যে কতকগুলো বিষয় হলো, কৃপণতা, অহংকার, আত্মপ্রীতি, লৌকিকতা, হিংসা, কঠোরতা, খাদ্য-লোভ, অত্যধিক যৌনলিপ্সা, অর্থলোভ ও জাঁকজমকপ্রীতি।

উদ্ধারকারী গুণগুলোর কিছু বিষয় যেমন, গুনাহর কারণে অনুশোচনা, বিপদে ধৈর্যধারণ, আল্লাহর ফয়সালায় রাজি থাকা, নিয়ামতের শোকর, ভয় ও আশার সমতা, সংসারে অনাসক্তি, আমলে ইখলাস, মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার, আল্লাহর মহব্বত ও আল্লাহর সামনে খুশু ও নম্রতা।

উল্লিখিত বিষয়ের মধ্য থেকে, প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করতে থাকবে। যেমন, একটি ধ্বংসকারী অভ্যাস দূর হয়ে গেলে নোটবই থেকে সেটি কেটে দেবে এবং সে সম্পর্কে আর ফিকির করবে না। সেসঙ্গে আল্লাহর শোকর করবে যে, তিনি একটি থেকে নাজাত দিয়েছেন। এভাবে মন্দ স্বভাব সম্পূর্ণভাবে দূর না হওয়া পর্যন্ত একটি করে বেছে নেবে এবং ফিকির করতে থাকবে। এরপর নোটবই থেকে তা কেটে দিতে থাকবে। এরপর নফসকে উদ্ধারকারী গুণে গুণান্বিত করার চেষ্টা চালাবে। নফস যখন একটি গুণে গুণান্বিত হয়ে যাবে, তখন নোটবই থেকে সেটি কেটে দিয়ে অবশিষ্ট গুণসমূহ হাসিল করতে মনোযোগী হবে। কিন্তু এই পথ অত্যন্ত কর্মতৎপর ব্যক্তির জন্যই কল্যাণকর। আর যারা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত, তাদের অধিকাংশের কর্তব্য, নোটবইয়ে বাহ্যিক গুনাহও লিখে নেওয়া। যেমন, ঝগড়া করা, আত্মপ্রশংসা করা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ না করা ইত্যাদি। কেননা, অধিকাংশ নেককার বলে গণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে এসব পাপ কিছু না কিছু পাওয়া যায়। বাহ্যিক অঙ্গ পাপমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্তর আবাদ করার কাজে মগ্ন হওয়া যায় না; বরং প্রত্যেক স্তরের লোকের উপর এক ধরনের অপরাধ প্রবল থাকে। সুতরাং, সে স্তরের লোকের উচিত সে ধরনের অপরাধ দূরীকরণে সচেষ্ট

হওয়া এবং তারা যে সকল পাপের কাছাকাছি অবস্থান করে, সেগুলোর জন্যে ফিকির না করা। যেমন, মুত্তাকী আলেম প্রায়ই নিজের ইলম প্রকাশ করার প্রয়াস পায় এবং মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি কামনা করে— শিক্ষকতার মাধ্যমে হোক বা ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে হোক। তারা এমন একটি ফিতনায় নিপতিত হয়, যা থেকে সিদ্দীকগণ ব্যতীত কেউ মুক্তি পায় না।

সাধারণ আলেমদের অবস্থা তো এমন যে, যদি তাদের কথা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এবং তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে তাহলে তারা এক প্রকারের আত্মপ্রীতি ও অহংকারে ভোগে। অথচ এটা ধ্বংসকারী গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। আর যদি মানুষ তার কথা গ্রহণ না করে তাহলে সে তাদেরকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করে। অথচ অন্য কোনো আলেমের কথা মানুষ গ্রহণ না করলে সে রাগে না।

শয়তান তাকে এই কথা বলে ধোঁকা দেয় যে, মানুষের প্রতি তোমার ঘৃণার কারণ এটা নয় যে, তারা তোমার কথা গ্রহণ করেনি; বরং তারা সত্যকে গ্রহণ না করার কারণেই তুমি তাদের ঘৃণা করছো। বস্তুত এটা শয়তানী ধোঁকা বৈ কিছুই নয়। বাস্তবতা যদি তা-ই হতো তাহলে মানুষ অন্য আলেমের কথা না শুনলেও সে কষ্ট পেতো। অনেক সময় এধরণের আলেম মানুষের প্রশংসা ও তাদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েও সন্তুষ্ট হয় না; বরং আরও বেশি গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার আশায় কথা বলার ক্ষেত্রে লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়। অথচ সে জানে যে, আল্লাহ তাআলা কৃত্রিমতাকে অপছন্দ করেন। শয়তান এখানেও তাকে ধোঁকা দিতে পিছপা হয় না। সে বলে, তুমি তো আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্যই তোমার কথাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছো, যাতে তোমার কথা মানুষের অন্তরে প্রভাব ফেলে ও তারা এর ফলে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ হয়। বস্তুত এটাও শয়তানী ষড়যন্ত্র। বিষয়টি যদি তা-ই হতো তাহলে সে নিজের প্রশংসায় যেরূপ পুলকিত হয় তার সমপর্যায়ের অন্য আলেমের প্রশংসাতেও তেমন পুলকিত হতো। অতএব বোঝা গেল, এই ব্যক্তি শয়তানের ধোঁকা ও ষড়যন্ত্রের শিকার এবং ক্ষমতা ও সম্মান প্রত্যাশী। এরপর তার অভ্যন্তরীণ এসব গুণাবলি তার বাহ্যিক কাজেকর্মেও প্রকাশ পায়। ফলে তার মজলিসে যদি এমন দুজন ব্যক্তি বসে যাদের

একজন তার অনুসারী আর অপরজন তার সমপর্যায়ের অন্য কারও অনুসারী হয় তাহলে সে ওই ব্যক্তির প্রতিই যত্নবান হয় যে তাকে অনুসরণ করে। যদিও অপর ব্যক্তিই তার যত্নের অধিক হকদার হয়। অনেক সময় তা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে, এসকল আলেমরা পরস্পর সতীনের মতো ঝগড়া করে। ফলে তাদের ছাত্ররা অন্য আলেম থেকে ফায়দা নিলে তারা অসন্তুষ্ট হয় যদিও সে জানে যে, ওই আলেম থেকেও দীনি ফায়েদা অর্জন করা সম্ভব।

এসব বিষয়ের উৎস ওই সকল ধ্বংসকারী গুণাবলি যা আলেমদের অন্তরে লুক্কায়িত থাকে। অথচ আলেম মনে করে সে ওই ধ্বংসকারী গুণাবলি থেকে মুক্ত। বস্তুত এই আলেম ধোঁকার শিকার। উপরিউক্ত নিদর্শনাবলির মাধ্যমেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়।

সারকথা, আলেমের ফিতনা অনেক বড়। সে হয়তো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, না হয় ধ্বংস। কাজেই, যে আলেম নিজের মধ্যে উল্লিখিত মন্দ স্বভাব অনুভব করবে, তার জন্য একাকী জীবন যাপন ও ফতোয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। সাহাবায়ে কিরামের যুগে অনেক সাহাবি মসজিদে থাকতেন। তারা সকলেই আলেম ও মুফতী ছিলেন। তারপরও তারা ফতোয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকতেন। কেউ ফতোয়া দিলেও চাইতেন, অন্য কেউ ফতোয়া দিয়ে তাকে রক্ষা করুক।

একাকী নির্জনবাসের সময়ও শয়তানকে ভয় করতে হবে। কেননা, তখন শয়তান এসে বলে, তুমি নির্জনবাস গ্রহণ করো না। কারণ, সবাই যদি এমন করে, তাহলে মানুষের মধ্য থেকে ইলম চলে যাবে। এর জবাবে বলা উচিত, ইসলামে আমার কোনো দরকার নেই। আমার আগেও ইসলাম পরিপূর্ণ ছিল এবং আমার পরেও থাকবে। আমার মৃত্যুতে ধর্মের কোনো স্তম্ভ ধ্বংস হয়ে যাবে না। তবে মনে রাখবে, আমি আমার অন্তরের সংশোধন থেকে বেপরোয়া নই। আমি বসে থাকলে ইলম বিদায় নেবে, এ কথা নিছক অজ্ঞতারই পরিচায়ক। কারণ, সমস্ত মানুষকে যদি জেলখানায় আবদ্ধ করা হয় এবং ইলম তালাশ করলে আগুনে পুড়িয়ে মারার হুমকি দেওয়া হয়, তবু যতদিন বড়ত্ব, জাঁকজমক ও নেতৃত্বের মহব্বত জাগ্রত রাখবে, ততদিন ইলম বিদায় নিতে পারবে না। সত্য কথা, কিয়ামত পর্যন্ত

শয়তান কখনো নিজের ষড়যন্ত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে না। তারপরও কিয়ামত পর্যন্ত শয়তান এবং ইলমও টিকে থাকবে। বরং দীনের ইলম এমন লোকদের মাধ্যমেও প্রসার লাভ করবে, পরকালে যাদের কোনো অংশ নেই। তাই রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَاخَلَاقَ لَهُمْ وَإِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা এমন মানুষের মাধ্যমে এই দীন শক্তিশালী করবেন, আখিরাতে যাদের কোনো অংশ নেই। (সুনানে কুবরা, ইমাম নাসায়ী : ৮৮৩৩)

আল্লাহ তাআলা পাপিষ্ঠ ব্যক্তি দ্বারা এই দীনকে মজবুতী দান করবেন। (সহিহ বুখারী : ৩০৬২, সহিহ মুসলিম : ১১১)

কাজেই শয়তানের এ ধরনের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে মানুষের সাথে মেলামেশায় ব্যস্ত হওয়া এবং দুনিয়াবি জাঁকজমক, প্রশংসা ও সম্মানের মহব্বতকে পোষণ করা আলেমের জন্য কল্যাণকর নয়। হাদিসে আছে, জাঁকজমক ও ধন-সম্পদের ভালোবাসা মুনাফিকি উৎপন্ন করে, যেমন পানি শস্য উৎপন্ন করে। নবী কারীম (স) বলেছেন,

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِيْ زَرِيْبَةِ غَنَمٍ بِأَكْثَرَ فَسَدًا فِيْهَا مِنْ حُبِّ الْجَاهِ وَ الْمَالِ فِيْ دِيْنِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ.

দুটি রক্তখেকো বাঘকে বকরির পালে ছেড়ে দিলে তারা এত বেশি অনিষ্ট করতে পারে না, জাঁকজমক ও সম্পদের ভালোবাসা মুসলমানের দীনের যত বেশি অনিষ্ট করে। (জামে তিরমিযী : ২৩৭৬; আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৬২৭৫)

একাকীত্ব অবলম্বন করা ব্যতীত প্রাচুর্যের ভালোবাসা অন্তর থেকে দূর হয় না। সুতরাং আলেমের কর্তব্য, অন্তর থেকে এধরনের গোপন ভালোবাসা তালাশ করে বের করা এবং তা দূরীকরণের চিন্তা করা। মুত্তাকী আলেমের ক্ষেত্রে হলো এই খেয়াল। আর আমাদের মতো লোকদের তো ওইসব বিষয়ে ফিকির করা উচিত, যেসব বিষয় দিয়ে আমাদের ঈমান কিয়ামাতের

দিন মজবুত হয়। কারণ, সালফে সালেহীন আমাদের দেখলে অবশ্যই বলবেন, এরা কিয়ামাতে বিশ্বাস করে না। কারণ, যারা জান্নাত ও জাহান্নাম বিশ্বাস করে, আমাদের আমল তাদের আমলের মতো নয়। যে লোক যে জিনিসকে ভয় করে, সে সেই জিনিস থেকে পলায়ন করে এবং যে লোক যে জিনিসের কামনা করে, সে সেই জিনিস খুঁজে বেড়ায়। আমরা আরও জানি, হারাম কাজ ও গুনাহ বর্জনের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে পলায়ন হয়ে থাকে। অথচ আমরা গুনাহ ও হারাম কাজে নিমজ্জিত থাকি।

আমাদের আরও জানা আছে যে, জান্নাতের তালাশ করা হচ্ছে বেশি বেশি নফল ইবাদত। আমরা এতেও অবহেলা করি; বরং আমাদের ফরয ইবাদতও যথাযথ আদায় করা হয় না। সুতরাং আমরা আমাদের ইলমের ফল এই পেয়েছি যে, দুনিয়ালোভী হওয়ার জন্য সাধারণ লোক আমাদের অনুসরণ করে বলবে, দুনিয়ার লোভ যদি খারাপ হতো, তাহলে আলেমগণ আমাদের চেয়ে এ থেকে আরও বেশি বেঁচে থাকতেন। আমরা এখন ভাবছি, আমরা (আলেমরা) যে ফিতনার মুখোমুখি, তা খুবই ভয়াবহ। আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের অবস্থা সংশোধন করেন এবং মৃত্যুর আগে আমাদের তাওবা করার তাওফিক দেন। তিনি করুণাময় ও নিয়ামতদাতা।

সালফে সালেহীন মোআলামা সংক্রান্ত বিষয়াদিতে এভাবেই চিন্তা-ফিকির করতেন। যখন তারা চিন্তা-ফিকির থেকে অবসর হতেন তখন নিজেদের প্রতি খেয়াল করার সুযোগই পেতেন না বরং তাঁরা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যেতেন, আল্লাহ তাআলার মহিমা ও বড়ত্ব অনুভব করতেন এবং অন্তরের চক্ষু দ্বারা তাঁর দর্শনের সুধা পান করতেন। বান্দা ফিকিরের এই পর্যায়ে তখনই উন্নীত হতে পারে যখন সে যাবতীয় ধ্বংসকারী গুণাবলি থেকে মুক্ত থাকে এবং উদ্ধারকারী গুণাবলিতে গুণান্বিত হয়। এর পূর্বেই যে ফিকিরে ইলাহিতে মগ্ন হয় তার উপমা ওই প্রেমিকের মতো, যে নিভৃতে তার প্রেমাস্পদের সাথে মিলিত হয় এমতাবস্থায় যে, সাপ বিচ্ছু তার প্রেমাস্পদকে কামড়ে যাচ্ছে। এটা তো নিশ্চিত যে, এই অবস্থায় প্রেমিক ততক্ষণ পর্যন্ত প্রেমাস্পদের সাথে নিভৃতে মিলিত হওয়ার স্বাদ উপভোগ করতে পারবে না যতক্ষণ না সে প্রেমাস্পদের কাপড় থেকে বিষাক্ত

কীটগুলোকে দূর করবে। এমনিভাবে বান্দার ধ্বংসকারী গুণাবলি বিষাক্ত সাপ বিচ্ছুর মতো। যতক্ষণ না বান্দা এসব গুণ থেকে নিজেকে পবিত্র করবে ততক্ষণ নূরে ইলাহি দ্বারা নিজেকে নূরান্বিত করতে পারবে না।

প্রথম প্রকার অর্থাৎ, বান্দা তার গুণাবলি ও হাল সম্পর্কে চিন্তাভাবনার আলোচনা এটুকুই যথেষ্ট। এতেই চিন্তাভাবনার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা, তাঁর গুণাবলি ও কাজকর্ম সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

চিন্তা-ফিকির-এর সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সত্তা সম্পর্কে ফিকির করা। কিন্তু এধরনের চিন্তাভাবনা নিষিদ্ধ। কেননা, কুরআনে বলা হয়েছে— আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করো, তাঁর সত্তা সম্পর্কে নয়। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৬৯৩)

এর কারণ, তাঁর সত্তা নিয়ে চিন্তা করলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং কোনো কুল-কিনারা পাওয়া যায় না। সিদ্দীকগণ ব্যতীত এদিকে কেউ চোখ তুলে তাকাতেও পারে না। তারাও সর্বক্ষণ তাঁকে দেখার ক্ষমতা রাখেন না। সাধারণ মানুষ যেমন সূর্যের দিকে তাকাতে পারে, কিন্তু বেশিক্ষণ পারে না; বেশিক্ষণ দেখলে দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তেমনি আল্লাহ তাআলার সত্তার দিকে দেখা হতবুদ্ধিতার কারণ। অধিকাংশ মানুষ তা সহ্য করতে পারে না। কোনো কোনো আলেম অবশ্য এ বিষয়ে অল্পই বর্ণনা করেছেন। যেমন, তারা বলেছেন— আল্লাহ তাআলা স্থান, কাল ও দিক থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি না দুনিয়ার অভ্যন্তরে, না বাইরে। তিনি দুনিয়ার সাথে মিলিতও নন, পৃথকও নন। এই স্বল্প-বিস্তর বর্ণনা থেকেই কিছু মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি এমন বিভ্রান্ত হয়েছে, যাতে তারা একে অস্বীকারই করে বসেছে। তাদের নিকট যখন বলা হলো যে, আল্লাহ তাআলা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র, তারা তা মেনে না নিয়ে ধারণা করল যে, এই সংজ্ঞা আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য ও প্রতাপে ত্রুটির কারণ। তাদের মতে মাহাত্ম্য ও প্রতাপ এ সকল অঙ্গের মধ্যে সীমিত। কেননা, মানুষ শুধু নিজেকেই জানে ও চিনে। কাজেই যে বস্তু বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে মানুষের সমকক্ষ নয়, কোনো মাহাত্ম্যও সে বুঝে না। যেমন এক ব্যক্তি নিজের

মধ্যে বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে, সে বসে রয়েছে খচিত সিংহাসনে। আর তার সামনে রয়েছে অনুগত গোলাম। অতঃপর আল্লাহর ব্যাপারেও সে ধারণা করে, তিনিও সিংহাসনে বসে তাঁর লাখো বান্দাকে আদেশ-নিষেধ করছেন।

আর এ ধারণাটিকে আল্লাহর মর্যাদার কারণ মনে করে। এই ব্যক্তির অবস্থা তো ওই মৌমাছির মতো, যদি তাকে বলা হয়, তোমার স্রষ্টার তো ডানা নেই, হাত-পা নেই, তিনি তোমার মতো উড়তেও পারেন না। তাহলে সে নিঃসন্দেহে তা অস্বীকার করে বলবে, আমার স্রষ্টা আমার চেয়ে অসম্পূর্ণ কীভাবে হতে পারেন? নিশ্চয় তিনি পঙ্গু নন যে, উড়তে পারেন না।। তিনি তো আমার স্রষ্টা। আমি উড়তে পারলে তিনি কেন পারবেন না? তো অধিকাংশ মানুষের আকল এ ধরনেরই। আর মানুষ অজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ, জুলুমকারী। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এক নবীর নিকট এই মর্মে ওহি প্রেরণ করেন যে, আমার বান্দাদের নিকট আমার গুণাবলি বর্ণনা করো না। তা করলে তারা আমাকে মানবে না। বরং আমার অবস্থা এমন ভাষায় বর্ণনা করো, যা তারা বুঝতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণ সম্পর্কে ফিকির নিষিদ্ধ হওয়ায় আমরা এ বিষয়টি বাদ দিয়ে অন্য বিষয়ের আলোচনা করছি। তা হচ্ছে, সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তাআলার সত্তা ও সিফাতের ভেদসমূহ সম্পর্কে ফিকির করা। কারণ, এসবের মধ্যে তাঁর প্রতাপ, মাহাত্ম্য, পবিত্রতা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পূর্ণতা পাওয়া যায়। সুতরাং গুণ সম্পর্কে ফিকির গুণাবলির ফলাফল দ্বারাই করতে হবে। তাঁর গুণাবলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার যোগ্যতা যেহেতু আমাদের নেই, তাই গুণাবলির ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি দেওয়াই উচিত। যেমন, সূর্য যখন ঝকঝক করতে থাকে, তখন আমরা তার দিকে তাকাতে পারি না এবং এর মাধ্যমেই চন্দ্র ও অন্যান্য তারকার আলোর চেয়ে সূর্যের আলোর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। কেননা, ভূপৃষ্ঠের আলোকিত হওয়া সূর্যকিরণেরই ফল। দুনিয়াতে যা কিছু বিদ্যমান সবই খোদায়ী কুদরতের ফল এবং আল্লাহর সত্তার আলোসমূহের একটি আলো।

বরং অস্তিত্বহীনতার চেয়ে আর কোনো অন্ধকার নেই, এবং অস্তিত্ব-এর চেয়ে অধিক স্পষ্ট আলো আর নেই। প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্ব মহান আল্লাহর

নূরের অংশসমূহের এক অংশ। কেননা বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই বিদ্যমান মহান সত্তার কারণে যেমনিভাবে শরীরের আলোর আধার হচ্ছে উজ্জ্বল সূর্যের আলো।

সূর্যগ্রহণের সময় পাত্রে পানি রেখে আমরা তাতে সূর্যগ্রহণের দৃশ্য দেখি, যাতে আমাদের দৃষ্টিশক্তির কোনো ক্ষতি না হয়। কাজেই সূর্যের দিকে তাকানোর ক্ষমতা অর্জনের জন্য পানি একটি মাধ্যম। অনুরূপ আল্লাহ তাআলার কাজকর্মও তাঁর গুণাবলি অনুধাবনের মাধ্যম। এই উপায়ে গুণাবলি অনুধাবন করলে জ্ঞান-বুদ্ধি বিস্মিত হওয়ার ভয় থাকে না। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

تَفَكَّرُوْا فِيْ خَلْقِ اللهِ وَلَا تَتَفَكَّرُوْا فِيْ ذَاتِ اللهِ.

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ভাবো কিন্তু তাঁর সত্তা নিয়ে ভেবো না।

সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ফিকির করার নিয়ম-পদ্ধতি

প্রকাশ থাকে যে, বিশ্বজাহানে আল্লাহ তাআলা ছাড়া যা কিছু বিদ্যমান, সব তাঁরই কর্ম ও তাঁরই সৃষ্টি। এর প্রতিটি অণু-পরমাণুতে অসংখ্য বৈচিত্র্য ও রহস্য রয়েছে, যেগুলো দিয়ে আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞা, শক্তিমত্তা, প্রতাপ ও মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। নিম্নে নমুনাস্বরূপ আমরা কিছু বৈচিত্র্য ও রহস্য উল্লেখ করছি।

আল্লাহর সৃষ্টি অনেক বস্তু আমাদের জ্ঞানের বাইরে রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা সম্ভব নয়। আমাদের অজানা বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন– وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ এবং তিনি সৃষ্টি করেন (এমন অনেক কিছু) যেসব তোমরা অবগত নও। (সূরা নাহল : ৮)

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ.

পবিত্র তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যেসব জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে। (সূরা ইয়াসীন : ৩৬)

وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

তোমাদেরকে এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করতে যা তোমরা জানো না। (সূরা ওয়াকিয়া : ৬১)

আবার এমনও অনেক বস্তু বিদ্যমান, যেগুলো সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে জানি– বিস্তারিত নয়। এরূপ বস্তুসমূহকে বিস্তারিতভাবে জানতে চিন্তাভাবনার সুযোগ রয়েছে। এ ধরনের বস্তুর কিছু নজরে পড়ে এবং কিছু পড়ে না। যেগুলো নজরে পড়ে না, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ফেরেশতা, জিন, শয়তান, আরশ, কুরসী ইত্যাদি। এগুলো সম্পর্কে ফিকিরের ব্যাপ্তি খুবই কম। যে সকল বস্তু নজরে পড়ে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সাত আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মাঝের বস্তুসমূহ। আসমানে দেখা যায় তারকারাজি, চন্দ্র, সূর্য, উদয়, অস্ত ইত্যাদি। জগতে দেখা যায় পাহাড়-পর্বত, খাল, বিল, প্রাণি এবং উদ্ভিদ। আর আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে দেখা যায় মেঘমালা, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও ঝড়ঝঞ্জা। মোটকথা, আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহের হাজারো শ্রেণি রয়েছে। এগুলোর আকৃতি প্রকৃতিতে যে পরিমাণ পার্থক্য দেখা যায়, সে পরিমাণে বিভক্তিও বেড়ে যায়। এদের প্রত্যেকটি প্রকার নিয়ে ফিকির করার সুযোগ রয়েছে। জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণি, ও তারকারাজির প্রতিটি কণাকেই আল্লাহ তাআলা গতিশীল করেন। এসব বস্তু আল্লাহ তাআলার একত্ব, ও মাহাত্ম্যের স্পষ্ট নিদর্শন। কুরআন মাজীদে এসব নিয়ে ফিকির করার অনুপ্রেরণা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ.

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে নিদর্শনাবলি রয়েছে বুদ্ধিমান লোকের জন্য। (সূরা আলে ইমরান : ১৯০)

কুরআন মাজীদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনেক স্থানে এ ধরনের আয়াত রয়েছে। কিছু আয়াতে ফিকিরের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলার এক নিদর্শন এই যে, মানুষ বীর্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষের অধিক নিকটবর্তী হচ্ছে তার নফ্স। এতে আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্যের পরিচায়ক এতই আশ্চর্যের বিষয় রয়েছে যে, মানুষ সমগ্রজীবন

অধ্যয়ন করেও এর এক-দশমাংশও জ্ঞাত নয়। অথচ সে এগুলো সম্পর্কে অজ্ঞাত। যে মানুষ নিজের নফস সম্পর্কে অজ্ঞাত, সে অন্যের মারেফাত কীভাবে আশা করতে পারে? আল্লাহ তাআলা কুরআনে মানুষকে তার নিজের সম্পর্কে ফিকির করার হুকুম দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَ فِيْ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ.

এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না? (সূরা যারিয়াত : ২১)

অন্যত্র উল্লেখ করেছেন যে, মানুষ নাপাক বীর্য থেকে সৃজিত। কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে,

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ. مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ. مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ. ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ. ثُمَّ اَمَاتَه فَاَقْبَرَهٗ.ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ.

মানুষ (কাফের) ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ! (একটু ভেবে দেখুক) তিনি তাকে কোন বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন, শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেছেন,অতঃপর তার জন্য পথ সহজ করেছেন; এরপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন। এরপর যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনর্জীবিত করবেন। (সূরা আবাসা : ১৭-২২)

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَاۤ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ.

তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে অন্যতম এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর এখন তোমরা মানবরূপে সবখানে ছড়িয়ে পড়লে। (সূরা রূম : ২০)

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى.

সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিলো না? অতঃপর সে জমাট রক্তে পরিণত হয়- এরপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেছেন এবং সুঠাম করেছেন। (সূরা কিয়ামাহ : ৩৭-৩৮)

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ. فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ. اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ.

আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি? অতঃপর আমি তা রেখেছি এক সুরক্ষিত আধারে। এক সুনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। (সূরা মুরসালাত : ২০-২২)

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ.

মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রানু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। (সূরা ইয়াসিন : ৭৭)

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ.

নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে। (সূরা দাহর : ২)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ. ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا.

আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির সারাংশ থেকে, অতঃপর আমি তাকে বীর্যরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে; এরপর আমি বীর্যকে পরিণত করি জমাট রক্তে, এরপর সেই জমাট রক্তকে গোশতপিন্ড বানিয়ে দেই। তারপর সেই গোশতপিন্ডকে অস্থিতে রূপান্তরিত করি। (সূরা মুমিনুন : ১২-১৪)

কাজেই কুরআন মাজীদে বারবার শুক্রবিন্দু উল্লেখ করার উদ্দেশ্য শুক্র সম্পর্কে ফিকির করতে বলা। এভাবে যে, এটি একটি অপবিত্র পানির ফোঁটা, যা কিছুক্ষণ বাতাসহীন অবস্থায় রেখে দিলে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। আল্লাহ তাআলা এই অপবিত্র বস্তুটি পুরুষের মেরুদণ্ড এবং নারীর বক্ষদেশ থেকে কীরূপে নির্গত করেছেন। পুরুষ ও নারীর কীরূপে মিলন ঘটিয়েছেন। পুরুষ ও নারীর অন্তরে পারস্পরিক প্রেম ও ভালোবাসা স্থাপন করে তাদের পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। এরপর সঙ্গমের মাধ্যমে পুরুষ থেকে শুক্র বের করে নারীর গর্ভাশয়ে স্থাপন করেছেন। এরপর ঋতুর অপবিত্র রক্ত কোনো কোনো শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে টেনে গর্ভাশয়ে জমা করেছেন এবং স্রাবের থেকে ভ্রূণ সৃষ্টি করে তাকে স্রাবের রক্ত খাইয়ে লালন-পালন করেছেন। শুভ্র উজ্জ্বল শুক্রকে তিনি কীরূপে জমাট রক্তে

পরিণত করেছেন এবং জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ড বানিয়েছেন। যে শুক্রের সকল অংশ একইরকম ছিল তাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে এক অংশকে অস্থিপুঞ্জ, এক অংশকে শিরা-উপশিরা এবং এক অংশকে গোস্তে পরিণত করেছেন। এরপর গোস্ত ও শিরা দিয়ে বাহ্যিক অঙ্গ কীভাবে সৃষ্টি করেছেন। মাথা গোল করেছেন, কান, চোখ, নাক ও মুখমণ্ডল প্রশস্ত করেছেন এবং হাত-পা লম্বা বানিয়েছেন। এগুলোর মাথায় আঙ্গুল যুক্ত করেছেন। এরপর ভেতরকার অঙ্গ যেমন, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, কলিজা, প্লীহা, ফুসফুস, গর্ভাশয় ও মূত্রাশয় কীরূপে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকটির আকার, পরিমাণ ও কাজ ঠিক করে দিয়েছেন।

দৃষ্টিকে সাতটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। দৃষ্টির প্রতিটি স্তরের গুণাগুণ ভিন্ন এবং প্রকৃতিও ভিন্ন। যদি একটি স্তর অকেজো হয়ে যায় বা কোনো গুণ বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যাবে।

অস্থি সম্পর্কে এখন চিন্তা করা প্রয়োজন যে, নরম ও তরল শুক্র থেকে কেমন শক্ত ও সুঠাম অস্থি গঠিত হয়েছে। এই অস্থির সাহায্যেই শরীর সোজা থাকে। ছোট-বড়, লম্বা, বেঁটে, গোল ইত্যাদি অনেক প্রকারের অস্থি গঠিত হয়েছে। মানুষের প্রয়োজন ছিল সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে নড়াচড়া করার এবং বিশেষ বিশেষ কর্মে বিশেষ অঙ্গ নাড়া দেওয়ার। তাই অস্থি একটি নয়। বহুরকম নির্মাণ করে সেগুলোর মধ্যে জোড়া ও গ্রন্থি স্থাপন করা হয়েছে, যাতে করে নড়াচড়া সহজ হয়।

এরপর মাথার গঠনপ্রণালীর প্রতি লক্ষ করা উচিত। এখানে ৫৫ টি পৃথক পৃথক আকার-আকৃতির অস্থিকে কীভাবে একত্র করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ছয়টি অস্থি বিশেষভাবে মাথার উপরিভাগের, চৌদ্দটি উপরের চোয়ালের, দুইটি নিচের চোয়ালের এবং অবশিষ্টগুলো দাঁতের। দাঁতের মধ্যে কোনোটি প্রশস্ত ও চর্বণ ক্ষমতাসম্পন্ন, কতক তীক্ষ্ণ, কর্তন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং কতক চোখা। এরপর গ্রীবাকে মাথার বাহন করে তাকে পিঠের উপর স্থাপন করা হয়েছে। এরপর পাছার অস্থি পর্যন্ত চব্বিশটি আংটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। নিতম্বের হাড় তিনটি বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে। এরপর পৃষ্ঠদেশের অস্থিসমূহ বুকের অস্থি, কাঁধ, হাত, নাভির নিম্ন ও নিতম্বের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এরপর

রয়েছে, উরু, পায়ের গোছা ও পায়ের আঙ্গুলসমূহের হাড়। পুরো শরীরে মোট ২৪৮টি অস্থি রয়েছে। এতে সেসব ছোট অস্থি গণ্য নয়, যেগুলো দিয়ে গ্রন্থির গর্তগুলো ভরাট করা হয়েছে। এখন দেখার বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলা এগুলো এক নরম ও তরল বীর্যের ফোটা থেকে কীভাবে সৃষ্টি করেছেন। হাড্ডির সংখ্যার আলোচনার দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, আমরা জানবো মানুষের শরীরে কতগুলো হাড্ডি রয়েছে। কেননা এটা তো বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ ও ব্যবচ্ছেদকারীগণ ভালো করেই জানেন; বরং এটা বর্ণনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আমরা এর স্রষ্টার ব্যাপারে ফিকির করবো। তিনি কীভাবে নিপুণতার সাথে সৃজন করেছেন। তিনি অস্থির আকার-আকৃতি রেখেছেন। পৃথক পৃথক এবং সংখ্যা রেখেছেন নির্ধারিত। তন্মধ্যে একটি সামান্য বেড়ে গেলে যেমন অসহ্য যন্ত্রণার কারণ হয়ে যায়, তেমনি একটি না থাকলে তা পূরণ করার প্রয়োজন পড়ে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে অস্থি সম্পর্কে যে চিন্তা-গবেষণা করা হয়, তার উদ্দেশ্য থাকে অস্থি চিকিৎসায় দক্ষতা অর্জন করা। আর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা এ সম্পর্কে ফিকির করে স্রষ্টার মহত্ত্ব উপলব্ধি করেন। কাজেই উভয় চিন্তার মঞ্চে বিরাট ফারাক।

অতঃপর দেখো কীভাবে আল্লাহ তাআলা হাড্ডিগুলো নড়াচড়ার জন্য যন্ত্র সৃষ্টি করেছেন। তা হচ্ছে মাংসপেশি। তিনি মানুষের শরীরে ৫২৯টি মাংসপেশি সৃষ্টি করেছেন। আর মাংসপেশি। বলা হয় যা মাংস, বন্ধন, পর্দা, শিরা দ্বারা গঠিত। আর এর পরিমাপ, ধরন স্থানের ভিন্নতার কারণে ভিন্ন হয়ে থাকে। ২৪টি মাংসপেশি চোখের তারা ও পাতা নড়াচড়ার ক্ষেত্রে কাজ করে। যদি এর কোনো একটিতে সমস্যা হয় তাহলে চোখের কাজে ব্যাঘাত ঘটে। এমনিভাবে প্রত্যেক অঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে মাংসপেশি রয়েছে।

আর রগ, শিরা, ধমনী ইত্যাদির সংখ্যা ও চলার পথ এসব বিষয় বড় আশ্চর্যজনক। এর বিস্তারিত আলোচনা করা কঠিন। সুতরাং চিন্তাশীলদের জন্য এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে।

মোটকথা, মানুষের পুরো শরীর চিন্তাভাবনার বিচরণক্ষেত্র। এরপর যদি মানুষের ভেতরকার গুণাগুণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়, তবে তার অনেক আশ্চর্য ও অনন্য কারিগরি বিষয় আমাদের সামনে আসে। আল্লাহ তাআলার এসব শিল্পকর্ম একবিন্দু নাপাক পানিতে নিহিত।

এবার ভেবে দেখা দরকার, যিনি এক ফোঁটা নাপাক পানি দিয়ে এতসব শিল্পকর্ম করতে পারেন, তিনি চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র সৃষ্টিতে না জানি আরও কত কিছু করে থাকবেন। গঠনগত দিক দিয়ে মহাকাশ অত্যন্ত সুদৃঢ়, অটল ও ঘন এবং কারিগরির দিক থেকে সম্পূর্ণ নিখুঁত। মানবদেহের চেয়ে এতে অধিক বিস্ময়কর বিষয়সমূহের সমাবেশ ঘটেছে। বরং মহাকাশের বিস্ময়কর বিষয়াদির সাথে গোটা জমিনের বিস্ময়কর বিষয়াদির কোনো তুলনাই হয় না। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন,

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰهَا. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا. وَ اَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ اَخْرَجَ ضُحٰهَا.

(হে মানুষ!) তোমাদের সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, না আকাশ? তিনি (আল্লাহ) তা নির্মাণ করেছেন; তিনি এর ছাদকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। আর তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন এর সূর্যালোক। (সূরা নাযিয়াত : ২৭-২৯)

এখন তুমি বীর্য ও তার প্রথম অবস্থা নিয়ে চিন্তা করো, এরপর চিন্তা করো এর দ্বিতীয় অবস্থা নিয়ে। এবার চিন্তা করো যদি মানুষ ও জিন একত্রিত হয়, এই বীর্যের মাঝে চোখ, কান, মেধা, শক্তি, ইলম, অন্তর ইত্যাদি সৃষ্টি করতে পারবে? অথবা হাড্ডি, রগ, শিরা, চামড়া, চুল সৃষ্টি করতে পারবে? (কখনই না) বরং তারা যদি এর হাকিকত ও সৃজন কৌশল আল্লাহর সৃজনের পর উদঘাটন করতে চায় তাহলেও তারা অক্ষম হবে।

প্রাচীরের গায়ে অঙ্কিত কোনো শিল্পীর সুনিপুণ হাতে তৈরি সুন্দর ও নিখুঁত শিল্পকর্ম দেখে আমরা ধন্যবাদ জানাই। শিল্পীকে বাহবা দেই এবং তার শিল্পকর্মের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি। তাকে একজন পরিপূর্ণ শিল্পী বলে বিশ্বাস করতে থাকি। অথচ আমরা জানি, এ চিত্র শুধুই রং, তুলি, দক্ষ হাত, দেয়াল ও ইচ্ছাশক্তির সমন্বয়ে গঠিত। এগুলোর একটিও শিল্পীর সৃষ্ট নয়; বরং এগুলো আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। শিল্পী শুধু রংকে এক বিশেষ ক্রম অনুসারে দেয়ালে সাজিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এতেই আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। পক্ষান্তরে স্বয়ং মানবসৃষ্টি দেখে আমরা কখনো আশ্চর্য হই না যে, স্রষ্টা এক ফোঁটা নাপাক শুক্র কীভাবে পিঠে ও বক্ষে

সৃষ্টি করেছেন। এরপর সেখান থেকে বের করে তার সুন্দর আকৃতি তৈরি করেছেন। এর অংশগুলো একই আকৃতির ছিল। সেগুলোকে পৃথক পৃথক অঙ্গে পরিণত করেছেন। এভাবে ধাপে ধাপে উন্নতি দান করে সেই বীর্যকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, বোধশক্তি ও বাকশক্তিসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানবে পরিণত করেছেন।

তিনি পিঠ সৃষ্টি করেছেন শরীরের ভিত্তি স্বরূপ, পেট খাবারের স্থান হিসেবে। মাথা ইন্দ্রিয়সমূহের কেন্দ্র হিসেবে। অতঃপর চক্ষু খুলেছেন এবং বিন্যস্ত করেছেন বিভিন্ন স্তরে। তার অবয়ব দান করেছেন। অতঃপর চোখ ঢেকেছেন পাতা দ্বারা যাতে রক্ষা করতে পারে ময়লা থেকে, এরপর এই চোখের সামনে উদ্ভাসিত করেছেন সীমানাহীন আকাশ।

এরপর কান সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে এক বিশেষ পানি রেখেছেন, যাতে করে শ্রবণশক্তি হেফাযতে থাকে এবং পোকামাকড় ভিতরে যেতে না পারে। এরপর কানে পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। যাতে করে বাহির থেকে আওয়াজ প্রথমে ওই পর্দার সাথে লাগে, অতঃপর ভিতরে যায়। এর আরেকটি ফায়েদা হচ্ছে, কোনো পোকা যদি ভিতরে যেতে চায়, তাহলে তা ভেদ করে যেতে হবে। আর ভেদ করতে গেলেই মানুষ বুঝে যাবে যে ভিতরে কিছু একটা রয়েছে।

অতঃপর চেহারার মাঝখানে নাক সৃষ্টি করেছেন এবং তার অবয়ব করেছেন সুন্দর। এর দুটি বাঁশি সৃষ্টি করেছেন এবং এর মাঝে দিয়েছেন খাবার ইত্যাদির ঘ্রাণ নেওয়ার শক্তি।

মুখ সৃষ্টি করেছেন এবং বাকশক্তি দান করেছেন এবং মনের ভাব প্রকাশ করার শক্তি দিয়েছেন। মুখকে সাজিয়েছেন দাঁত দ্বারা, যাতে পেষণ করতে পারে। এর গোড়া মজবুত করেছেন, মাথা ধারালো বানিয়েছেন এবং সাদা রঙের করেছেন। সুন্দরভাবে গেঁথেছেন ও বিন্যাস করেছেন।

উভয় ঠোঁট সৃষ্টি করেছেন, এর সুন্দর রং, গঠন দান করেছেন, যাতে হরফসমূহ মুখ দিয়ে সুন্দরভাবে আদায় হয়।

কণ্ঠনালী সৃষ্টি করেছেন এবং তা সৃষ্টি করেছেন যাতে সহজে ধ্বনি বের হয়। মুখকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যাতে প্রতিটি ধ্বনি নিজ স্থান থেকে উচ্চারিত হতে পারে এবং অন্যটার সাথে মিশে না যায়।

কণ্ঠনালীকে প্রশস্ততা, সংকীর্ণতা, মসৃণ, নরম শক্ত হওয়ার দিক দিয়ে বিভিন্ন ধরনের তৈরী করেছেন। ফলে প্রত্যেকের আওয়াজ ভিন্ন ভিন্ন, একজনের আওয়াজ আরেকজনের সাথে মিলে না। আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারে এটা কার আওয়াজ।

মাথাকে সজ্জিত করেছেন চুল দ্বারা। চেহারাকে করেছেন দাড়ি ও ভ্রু দ্বারা। ভ্রুকে সাজিয়েছেন চিকন চুল দ্বারা ও করেছেন ধনুক আকৃতির। দুচোখকে সাজিয়েছেন নেত্রলোম দ্বারা।

অতঃপর অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকটিকে নির্দিষ্ট কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। সুতরাং পাকস্থলী তৈরি করেছেন খাবারের স্থান ও হজমের জন্য। যকৃৎ খাবারকে রক্তে পরিণত করার জন্য। প্লীহা, পিত্তথলি, কিডনী যকৃৎ-এর সহায়তার জন্য। প্লীহা ভিতরের কালো বিষয়গুলো দূর করার জন্য। আর মূত্রথলি কিডনীকে সহায়তা করে দেওয়ার ক্ষেত্রে, রগ যকৃৎকে সহায়তা করে সারা শরীরে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে।

অতঃপর হাত সৃষ্টি করেছেন এবং দীর্ঘ করেছেন যাতে প্রয়োজন অনুপাতে কাজে লাগানো যায়। হাতের তালু ও পাঁচ আঙুল সৃষ্টি করেছেন। আর প্রতিটি আঙুলে দিয়েছেন তিনটি করে কর। চার আঙুল এক ধারাবাহিকতায় আর বৃদ্ধাঙুলি আরেক পাশে, যাতে গোলাকার করা যায়। যদি পূর্বাপর সকল ব্যক্তি মিলে বর্তমান আঙুলের বিন্যাস পরিবর্তন করে নতুন কোনো বিন্যাস দিতে চায়, তাহলে বর্তমান ফায়েদা অর্জিত হবে না।

বর্তমান বিন্যাসে চার আঙুলি দ্বারা বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা যায়। চার আঙুল এক লাইনে থাকা ও ছোট বড় থাকার মধ্যে অনেক হেকমত রয়েছে। যা অন্যভাবে সম্ভব নয়। যদি আঙুলগুলো ছড়িয়ে রাখা হয় তাহলে তা একটি পাত্রের মতো হয়ে যায়, যে কোনো জিনিস তাতে নেওয়া যায়। আর হাত বন্ধ করে নিলে তা আঘাত করার মাধ্যম হয়। আর যদি অসম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হয় তাহলে তা একটি চুল্লির মতো হয়ে যায়। অতঃপর প্রতিটি আঙুলের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য মাথায় নখ দিয়েছেন। নখের একটি ফায়েদা হচ্ছে যে চিকন জিনিস আঙুল দ্বারা ধরা যায় না, তখন নখ দ্বারা ধরা সম্ভব হয়। চুলকানোর জন্যও নখের

প্রয়োজন। বাহ্যত মনে হয়, এটা দেহের একটি ছোট অঙ্গ, কিন্তু এই নখের গুরুত্ব তখন বুঝে আসে যখন ঘামাচি বা চুলকানি হয়। নখ ছাড়া মানুষ কত অসহায়। নখের বিকল্প কিছুই নেই। চুলকানি হলে হাত অটোমেটিক ওই স্থানে চলে যায়, চাই মানুষ জাগ্রত থাকুক বা ঘুমন্ত। অন্য কেউ চুলকিয়ে দিলে নিজের হাতে চুলকানোর মতো হয় না।

এতো সব কিছু বীর্জ থেকে তিনস্তর অন্ধকার অতিক্রম করার পর ধারাবাহিকভাবে সৃজিত হয়েছে। যদি এই একের পর এক অন্ধকার দূর করা হয় এবং রেহেমের মধ্যে বাচ্চা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে দর্শক দেখতে পাবে যে, ওই সব বিষয় একটি নির্দিষ্ট ধারায় সৃজিত হচ্ছে। কিন্তু এর না রয়েছে কোনো যন্ত্র এবং না দেখা যায় এর নির্মাতাকে। তুমি কি এমন কোনো নির্মাতা দেখেছো যিনি যন্ত্র হাতে তুলে নেননি, কিন্তু কাজ অটোমেটিক হচ্ছে? (কখনো দেখোনি) এটা শুধু মহান আল্লাহরই বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা দেখার পর একবার তার সীমাহীন রহমতের দিকে তাকাও। যখন বাচ্চা বড় হয়ে যাওয়ার ফলে রেহেম সংকীর্ণ হয়ে যায়, তখন কীভাবে আল্লাহ তাকে পথ দেখিয়েছেন। ওই স্থান থেকে বের হওয়ার জন্য ওই বাচ্চা যখন পথ খোঁজে, তখন মনে হয় যেন সে দৃষ্টিমান আকেল।

অতঃপর যখন সে দুনিয়াতে এলো এবং খাবারের প্রয়োজন দেখা দিল, তখন কীভাবে তিনি এই বাচ্চাকে দুগ্ধ পানের দিকে পথ দেখালেন। অতঃপর যখন তার হালকা দেহ শক্ত খাবার গ্রহণ করতে অপারগ হলো, তখন তার জন্য কীভাবে তরল দুধের ব্যবস্থা করলেন। কীভাবে তিনি স্তন সৃষ্টি করলেন এবং সেখানে জমা করলেন তরল দুধ। স্তনের বোঁটা শিশুর মুখের সাথে মিল রেখে সৃষ্টি করেছেন। এরপর ওই বোঁটায় চিকন সূক্ষ্ম ছিদ্র এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, দুধ টানলে বের হয়। শিশুকে কীভাবে তিনি শিক্ষা দিলেন স্তন টানলে দুধ বের হয়, স্তন থেকে বের হয় তার খাবার।

অতঃপর তার দয়া, মায়া, ভালোবাসার দিকে তাকাও। দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত দাঁত সৃষ্টি হওয়াকে বিরত রেখেছেন।

কেননা দুই বছর বাচ্চা শুধু দুধই পান করে। অন্য কিছু তখন খেতে পারে না। যখন বড় হয়ে যায় তখন হালকা দুধ তার শরীরের জন্য যথেষ্ট হয় না। তখন তার একটু শক্ত খাবার খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। আর শক্ত খাবার চিবানোর প্রয়োজন হয়, তাই তার জন্য সৃষ্টি করেছেন ছোট ছোট দাঁত। সুবহানাল্লাহ! কীভাবে তিনি নরম মাড়ি থেকে শক্ত দাঁত বের করলেন! অতঃপর পিতামাতার অন্তরে তার ভালোবাসা ঢেলে দিলেন, যাতে তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দিতে পারে। যদি আল্লাহর এই কর্মপন্থা না হতো তাহলে এই বাচ্চা শিশুর বেঁচে থাকা ছিল অসম্ভব।

স্রষ্টার এ করুণা বড়ই বিস্ময়কর যে, জন্মের পর শিশু যখন নিজের জন্য কিছুই করতে পারে না, তখন মা-বাবা উভয়েই আল্লাহপ্রদত্ত মহব্বতের কারণে তার সেবা-যত্ন করে। যদি আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে এ মহব্বত সৃষ্টি না করতেন, তাহলে শিশুর চেয়ে অধিক অক্ষম এ জগতে কেউ থাকতো না। এরপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাকে শক্তি-সামর্থ্য, জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেন। এরপর শিশু সবল ও সুঠাম হয়ে কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ হয়ে যায়। তখন সে কৃতজ্ঞ অথবা কৃতঘ্ন, আনুগত্যশীল অথবা বিদ্রোহী, ঈমানদার অথবা বেঈমান হয়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন—

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا. اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا. اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا.

নিঃসন্দেহে মানুষের ওপর কালের এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলো না। নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। অতঃপর আমি তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করেছি। নিশ্চয় আমি তাকে পথের দিশা দিয়েছি। এখন হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। (সূরা ইনসান : ১-৩)

সুতরাং দৃষ্টি দাও তার অনুগ্রহ ও দয়ার দিকে এবং তার শক্তি ও হিকমতের দিকে। অবশ্যই তা তোমাকে হতবুদ্ধি করে দিবে।

কিন্তু অবাক করার বিষয় হচ্ছে, কেউ যদি সুন্দর হস্তাক্ষর দেখে অথবা কারুকার্য করা প্রাচীর দেখে তাহলে অবাক হয়ে এর লিপিকার ও নকশাকার এর ব্যাপারে ভাবতে থাকে যে, কীভাবে তা অঙ্কন করেছে। তাকে মনে মনে অনেক বড় ভাবতে থাকে এবং বলতে থাকে কতইনা দক্ষ এই নকশাকার! কত নিপুণ তার অঙ্কন শিল্প। অপরদিকে যখন নিজের দিকে তাকায় অথবা সৃষ্টিজগতের দিকে তাকায় তখন সে অবাক না হয়ে এর স্রষ্টা ও নির্মাতার চিন্তা থেকে গাফেল থাকে এবং তাঁর বড়ত্ব তার অন্তরে সৃষ্টি হয় না।

উপরে মানবদেহের অতি সামান্য বিস্ময়কর কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সবগুলো লেখা সম্ভব নয়। কেউ চিন্তা করতে চাইলে এটুকু বিষয় চিন্তা করাই তার জন্য যথেষ্ট এবং এগুলো আল্লাহর বড়ত্বের সুস্পষ্ট দলিল। কিন্তু মানুষ এগুলো থেকে অমনোযোগী হয়ে পেট ও পিঠের ধান্দায় জড়িয়ে আছে। এছাড়া সে কিছুই করতে পারে না যে, ক্ষুধা লাগলে খেয়ে নিল এবং যখন পেট ভর্তি হয়ে গেল তখন ঘুমিয়ে পড়ল। কাম-বাসনা উত্তেজিত হলে সঙ্গম করে নিল এবং রেগে গেলে লড়াই করলো। অথচ এসব কাজে চতুষ্পদ ও হিংস্র-প্রাণিরাও মানুষের অংশীদার। যে মানবীয় বৈশিষ্ট্য থেকে চতুষ্পদ প্রাণিরা বঞ্চিত, তা হচ্ছে আকাশ ও জমিনের রহস্য এবং অত্যাশ্চর্য বিষয় সম্পর্কে ফিকির করে আল্লাহ তাআলাকে চেনা-জানা। কারণ, এর মাধ্যমেই মানুষ নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের স্তরে যাওয়ার অবকাশ পায় এবং নবী ও সিদ্দীকদের তালিকাভুক্ত হয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে চলে যায়। চতুষ্পদ প্রাণিরা এ স্তর অর্জন করতে পারে না এবং সে মানুষও পারে না, যে দুনিয়াতে শুধু চতুষ্পদ প্রাণিদের ন্যায় কামভাব নিয়েই পড়ে থাকে। কাজেই এধরনের মানুষ চতুষ্পদ প্রাণির চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ, তাদের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবেই খোদায়ী মারেফাত লাভের ক্ষমতা নেই। মানুষের মাঝে আল্লাহ তাআলা এ ক্ষমতা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ তা অকার্যকর করে রাখে।

রূহের চিন্তার পদ্ধতি জানার পর, এখন মানুষের আবাসস্থল দুনিয়া সম্পর্কে ফিকির করার পালা। ভূপৃষ্ঠেও অনেক নিদর্শন রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ধরাপৃষ্ঠকে বিছানা বানিয়েছেন। এতে সড়ক নির্মাণ করে একে চলাফেরার উপযোগী করেছেন। এতে পর্বতমালাকে পেরেক মেরে

দিয়েছেন, যাতে নড়াচড়া না করে। এরপর একে এত প্রসারিত করেছেন যে, কেউ আজীবন সফর করেও এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে পারে না। তাই আল্লাহ তাআলা এসব বিষয় বর্ণনা করে বলেন,

وَ السَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّ اِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ. وَ الْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ.

আর আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী। আর আমি ভূমিকে বিছানা (স্বরূপ) বানিয়েছি, সুতরাং আমি কত সুন্দর করে বিছাই! (সূরা যারিয়াত : ৪৭-৪৮)

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا.

তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সমতল করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তার দিগদিগন্তে বিচরণ করো। (সূরা মূলক : ১৫)

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا.

যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা ও আসমানকে ছাদ করেছেন। (সূরা বাকারা : ২২)

এমনিভাবে কুরআন মাজীদে পৃথিবীর উল্লেখ বহু জায়গায় হয়েছে, যাতে এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়।

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর উপরিভাগকে জীবন্ত মানুষের আবাসস্থল করেছেন এবং ভেতর ভাগকে করেছেন মৃতদের নিদ্রাস্থল। তাই ইরশাদ হয়েছে,

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا. اَحْيَآءً وَّ اَمْوَاتًا.

আমি কি ভূমিকে ধারণকারীরূপে সৃষ্টি করিনি? জীবিত ও মৃতের জন্য? (সূরা মুরসালাত : ২৫-২৬)

যে ভূমিকে প্রাণহীন দেখা যায়, বৃষ্টির পানি পতিত হলে সেটা সজীব হয়ে ওঠে এবং নানা রঙের শাকসবজি গজাতে থাকে। এতে নানারকমের প্রাণি ও কীট-পতঙ্গ জন্মায়। আরও লক্ষণীয় যে, ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন প্রান্তে উঁচু উঁচু মজবুত পর্বতমালা দিয়ে একে কীরূপে শক্ত করা হয়েছে এবং পাহাড়ের নিম্নদেশে কীরূপে পানির ভাণ্ডার স্থাপন করা হয়েছে, যা নদী-নালার আকারে সমস্ত ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে। এ পানির সাহায্যেই নানারকম গাছ-গাছালি, শস্য, ফলমূল এবং বিভিন্ন আকার, রং, স্বাদ ও গন্ধের অসংখ্য

ফল উৎপাদিত হয়। এসব ফল স্বাদে একটি অপেক্ষা অপরটি উত্তম। অথচ এগুলো একই পানি দিয়ে সিক্ত ও একই মাটি থেকে উৎপন্ন। যদি বলো এর ভিন্নতার কারণ হচ্ছে এর বীজ ও মূলের ভিন্নতা। সুতরাং যখন বিচির ভিতর তাজা গুচ্ছ থাকে এবং একটি শস্যের মধ্যে সাতটি শিষ থাকে এবং প্রতিটি শিষে শত দানা।

অতঃপর দৃষ্টি দাও, মরুভূমির দিকে এবং এর ভিতর বাহির খোঁজ করো। তখন দেখতে পাবে, একই ধরণের মাটি। অতঃপর যখন বৃষ্টি বর্ষণ করেন তখন তা জেগে ওঠে এবং উদগত করে প্রত্যেক প্রকারের ফসল। সৃষ্টি করে রংবেরঙের ফসল, যার একটি অপটির সাথে মিল রাখে। প্রত্যেকটির রয়েছে ভিন্ন স্বাদ, গন্ধ, আকৃতি। অতঃপর তার আধিক্যের দিকে ও প্রকারের দিকে তাকাও। এরপর চিন্তা করা প্রয়োজন, আল্লাহ তাআলা এসব ফল ও উদ্ভিদের মধ্যে কত বিচিত্র ফায়দা নিহিত রেখেছেন। যেমন, কোনোটি আহারের কাজ করে, কোনোটি শক্তি যোগায়, কোনোটি জীবন রক্ষাকারী, কোনোটি শীতল, কোনোটি উষ্ণ, কোনোটি পাকস্থলীতে পৌঁছে শিরা-উপশিরার ভেতর থেকে পিত্ত দূর করে, কোনোটি নিজেই পিত্ত হয়ে যায়, কোনোটি কফ নাশক, কোনোটি কফবর্ধক, কোনোটি রক্ত পরিষ্কারক এবং কোনোটি কষ্ট নিরোধক।

প্রত্যেকটিই ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে। কোনোটি নিদ্রা নিয়ে আসে আর কোনোটি শক্তি সৃষ্টি করে। সুতরাং জমিনের বুকে এমন কোনো পাতা ও শস্য নেই যার মধ্যে কোনো ফায়েদা নেই। প্রত্যেকটি শস্যই ভালো ফলনের জন্য এর বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন। খেজুর গাছে পরাগায়ন করা হয়। ফলের বাগান বা আঙুর ক্ষেত পরিষ্কার করা হয়। শস্য থেকে পরিষ্কার করা হয় ঘাস ও ঝোপঝাড়। কিছু ফসল রয়েছে যার বীজ বপন করা হয়। আর কিছু রয়েছে ডালপালা রোপন করতে হয়। আমরা যদি শস্য ও ফসলাদির প্রকার, অবস্থা ও লাভ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে জীবন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তার আলোচনা শেষ হবে না। এজন্য এতটুকু বলেই শেষ করছি। বাকিগুলো চিন্তা করে বের করো।

আল্লাহর আরেক বিস্ময়কর নিদর্শন হচ্ছে, পাহাড়ের নিচে অবস্থিত খনি, জমিনের নিচের খনিজসম্পদ। পাহাড়ের দিকে লক্ষ করো। কীভাবে তিনি স্বর্ণ, রূপা, নীলকান্তমণি ইত্যাদির মতো মূল্যবান সম্পদ সেখান থেকে বের

করেন। কিছু রয়েছে যা হাতুড়ি দিয়ে পিটানো হয়, যেমন- স্বর্ণ, রূপা, তামা, লোহা আর কিছু রয়েছে যা এমন নয় যেমন: নীলকান্তমণি, গাঢ়লাল রঙের রত্ন ইত্যাদি। আর কীভাবে মহান আল্লাহ তাআলা তা উত্তোলন করা ও খনি আবিষ্কার করার পন্থা শিখিয়েছেন এবং বিভিন্ন প্রকারের আসবাবপত্র তৈরি করার জ্ঞান দান করেছেন।

অতঃপর মাটির নিচের অন্যান্য সম্পদের দিকে তাকাও যেমন- পেট্রোল, গন্ধক, আলকাতরা, ইত্যাদি।

খনির মধ্যে সামান্যতম একটি হচ্ছে লবণ। এর প্রয়োজন খাবারের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য হয়ে থাকে। যদি তরকারিতে লবণ না হয়, তাহলে খাবারের স্বাদই নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি যদি কোনো শহরে লবণ না থাকে তাহলে ওই শহরবাসী মরতে শুরু করবে। আল্লাহর রহমতের দিকে দৃষ্টি দাও যে, তিনি জমিনের কিছু অংশ লবণক্ষেত বানিয়েছেন এভাবে যে, সেখানে বৃষ্টির স্বচ্ছ পানি জমা হয়, অতঃপর পর্যায়ক্রমে তা লবণে পরিণত হয়। কারও পক্ষে তরকারি ব্যতীত শুধু লবণ খাওয়া সম্ভব নয়। লবণ শুধু খাবারের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়।

মোটকথা, জমিনের বুকে যা রয়েছে তার প্রত্যেকটির মধ্যে এক বা একাধিক ফায়দা রয়েছে। কোনো কিছু ফায়দা থেকে খালি নয়। প্রতিটি বস্তু যেভাবে সৃজিত হওয়ার দরকার সেভাবেই সৃজিত হয়েছে এবং যেভাবে আল্লাহর মর্যাদা ও শান প্রকাশ পাবে সেভাবেই দুনিয়ায় সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে। সুবহানাল্লাহ! তাইতো আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ. مَا خَلَقْنٰهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ.

আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এদুয়ের মধ্যে কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি; আমি এ দুটিকে অহেতুক সৃজন করিনি। (সূরা দুখান : ৩৮-৩৯)

নানারকম প্রাণিও অন্যতম নিদর্শন। এগুলোর মধ্যে কোনোটি উড়ে, কোনোটি মাটিতে চলে। যেগুলো চলে, সেগুলোর কোনোটি দুপায়ে, কোনোটি চার পায়ে, কোনোটি দশ পায়ে এবং কোনোটি একশ' পায়ে চলে। কিছু কীট-পতঙ্গের মধ্যে এমন দেখা যায়। এরপর পশু-পাখি, বন্য ও গৃহপালিত প্রাণির মধ্যে এত বেশি বিস্ময়কর বিষয়ের সমাবেশ লক্ষ করা যায়, যেগুলো লিখে শেষ করা অসম্ভব। মশা, মাছি, পিঁপড়া,

মধুপোকা ও মাকড়সার মতো ছোটো প্রাণির বিস্ময়কর বিষয়াদি বর্ণনা করতে চাইলেও তা কারও পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। যেমন, মাকড়সা নদীর তীরে নিজের ঘর তৈরি করে। প্রথমত, সে এমন দুটি স্থান খোঁজ করে, যার মাঝে এক হাত অথবা তার চেয়ে কম-বেশি পার্থক্য থাকে, যাতে উভয় স্থানে সে মুখনিসৃত আঠালো আঁশ পৌঁছতে পারে। এরপর সে মুখনিসৃত লালা লাগিয়ে দেয়, যা সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গার সাথে আটকে যায়। এরপর সে অপরপ্রান্তে গিয়ে সেখানেও আঁশটি লাগিয়ে দেয়। এরপর সে কয়েকবার আসা-যাওয়া করে এবং সঙ্গত ব্যবধানে তা জোড়া দিতে থাকে। যখন উভয় স্থানে আঁশের মাথা সংযোজিত হয়ে যায়, তখন সে প্রস্থের বুনন কাজ শুরু করে এবং দৈর্ঘ্যের আঁশের ওপর প্রস্থের আশ স্থাপন করতে থাকে। যেখানে প্রস্থের আঁশ দৈর্ঘ্যের আঁশের ওপর একত্র হয়, সেখানে গিরা দেয়। এতেও সে জ্যামিতিক নমুনার প্রতি লক্ষ রাখে। এভাবে সে এমন একটি জাল বয়ন করে, যাতে মশা-মাছি আটকা পড়ে যায়। সে নিজে এক কোণে ওত পেতে বসে থাকে। কোনো শিকার ফাঁদে আটকে গেলে দ্রুত সেটিকে লুফে নিয়ে খেয়ে ফেলে। এভাবে শিকার করে যখন সে ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন কোনো প্রাচীরের কোণ খোঁজ করে এর দুপ্রান্তে আঁশ লাগিয়ে দেয়। এরপর আরও আঁশ যুক্ত করে ঝুলতে থাকে। ঝুলন্ত অবস্থায় সে মশা-মাছি ইত্যাদির অপেক্ষা করতে থাকে। কোনো মাছি সেখানে এলে তাকে পাকড়াও করে পায়ে আঁশ জড়িয়ে দেয়। এরপর খেয়ে ফেলে।

প্রশ্ন হলো, ক্ষুদ্র মাকড়সা এ নৈপুণ্য নিজে নিজেই আয়ত্ত করেছে, না কোনো মানুষ তাকে বলে দিয়েছে অথবা শিখিয়েছে? না, তার কোনো পথ প্রদর্শক নেই। এমতাবস্থায় সে-ই কি তার স্রষ্টা। একি প্রজ্ঞাময়, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার সাক্ষ্য দেয় না? বিজ্ঞব্যক্তি এ ক্ষুদ্রপ্রাণির মধ্যে স্রষ্টার মহিমা, কুদরত ও প্রজ্ঞা দেখতে পায়। বৃহদাকার প্রাণির কথা না-ই বললাম। এ ধরনের ক্ষুদ্রপ্রাণি অসংখ্য ও অগণিত। এগুলো দেখে আমাদের বিস্ময় না লাগার কারণ হচ্ছে, প্রতিনিয়ত প্রচুর পরিমাণে দেখা। দেখতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। হ্যাঁ, যদি নতুন কোনো প্রাণি বা পোকা দেখি, তবে বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলি— সুবহানাল্লাহ, কি অদ্ভুত প্রাণি!

মানুষ হচ্ছে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। কিন্তু কখনো নিজের উপর আশ্চর্য প্রকাশ করে না; বরং যদি সে তার পালিত প্রাণির দিকে তাকায় এবং তার গঠন আকৃতির দিকে দৃষ্টি দেয়। অতঃপর এর ফায়দা যেমন, চামড়া, পশম যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পোশাকের ব্যবস্থা করেছেন। মানুষের পানাহারের পাত্র বানিয়েছেন। তাদের পা রক্ষার মাধ্যম বানিয়েছেন। প্রাণির দুধ ও গোশতকে বানিয়েছেন উত্তম খাবার। কিছু প্রাণি বানিয়েছেন আরোহণের জন্য, আর কিছু বানিয়েছেন বাহনের জন্য, যা মালামাল বোঝাই করে বহুদূর নিয়ে যায়। প্রাণির এই সৃজন, ফায়দা ও ব্যবহার দেখে মানুষ অবাক হয়ে যায়। কিন্তু নিজেকে দেখে অবাক হয় না।

পবিত্র ওই সত্তা যার ইলমে রয়েছে সমস্ত বিষয়াদি। কোনো চিন্তাভাবনা, সহকারীর সহায়তা ব্যতীতই তিনি সব কিছু জানেন। তিনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তরে ছোটো মাখলুক দর্শনে তাঁর একত্ববাদের সাক্ষ্য তাদের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন। আর মানুষের ওপর আবশ্যক যে, সে আল্লাহর শক্তি ও গজবের বিশ্বাস রাখবে। তাঁর রব হওয়ার বিষয়টি মেনে নিবে। তাঁর বড়ত্ব ও ক্ষমতা অনুধাবন করে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করবে। এমন কেউ নেই যিনি আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা করতে পারে। আমাদের জ্ঞানের শেষ হচ্ছে, আমরা তার পরিচয়ের মাধ্যমে, নিজের অক্ষমতা ও অজ্ঞতা স্বীকার করে নেওয়া। আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি তার দয়া ও মায়ায় আমাদের সম্মানিত করবেন।

দুনিয়ার স্থলভাগের অতি অল্প পরিমাণ আশ্চর্য বস্তু দেখার পর এখন জলভাগের বস্তু সম্পর্কে ফিকির করা প্রয়োজন। জলভাগের বিশালতা স্থলভাগের তুলনায় অনেক বেশি। এ কারণে এর বিস্ময়কর বস্তুসমূহ স্থলভাগের বিস্ময়কর বস্তুর চেয়ে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ বেশি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

اَلْأَرْضُ فِي الْبَحْرِ كَالْإِصْطَبْلِ فِي الْأَرْضِ.

সমুদ্রের মাঝে জমিন এমন; জমিনের বুকে আস্তাবল যেমন। আপনি ভালোভাবেই জানেন, আস্তাবল ও জমিনের সাথে কী ধরনের সম্পর্ক

রয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে জমিনকে সমুদ্রের মোকাবেলায় কেয়াস করে নিন। আপনি জমিনের বিস্ময়কর বিষয় দেখেছেন, এবার সমুদ্রের বিষয় নিয়ে চিন্তা করুন। সমুদ্রের মধ্যে যে পরিমাণ বিস্ময়কর বস্তু রয়েছে তা জমিনে বিদ্যমান বিস্ময়কর বিষয়সমূহ থেকে অনেক বেশি, যেমনিভাবে সমুদ্রের পরিধি জমিনের পরিধি থেকে অনেক বেশি। সাগরের কিছু প্রাণি এত বিশালকায় যে, সেগুলোকে পানির উপরিভাগে দেখলে দ্বীপ বলে মনে হবে। ইতিহাসে এমন কথাও পাওয়া যায় যে, সমুদ্র ভ্রমণকারীরা তিমি মাছের পিঠকে দ্বীপ ভেবে সেখানে নেমে পড়েন। এরপর আগুনের তাপে তিমি যখন নড়াচড়া করতে থাকে, তখন বুঝতে পারেন এটি একটি সামুদ্রিক প্রাণি।

স্থলভাগে প্রাণির যত প্রকার রয়েছে যেমন, গরু, ঘোড়া, মানুষ ইত্যাদি, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রকার জলভাগে রয়েছে। তাছাড়া সমুদ্রে কিছু প্রাণি এমনও আছে, স্থলভাগে যেগুলোর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। যারা সামুদ্রিক সফরের কষ্ট স্বীকার করে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাদের লিখিত বই-পুস্তকে এসব প্রাণির নমুনা দেখা যায়।

অতঃপর দৃষ্টি দাও, কীভাবে আল্লাহ তাআলা ঝিনুকের ভিতর মুক্তা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তা করো কীভাবে পানির নিচে পাথরের মধ্যে মুক্তাদানা সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন প্রবাল যা গাছের আকৃতির ন্যায়।

অতঃপর চিন্তা করো, বিশালকায় তিমি ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ নিয়ে যা সমুদ্র তার কিনারায় ঠেলে দেয় বা তার থেকে বের করা হয়।

আরও চিন্তা করো, জাহাজের সমুদ্র বক্ষচিরে অগ্রসর হওয়া নিয়ে। কীভাবে পানির ওপর তিনি সেটাকে ধরে রেখেছেন এবং ব্যবসায়ী ও মুসাফিরকে পৌঁছে দিচ্ছেন দূরপ্রান্তে। জাহাজকে চলার জন্য প্রবাহিত করে দিয়েছেন বাতাস। আর নাবিকদের ও শিখিয়ে দিয়েছেন সমুদ্র পথ।

সর্বোপরি, সমুদ্রের বুকে আল্লাহ তাআলার এত বেশি বিস্ময়কর শিল্পকর্ম বিদ্যমান যে, সেগুলো বিশাল কলেবরে কয়েকটি খণ্ডে আলোচনা করেও শেষ করা যাবে না। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক বিস্ময়কর হচ্ছে পানি। যা প্রবাহিত, স্বচ্ছ, যেন একটি শারীরিক বস্তু। এর গঠন প্রকৃতি অত্যন্ত নাজুক। দৃশ্যত এক বস্তু হলেও পৃথকীকরণকে এত দ্রুত গ্রহণ করে যেন প্রতিটি

ফোঁটায় পৃথক সত্তা। স্থলভাগের প্রাণি ও উদ্ভিদের জীবন এরই ওপর নির্ভরশীল। যদি কোনো মানুষ এক ঢোক পানির মুখাপেক্ষী হয় এবং তা তাকে পান করতে না দেওয়া হয়, তাহলে তার মালিকানায় পৃথিবীর মধ্যকার সবকিছু থাকলে সে তা খরচ করেও এক ঢোক পানি যোগাড় করবে। পান করার পর যদি মূত্র পথে তা বের করতে নিষেধ করা হয়, তবে তার জন্যও সে দুনিয়ার সকল প্রকার ধনভাণ্ডার বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হবে। আশ্চর্যের বিষয়, আল্লাহ তাআলার এ সমস্ত নিয়ামত সম্পর্কেও মানুষ ফিকির করে না। অথচ এ সম্পর্কে ফিকির করার বিস্তর সুযোগ আছে।

এর প্রতিটি বস্তু স্পষ্ট সাক্ষী, উজ্জ্বল নিদর্শন, প্রতিটি বস্তু তার আশ্চর্যজনক অবস্থার মাধ্যমে তার প্রভুর বড়ত্ব বর্ণনা করছে এবং তার প্রজ্ঞার পূর্ণতা প্রকাশ করছে। বিচক্ষণদের আহবান করছে ও প্রত্যেক জ্ঞানীকে বলছে, তুমি কি আমাকে দেখো না, আমার আকৃতি ও গঠন এবং আমার ফায়েদার দিকে তাকাও না? তুমি কি মনে করেছো, আমি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে গেছি অথবা আমার স্বজাতির কেউ আমাকে সৃষ্টি করেছে? তুমি কি লজ্জা বোধ করো না যে, তিন হরফের একটি লেখা দেখে তুমি ধারণা করতে থাকো এটা এক বিজ্ঞ, বিচক্ষণ মানুষের শিল্প কর্ম। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতি কলমে তোমার চেহারায় যে অঙ্কন তিনি করেছেন যার সীমা ও নৈপুণ্য কোনো চোখ নির্ধারণ করতে পারে না, তুমি এমন মহান শৈলীর শিল্পকর্ম দেখে অবাক হও না।

যাদেরকে আল্লাহ তাআলা শ্রবণশক্তি ও অন্তরদৃষ্টি দান করেছেন তাদেরকে বীর্য বলছে যে, হায়েযের রক্তে নিমজ্জিত নাড়িভুঁড়ির অন্ধকারে আমার অবস্থা নিয়ে চিন্তা করো। নকশাকার আমার নয়নতারা, ভ্রু, কপাল, গাল, ঠোঁট অঙ্কন করেছেন বলেই ধীরে ধীরে পূর্ণ নকশা ফুটে উঠতে থাকে। না পিতার রয়েছে এ ব্যাপারে কোনো খবর না মাতার। এই মহান নকশাকার উত্তম ও বিস্ময়কর, না ওই নকশাকার যিনি কলম দিয়ে আশ্চর্যজনক এক চিত্র আকঁলো যা তুমি কয়েকবার দেখলে তুমি নিজেও আঁকতে পারবে। তুমি কি পারবে এ জাতীয় নকশা আঁকতে, যাতে স্পর্শ ও দেখা ব্যতীত ও পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যতীত বীর্যের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ এমনকি সব অংশও মিলে যাবে?

যদি তুমি মহান সত্তার এই বিস্ময়কর বিষয়াদি দেখে অবাক না হও এবং উপলব্ধি করতে না পারো যে, যিনি এ সবের নকশাকার, তিনি অতুলনীয় তাঁর সমকক্ষ কোনো নকশাকার নেই এবং তাঁর শিল্প ও নৈপুণ্যতার কাছে কোনো নৈপুণ্যতাই হতে পারে না। তাহলে তোমার অবাক ও আশ্চর্য না হওয়ার ওপর আশ্চর্য হওয়া উচিত, কেননা এটাই সবচেয়ে বড় অবাক হওয়ার বিষয়। পবিত্রতা ওই সত্তার জন্য যিনি পথ দেখান ও বিপথগামী করেন, বিভ্রান্ত করেন ও হেদায়েত করেন, সৌভাগ্যশালী করেন ও হতভাগা করেন। তিনি তার প্রিয় বান্দাদের দৃষ্টি খুলে দিয়েছেন। ফলে তারা তাঁকে দেখতে পায় পৃথিবীর প্রতিটি কণায়। আর তার দুশমনদের চোখ এসব থেকে অন্ধ করে দিয়েছেন। তিনিই স্রষ্টা, দয়ালু, অনুগ্রহশীল, তার ফয়সালা রদকারী নেই। তিনিই মহাপরাক্রমশালী।

আরও একটি চিন্তা-ফিকিরের বিষয় হচ্ছে বাতাস। এই সূক্ষ্ম বস্তুটির জায়গা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যভাগে। চলাফেরার সময় গায়ে লাগলে এর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়; কিন্তু চোখে দেখা যায় না। জলজ প্রাণি পানিতে হাত-পা নেড়ে যেমন সন্তরণ করে, তেমনি পাখিরাও শূন্যে ডানার সাহায্যে বায়ু ভেদ করে এগিয়ে যায়। ঝড়-তুফানের কারণে সমুদ্রে যেমন ঢেউয়ের ওপর ঢেউ ওঠে, তেমনি প্রবল বাতাসের কারণে সমুদ্রে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা বায়ুকে গতিশীল করলে সে চলমান বায়ু হয়ে যায়। এরপর ইচ্ছা করলে তিনি একে বৃষ্টির সুসংবাদদাতা করে দেন। ইরশাদ হয়েছে, وَ اَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ আমি বৃষ্টিবাহী বাতাস পাঠাই। (সূরা হিজর : ২২)

আবার ইচ্ছা করলে তিনি একে নাফরমান মানুষের জন্য আযাবে রূপান্তরিত করে দেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ. تَنْزِعُ النَّاسَ ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ.

আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম এক প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে, তা মানুষকে উপড়ে ফেলেছিল উৎপাটিত খেজুর কাণ্ডের ন্যায়। (সূরা কামার : ১৯-২০)

বাতাস নাজুক ও সূক্ষ্ম। তা সত্ত্বেও তার ক্ষমতা এভাবে অনুমান করা যায় যে, বাতাস ভর্তি কোনো মশক যদি কেউ পানিতে নিমজ্জিত করতে চায়, তবে সে সক্ষম হয় না। এজন্যই ভারি জাহাজ ও নৌকা পানির উপর ভেসে থাকে। সুতরাং পবিত্র সে সত্তা, যিনি ভারি জাহাজকে কোনোরূপ বন্ধন ব্যতীত পানির ওপর ভাসিয়ে রাখেন।

এমনিভাবে প্রত্যেক শূন্যগর্ভ বস্তু যার মধ্যে বাতাস রয়েছে তারও একই অবস্থা। কেননা বাতাসের মধ্যে পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে। এই বাতাসের ওপর ভর করে জাহাজ ভারি হওয়ার কারণে পানির ওপর স্থির থাকে যেমন, কোনো ব্যক্তি কূপের মধ্যে পড়ে গেল, তখন এমন এক ব্যক্তির আচল ধরে রাখলো যে নিজেকে ও ওই ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারে। স্পষ্টত এমন ব্যক্তি ডুবে যাবে না। পবিত্র ওই সত্তা যিনি আমাদের জাহাজকে বাতাসের মাধ্যমে ভাসিয়ে রেখেছেন। অথচ উভয়ের মাঝে বিদ্যমান দৃশ্যমান কোনো বাধন নেই।

এছাড়া শূন্যমণ্ডলে আরও রয়েছে মেঘমালা, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, অগ্নিপিণ্ড ইত্যাদি। এগুলো নিয়েও ফিকির করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কুরআন মাজীদের অনেক আয়াতে এগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

যেমন, وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালা। (সূরা বাকারা : ১৬৪)

অন্যান্য আয়াতে বজ্র, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টির কথাও বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এগুলোর মধ্যে আমাদের অংশ যদি এটুকুই থেকে থাকে যে, বৃষ্টিকে চোখে দেখলাম এবং বজ্রকে কানে শুনলাম, তাহলে এতে চতুষ্পদ প্রাণিও তো আমাদের সঙ্গে অংশীদার। অথচ আমাদেরকে চতুষ্পদ প্রাণির নিম্নজগত থেকে উন্নীত হয়ে ঊর্ধ্বজগতের বাসিন্দাদের সাথে মিশতে হবে। অর্থাৎ, বাহ্যিক দৃষ্টিতে এগুলো দেখে নেওয়ার পর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এগুলোর অভ্যন্তরীণ আশ্চর্যপূর্ণ বিষয়সমূহ লক্ষ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রেও ফিকির বহুদূর অগ্রসর হতে পারে যদিও তীর পর্যন্ত পৌঁছা অসম্ভব।

ভেবে দেখো, আল্লাহ তাআলা কীভাবে ঘন ও ভারি মেঘমালাকে মুহূর্তের মধ্যে শুভ্র আকাশে পরিণত করেন। তিনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে তা সৃষ্টি করতে পারেন। কীভাবে মেঘমালা এত হালকা হওয়া সত্ত্বেও পানির

বোঝা বহন করে বেড়ায়। আল্লাহ তাআলা যখন বৃষ্টির অনুমতি দেন তখনই সে বৃষ্টি বর্ষণ করে। তা ওই পরিমাণই বর্ষণ করে যতটুকু আল্লাহ তাআলা চান। সেভাবেই তা বর্ষণ করে যেভাবে তিনি চান, বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা এমনভাবে পতিত হয় যে, এক ফোঁটার সঙ্গে অন্য ফোঁটার মিশ্রণ ঘটে না। পৃথিবীর সকল মানুষ মিলে যদি বৃষ্টির একটি ফোঁটা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে অথবা বৃষ্টির ফোঁটার সংখ্যা গণনার চেষ্টা করে তাহলে তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হবে। তা তো কেবল ওই সত্তার পক্ষেই সম্ভব যিনি তা সৃষ্টি করেছেন।

বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটাকে জমিনের যে অংশের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা কেবল সেই অংশেই পতিত হয় এবং তা সেখানকার পশুপাখি, কীটপতঙ্গ সবারই কাজে আসে। যে প্রাণির রিযিকস্বরূপ ফোঁটাটি পতিত হয় সেই প্রাণি বা কীটপতঙ্গের নাম আল্লাহ তাআলার কুদরতে ওই ফোঁটায় লিখে দেওয়া হয় যদিও তা বাহ্য দৃষ্টিতে অবলোকন করা যায় না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা জানেন বৃষ্টির এই ফোঁটাটি কখন, কোথায় এবং কার রিযিকস্বরূপ পতিত হচ্ছে।

এসবই মহান প্রতাপশালী আল্লাহ তাআলার কুদরত। দুনিয়ার কারও এতে কোনো অংশীদারত্ব এবং দখল নেই। প্রকৃত মুমিন বান্দাগন তাঁর এই কুদরতের সামনে নত হয়, আর শয়তানের ধোঁকায় প্রতারিত মূর্খরা বলে, বৃষ্টি পড়ার কারণ হলো, পানি স্বভাবগতভাবেই ভারি জিনিস, আর ভারি জিনিস নিচের দিকেই ধাবিত হয়। যদি তাকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি পানির যে স্বভাবের কথা বললেন, সেই স্বভাব কী জিনিস? কে-ই বা তাকে সৃষ্টি করেছেন? পানিই বা কে সৃষ্টি করেছেন যার স্বভাবই হলো ভারি হওয়া? কেনই বা পানি স্বভাবগতভাবে ভারি হওয়া সত্ত্বেও গাছের শেকড়ে ঢাললে সেটা ডালে ডালে পৌঁছে যায়? এই ভারি জিনিসটি কীভাবে ওপর থেকে নিচে এবং নিচ থেকে ওপরে বিচরণ করতে থাকে, দৃষ্টির অগোচরে কীভাবে এই পানি গাছের ডালে ডালে, পাতায় পাতায় পৌঁছে যায়? কীভাবে এর সহযোগিতায় লতাপাতা, ফলমূল উৎপন্ন হয়? পানি যদি স্বভাবগতভাবে নিচের দিকেই ধাবমান হতো তাহলে এখানে ওপর দিকে উঠছে কীভাবে?

এসব প্রশ্নের উত্তর হলো, একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাতেই এমন হয়।

চিন্তা করার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আসমান ও তারকারাজির রহস্যাবলি। যদি কেউ সকল বিষয় জেনে যায় এবং আকাশরাজির রহস্যাবলী জানতে পারে, তাহলে বাস্তবে সে কিছুই জানল না। কারণ আকাশ ছাড়া পৃথিবী, সাগর-মহাসাগর, বাতাস ইত্যাদি যতো কিছু আছে, আকাশরাজ্যের তুলনায় সবগুলো যেন সাগরের তুলনায় এক ফোঁটা পানি। বরং এর চেয়েও ছোট চিন্তার বিষয়, আল্লাহ তাআলা আকাশ ও তারকারাজির বিষয়টিকে কুরআন মাজীদে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন। এমন কোনো সূরা নেই, যাতে এগুলোর বিশালত্বের বিষয়ে আলোচনা হয়নি। কয়েক স্থানে তো এগুলোর কসমও করা হয়েছে। যেমন,

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ.

শপথ বুরূজ (নক্ষত্র) বিশিষ্ট আকাশের। (সূরা বুরূজ : ১)

وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ.

শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর। (সূরা ত্বরেক : ১)

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ.

শপথ বহু পথবিশিষ্ট আকাশের! (সূরা যারিয়াত : ৭)

وَ السَّمَآءِ وَ مَا بَنٰهَا.

শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর। (সূরা শামস : ৫)

وَ الشَّمْسِ وَ ضُحٰهَا. وَ الْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا.

শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের, শপথ চন্দ্রের, যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়। (সূরা শামস : ১-২)

فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. الْجَوَارِ الْكُنَّسِ.

আমি শপথ করি পশ্চাতে সরে যাওয়া নক্ষত্রের। যা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়। (সূরা তাকবির : ১৫-১৬)

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى.

শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়! (সূরা নাজম : ১)

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ. وَ اِنَّه لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ.

আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের, নিশ্চয় তা এক মহাশপথ, যদি তোমরা জানতে! (সূরা ওয়াকিয়া : ৭৫-৭৬)

সুতরাং আল্লাহ তাআলা যে বস্তুর শপথ করেছেন, তাতে যে কী পরিমাণ বিস্ময়কর বিষয়াদি রয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। আকাশে রিযিক আছে বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে–

وَ فِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تُوْعَدُوْنَ.

আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু। (সূরা যারিয়াত : ২২)

তিনি আকাশ সম্পর্কে ফিকিরকারীদের প্রশংসায় বলেন,

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.

এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (সূরা আলে ইমরান : ১৯১)

রাসূলূল্লাহ (স) বলেন,

وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ ثُمَّ مَسَحَ سُبَّتَهٗ.

দুর্ভোগ সে ব্যক্তির জন্য যে এ আয়াত পড়ে অতঃপর গোঁফে তা দেয়।

অর্থাৎ, ফিকির না করেই সম্মুখপানে এগিয়ে যায়। যারা সকল নিদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের নিন্দা প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে,

وَ جَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚ وَّ هُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ.

এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ। কিন্তু তারা আকাশে অবস্থিত নিদর্শনাবলি হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা আম্বিয়া : ৩২)

এছাড়া পৃথিবীর সবকিছু দ্রুত পাল্টে যায়। কিন্তু আকাশ মজবুত-অটল ও অপরিবর্তনশীল। নির্দিষ্ট সময় এলেই শুধু এতে পরিবর্তন হবে। ইরশাদ হয়েছে,

وَ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.

আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে সুস্থিত সপ্ত (আকাশ)। (সূরা নাবা : ১২)

কাজেই এগুলো সম্পর্কে ফিকির করা দরকার, যাতে ঊর্ধ্বজগতের বিস্ময়কর বস্তুসমূহ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মনে রেখ, ঊর্ধ্বজগৎ প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, চোখ তুলে আকাশের নীল রং এবং তারকারাজির আলো দেখে নিলাম। এরকম তো চতুষ্পদ প্রাণিরাও দেখে। এমন দেখা উদ্দেশ্য হলে আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আ)-এর প্রশংসায় নিচের আয়াতে কেন বললেন,

وَكَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ.

এভাবে আমি ইবরাহিমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব দেখাই। (সূরা আনআম : ৭৫)

মানুষ যেসকল জিনিস প্রত্যক্ষ করতে পারে কুরআন সেগুলোকে مَلَكٌ (মালাক) এবং شَهَادَةٌ (শাহাদাত) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। আর যেগুলো মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে সেগুলোকে غَيْبٌ (গায়ব) এবং مَلَكُوْتٌ (মালাকূত) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। আর আল্লাহ তাআলা দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সবকিছু সম্পর্কে জানেন, তিনি হলেন মহাপ্রতাপশালী সম্রাট। কেউ তাঁর জ্ঞানের কোনো বিষয় নিজ আয়ত্তে নিতে পারে না। কেবল সেই বিষয় ছাড়া যা তিনি নিজে ইচ্ছা করেন, তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। তিনি তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ করেন না। সুতরাং, ও হে বুদ্ধিমানগণ! ঊর্ধ্বজগৎ নিয়ে খুব ফিকির করতে থাকো। এতে হয়তো তোমার জন্য আকাশসমূহের দরজা খুলে যাবে। তখন তুমি নিজের অন্তর দ্বারা চারপাশে ঘুরতে পারবে। শেষকালে তোমার অন্তর আল্লাহর আরশের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবে। তখন আশা করা যায়, তুমি উমর (রা)-এর মর্যাদায় পৌঁছে যাবে, যিনি বলেছেন, আমার অন্তর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে দেখেছে।

এর কারণ হলো, প্রাথমিক ধাপ না পেরিয়ে পরবর্তী ধাপে পৌঁছা সম্ভব নয়। আর ফিকিরের প্রাথমিক ধাপ হলো নফস, এরপর পৃথিবী যা তোমার

বর্তমান ঠিকানা, এরপর বায়ুমণ্ডল, এরপর পৃথিবীতে বিদ্যমান গাছপালা ও পশুপাখি ইত্যাদি, এরপর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মাঝে বিদ্যমান আল্লাহ তাআলার বিস্ময়কর ও দুর্লভ সৃষ্টিসমূহ। এরপর তারকারাজি সমৃদ্ধ সাত আসমান, এরপর আল্লাহ তাআলার কুরসী, এরপর তাঁর আরশ, এরপর আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ। সবশেষে আরশ ও কুরসীর অধিপতি মহান আল্লাহ তাআলা। বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তার মাঝে বিদ্যমান এই ধাপসমূহ অতিক্রম না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ তাআলার মারেফত লাভ করতে পারবে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো, বান্দা এতসব ধাপ অতিক্রম না করেই আল্লাহ তাআলার মারেফাতের দাবি করে বসে। সে বলে, আমি তো আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে জানি। তাহলে আমি কী নিয়ে ফিকির করবো!

সুতরাং ওহে বুদ্ধিমান! তুমি আকাশের দিকে তাকাও। তারকারাজি ও তার বিচরণ, সেগুলোর উদয় ও অস্ত যাওয়া প্রত্যক্ষ করো। চন্দ্র ও সূর্যের উদয় ও অস্ত গমনে পূর্ব পশ্চিমের পার্থক্য, সেগুলোর নিজ নিজ কক্ষপথে কোনো ধরনের ত্রুটি ও পরিবর্তন ছাড়া অবিরাম বিচরণ নিয়ে ফিকির করো। এরপর তারকারাজির সংখ্যাধিক্য ও রং নিয়ে ফিকির করো। কোনোটি লাল, কোনোটি সাদা আবার কোনোটি কালো রঙের। এরপর সেগুলোর আকৃতির প্রতি লক্ষ করো। কোনোটি বিচ্ছু আকৃতির, কোনোটি আবার মহিষ, সিংহ বা মানুষের আকৃতির। জমিনে যত ধরনের আকৃতি রয়েছে তার স্বরূপ আসমানেও রয়েছে। এরপর দেখো, সূর্য কীভাবে তার নিজ কক্ষপথে সারাবছর পরিভ্রমণ করে। তা প্রতিদিন ভোরে একরূপ নিয়ে উদিত হয় আর সন্ধ্যায় অন্য রূপ নিয়ে অস্ত যায়। যদি সূর্যের উদয় ও অস্তগমন না হতো তাহলে দিবস ও রজনির পার্থক্য বুঝা যেত না। দুনিয়া হয়তো সর্বদা অন্ধাকারে নিমজ্জিত থাকতো বা সর্বদা আলোয় উদ্ভাসিত থাকতো।

ভেবে দেখো, কীভাবে আল্লাহ তাআলা রাতকে আবরণস্বরূপ, ঘুমকে ক্লান্তি ঘুচানোর মাধ্যম এবং দিবসকে জীবিকা আহরণের সময় নির্ধারণ করেছেন, কীভাবে তিনি রাতকে দিনের মাঝে আর দিনকে রাতের মাঝে প্রবিষ্ট করেন, কখনো রাত ছোটো ও দিন বড় হয়, আবার কখনো দিন ছোটো ও রাত বড় হয়।

লক্ষ করো, সূর্যের গতিপথ পরিবর্তনে কীভাবে ঋতুর মাঝে পরিবর্তন আসে। কখনো গ্রীষ্মকাল, কখনো শীতকাল, কখনো বসন্তকাল আবার কখনো শরৎকাল। সূর্য যখন বিষুবরেখার নিচে নেমে যায় তখন শীতকাল, যখন তা বিষুবরেখার সমান্তরালে অবস্থান করে তখন গ্রীষ্মকাল। আর যখন সূর্য এতদুভয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করে তখন আবহাওয়া হয় নাতিশীতোষ্ণ।

মোটকথা, ঊর্ধ্বজগতে বিস্ময়ের কোনো অন্ত নেই। কারও পক্ষে তার একশ ভাগের এক ভাগ জ্ঞান লাভ করাও সম্ভব নয়।

অতএব, এরকম বিশ্বাস করতে হবে যে, প্রত্যেকটি তারকার সৃষ্টিতে আল্লাহ তাআলা অনেক প্রজ্ঞা রেখেছেন। এর আকারে, বর্ণে, আকাশ থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থানে এবং বিষুবরেখা ও পার্শ্ববর্তী তারকা থেকে দূরে বা নিকটে থাকার মধ্যে অসংখ্য প্রজ্ঞা রয়েছে। তোমার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকেও এর ওপর অনুমান করে নাও। দেহের প্রতিটি অঙ্গের মাঝেই এক বা একাধিক প্রজ্ঞা রয়েছে। ঊর্ধ্বজগতের মোআমালা তো অনেক বড়। জমিনের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। বড়ত্বের দিক থেকেও নয়, আবার অভ্যন্তরীণ গুণাবলির দিক থেকেও নয়। একথা সবাই জানে যে, এ বিশাল জগতের চারপাশ পরিভ্রমণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সূর্যের বিশালত্ব এই জগতের তুলনায় একশ' ষাট গুণেরও বেশি। হাদিস থেকেও সূর্যের বিশালত্ব বোঝা যায়। যে তারকাগুলো আমাদের দৃষ্টিতে ছোটো মনে হয়, সেগুলোর ক্ষুদ্রতম তারকাটিও পৃথিবীর চেয়ে আটগুণ বড়। আর বৃহত্তমটির তো কথাই নেই। এ আলোচনার মাধ্যমে পৃথিবী থেকে তারকাসমূহের দূরত্ব ও উচ্চতা বোঝা যায়। আল্লাহ তাআলা এ দূরত্বের প্রতি এভাবে ইঙ্গিত করেছেন, رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا তিনি এর ছাদকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। (সূরা নাযিয়াত : ২৮)

হাদিস শরীফে আছে, এক আসমান থেকে অপর আসমানের দূরত্ব পাঁচশ' বছরের রাস্তা।

এটা জানা কথা যে, একটি ক্ষুদ্রতম তারকাও পৃথিবীর চেয়ে কয়েকগুণ বড়। এমন অগণিত তারকা আমরা আকাশে দেখতে পাই। তাহলে অনুমান করে দেখো, আসমান কত বড়। অতঃপর ঊর্ধ্বজগতে গ্রহ

নক্ষত্রের দ্রুত পরিভ্রমণ সম্পর্কে চিন্তা করো। যদিও তা অনুধাবন করা অসম্ভব। কিন্তু এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আসমান একমুহূর্তে সেই তারকার বিশালতা পরিমাণ পথ অতিক্রম করে। এভাবেই তা আমাদের অগোচরে প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করতে থাকে।

এই দ্রুততাকে জিবরাঈল (আ) 'হ্যাঁ এবং না' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন, মেরাজ রজনিতে যখন রাসূলুল্লাহ (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সূর্য কি ঢলে পড়েছে'? তখন তিনি উত্তরে বললেন, 'হা...না'। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, 'হা- না' এটা কেমন উত্তর? জিবরাঈল (আ) বললেন, 'আমার 'হা' থেকে 'না' পর্যন্ত বলতে যতটুকু সময় লেগেছে এসময়ের মধ্যে সূর্য পাঁচশ বছরের দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলেছে।' ভেবে দেখো, আসমান কত বড় এবং প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তার পরিভ্রমণ কতটা সূক্ষ্ম। এরপর আল্লাহ তাআলার কুদরত দেখো, তা এত বড় ও প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদের চোখের ক্ষুদ্র তারার মাঝে তার প্রতিবিম্ব স্থাপন করে দিয়েছেন। ফলে আমরা আকাশের দিকে তাকালে সব তারকারাজি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কাজেই, আসমান ও তারকারাজির স্রষ্টার প্রতি লক্ষ করা কর্তব্য যে, তিনি কীভাবে এগুলো সৃষ্টি করেছেন। কীভাবে পিলার ও বন্ধনবিহীন এগুলো স্থিতিশীল রেখেছেন। গোটা দুনিয়া একটি ঘরের মতো, যার ছাদ হলো আকাশ। আশ্চর্যের বিষয়, আমরা যখন কোনো ধনী ব্যক্তির বাসায় যাই এবং তাকে রং বেরঙের আসবাবপত্র ও সোনালি আসবাবপত্র দ্বারা সাজানো দেখি, তখন তার খুবই প্রশংসা করি। কিন্তু এ বিশাল বাসভবনের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য দেখে কখনো অবাক হই না। এ বিশাল বাসভবনটি আমরা দেখি। এর ভূমি আলো, বাতাস, বিরল জীব-জন্তু, বিচিত্র নকশা ইত্যাদি প্রতিদিন দেখেও সেদিকে মনোযোগ দেই না। আমরা ধনী ব্যক্তির যে ঘরের প্রশংসা করি, আল্লাহর ঘর কি তার চেয়ে কোনো দিক দিয়ে কম? বরং সেটা তো এ বিশাল ঘরেরই সামান্য একটি অংশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা এ সুবিশাল ঘরের দিকে তাকাই না। কেননা, আমরা আমাদের পরওয়ারদিগার, তাঁর নির্মিত ঘর ও অন্যান্য সবকিছুকে ভুলে গিয়ে শুধু পেট ও পিঠের ধান্দায় আপাদমস্তক নিমজ্জিত রয়েছি।

আমাদের তো শুধু প্রবৃত্তি ও নারীর বা অনুচরদের চিন্তা। আর প্রবৃত্তির শেষ হচ্ছে উদরপূর্তি করা। চতুষ্পদ জন্তু যা ভক্ষণ করে আমরা তার এক দশমাংশ খেতেও সক্ষম নই। নারীর আসক্তির শেষ হচ্ছে বা অনুচরবর্গের শেষ হচ্ছে, আমাদের আশেপাশে দশ, বিশ অথবা শত মানুষ জড়ো হবে এবং আমাদের প্রশংসা করবে আর অন্তরে আমাদের জন্য ভিন্ন ধারণা পোষণ করবে। আর যদি বাস্তবেও ভালো ধারণা রাখে তো এর সাথে আমাদের সম্পর্ক কী? সে না তার নিজের জন্য না আমাদের জন্য কোনো লাভ ক্ষতির মালিক। জীবন, মৃত্যু, হাশর-নাশর কোনো কিছুই তার মালিকানাধীন নয়। আমাদের শহরে বহু ইহুদি, নাসারা রয়েছে যারা সামাজিকভাবে আমাদের থেকে মর্যাদাবান।

তুমি প্রবৃত্তি ও অনুচরদের ধোঁকায় পড়ে আসমান-জমিনের সৃজন রহস্য থেকে উদাসীন হয়ে গেছ।

আর এখন তোমার নিকট স্রষ্টা ও সৃষ্টির রহস্যের সৌন্দর্যের কোনো গুরুত্ব নেই। তোমার দৃষ্টান্ত তো ওই পিঁপড়ার মতো, যে এক আলিশান অট্টালিকায় বাসা বানিয়েছে। যে অট্টালিকাটি অনেক সুন্দর, কারুকার্য খচিত ও শক্তিশালী। তাতে রয়েছে সুন্দর সুন্দর কামরা ও হুর গিলমান। প্রতিটি কামরায় রয়েছে মূল্যবান আসবাব পত্র। যদি ওই পিঁপড়া তার বাসা থেকে বের হয়ে তার কোনো বোনের সাথে সাক্ষাৎ করে, আর যদি তার বাকশক্তি সৃষ্টি হয়ে যায়। তাহলে সে তার ছোটো বাসা, হালকা খাবার, অন্ধকার রাত্রি ইত্যাদি ছাড়া আর কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে না। অথচ তার বাসা এক সুন্দর অট্টালিকায়, তার তো বলার সুযোগ ছিল যে, আমি এমন কারুকার্য খচিত বাসায় থাকি, যার দেওয়াল ও ঘরসমূহ সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু এই পিপড়া এ ব্যাপারে কিছুই বলে না। সে তার ছোটো বাসা ও হালকা খাবারের কথা নিয়েই ক্ষান্ত থাকে। এই ছোটো পিঁপড়া তার বুদ্ধির কমতির কারণে ওইসব আলোচনা থেকে দূরে রয়েছে।

কিন্তু হে লোক সকল! তোমাদের কি হয়েছে। তোমরা ছোটো সংকীর্ণ বাসায় থেকে আল্লাহ তাআলার অপরূপ সৌন্দর্য ও সৃজন শিল্প থেকে উদাসীন? না তাঁর ফেরেশতাদের ব্যাপারে অবগত রয়েছো যারা আসমানে রয়েছে। আসমানের ব্যাপারে এতটুকু জানো যতটুকু পিঁপড়া তার ঘরের ছাদের ব্যাপারে অবগত। আর ফেরেশতাদের ব্যাপারে তোমাদের ধারণা

এতটুকু, যতটুকু তোমাদের ব্যাপারে পিঁপড়ার রয়েছে। পিঁপড়ার তো এর থেকে বেশি পরিচয় লাভের সক্ষমতাই নেই। আর না তোমাদের অট্টালিকা নিয়ে চিন্তা করার মতো পিঁপড়ার জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু তোমাদের তো এই সৃষ্টি জগৎ নিয়ে চিন্তা-ফিকির করার মতো বিবেকবুদ্ধি রয়েছে, তাহলে করো না কেনো?

এখন আমরা চিন্তা-ফিকির নিয়ে আরও আলোচনা থেকে বিরত থাকছি। কারণ এটা এমন একটি বিষয় যার কোনো সীমা নেই। আমরা যদি দীর্ঘ সময়ও লেখার পিছনে ব্যয় করি তাহলে যেই জ্ঞান এ ব্যাপারে আমাদের দান করা হয়েছে, তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে শেষ করা যাবে না। অথচ আল্লাহ তাআলা যা কিছু আমাদের দান করেছেন তা ওলামায়ে কেরাম ও অলিদের তুলনায় অনেক কম। আর সমস্ত আলেম ও অলিগণ যা জানেন তা নবীগণের ইলমের সামনে খুবই কম। আর নবীদের যে ইলম ও জ্ঞান রয়েছে তা ফেরেশতাদের চেয়ে কম। অতঃপর সমস্ত ফেরেশতা, জিন-ইনসান-এর ইলম আল্লাহর ইলমের সামনে রাখা হলে তাদের ইলমকে ইলম বলাই সঠিক হবে না বরং তা হতবুদ্ধিতা, অপারগতা ও অক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পবিত্র ওই সত্তা যিনি তার বান্দাদেরকে ইলম দিয়েছেন এবং তাকে জানিয়েছেন,

وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا.

তোমাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে সামান্যই। (সূরা বানি ইসরাঈল : ৮৫)

এ পর্যন্ত চিন্তাভাবনার কয়েকটি পথ সংক্ষেপে বর্ণিত হলো। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের চিন্তাভাবনা এসব পথেই বিচরণ করে। এতে স্রষ্টার স্তর সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার বিবরণ নেই। তবে সৃষ্টি সম্পর্কে যথাযথ চিন্তা করলে স্রষ্টার মাহাত্ম্য, প্রতাপ ও কুদরতের পরিচয় অবশ্যই অর্জিত হয়ে যায়। সৃষ্টির মারেফত তথা পরিচয় যত বেশি হয়, স্রষ্টার মারেফত ততোই পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। আমরা যদি কোনো কবির কবিতা পাঠ করে তাকে বড় বলে বিশ্বাস করি, তবে তার ফল এই হবে যে, যখনই তার কোনো রচনা ও কবিতা আমরা পাঠ করব, তার মারেফত ততোই বাড়তে থাকবে এবং তাকে সম্মানও বেশি করব। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করার অবস্থাও তদ্রূপ।

পৃথিবীর বুকে আল্লাহর যে সৃষ্টি রয়েছে তা সীমাহীন। এর চিন্তা-ফিকির করে কখনো শেষ করা যাবে না। প্রত্যেক বান্দা তার রিযিক পরিমাণই প্রাপ্ত হবে। তাই যতটুকু উল্লেখ করেছি তার ওপরই ক্ষান্ত করছি। এই আলোচনায় 'কিতাবুশ শোকর'-এর আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। ওই অধ্যায়েও আমার আলোচ্য বিষয় ছিল আল্লাহর মাখলুক নিয়ে, কিন্তু সেখানে এই দিক থেকে ছিল যে, আল্লাহ যা কিছু আমাদের দিয়েছেন, তা তার দয়া, মায়া, ফযল ও করম। আর এখানে এই দিক থেকে যে, এসব তার সৃষ্টিকর্ম। আমাদের এসব নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা উচিত। আমরা যেই বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছি তা নিয়ে এক দার্শনিকও চিন্তা করে, কিন্তু তা তার অকল্যাণের কারণ হয়। আর তাওফিক প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য চিন্তা হেদায়াত ও সফলতার মাধ্যম হয়। আল্লাহ তাআলা আসমান জমিনে এমন কোনো জিনিস সৃষ্টি করেননি যার দ্বারা হয়তো কাউকে হেদায়াত দান করেছেন অথবা বিভ্রান্ত করেছেন। মোটকথা, যে ব্যক্তি এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে যে, এসব কিছু আল্লাহর সৃষ্টি, তাঁর শিল্পকর্ম, এর মাধ্যমে সে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব তার অন্তরে অর্জন করতে থাকে। আর যে ব্যক্তি এই দিক থেকে দেখে যে, একটি বিষয় আরেকটি বিষয়ের সৃষ্টির কারণ বা একটি আরেকটির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এতে কোনো স্রষ্টার সম্পর্ক নেই, সে বিভ্রান্ত ও পথহারা হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদের বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করুন।

আল্লাহ তাআলা আপন রহমত ও দয়াগুণে আমাদের চিন্তাশক্তি দান করুন এবং অজ্ঞলোকদের বিপর্যয় থেকে হেফাজাত করুন। আমীন।

[সপ্তদশ খণ্ড সমাপ্ত]

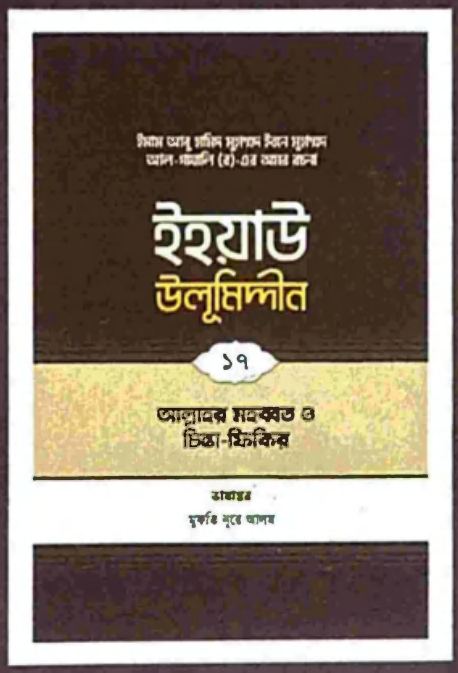

ISBN : 978-984-558-056-4

দারুত তাকবীর
কর্পোরেট অফিস : ৩০/এ, সাত্তারা সেন্টার (১৪ তলা) ভি আই পি রোড
নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০, ফোন : ০৯৬১০৬৬৬০০৬, ০১৯৯১-১৮১২০৪
বিক্রয় : বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
সার্বিক যোগাযোগ : ০১৯৩৮-৮৫৫৯৯২, ০১৯৩৮-৮৫৫৯৭৯, ০১৯৩৯-৬১৯৩২১
ই-মেইল : info@daruttakbeer.com

1011401289014020З-7741

পরিবেশক : বাংলাপ্রকাশ
৩৮/২-খ, তাজমহল মার্কেট (নিচ তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
অনলাইনে পরিবেশক : BOIBAZAR.com
BOOKS
রকমারি.com